প্রকাশনার ৩৬ বছর

অগ্রপথিক

মে ২০২১

ঈদ-উল-ফিতর বিশেষ সংখ্যা

প্রকাশনার ৩৬ বছর

অগ্রপথিক

সৃ জ ন শী ল মা সি ক

ছত্রিশ বর্ষ ❑ সংখ্যা ০৫

মে ২০২১ ॥ বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৪২৮ ॥ রমযান-শাওয়াল ১৪৪২

প্রধান সম্পাদক

ড. মোঃ মুশফিকুর রহমান

সম্পাদক

মোহাম্মদ আনোয়ার কবির

প্রকাশনা বিভাগ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন

[প্রতিষ্ঠাতা : জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান]

আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর

ঢাকা-১২০৭

অগ্রপথিক

নিয়মাবলী

- অগ্রপথিক ইসলামিক ফাউন্ডেশন-এর সৃজনশীল মাসিক মুখপত্র।
- ইসলামের সুমহান জীবনাদর্শ প্রচার ও প্রসারে বিতর্কের ঊর্ধ্বে থেকে প্রবন্ধ, নিবন্ধ, জীবনী, তথ্যমূলক ফিচারসহ সৃজনশীল লেখকদের গল্প, কবিতা, নাটক, স্মৃতিকথা, ইতিহাস-ঐতিহ্য, সাহিত্য-সংস্কৃতি,শিল্পকলা, অর্থনীতি, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ক লেখা প্রকাশ এবং মননশীল পাঠক তৈরি করা অগ্রপথিকের প্রধান উদ্দেশ্য। পাশাপাশি বিশ্ব মুসলিম ঐতিহ্যের সঙ্গে পাঠকদের পরিচিত করাও এর অন্যতম উদ্দেশ্য।
- উদ্দেশ্যের অনুকূলে যে কেউ তাঁর নির্বাচিত মূল্যবান লেখাটি অগ্রপথিক-এ প্রকাশের জন্য পাঠাতে পারেন, তবে অবশ্যই স্পষ্ট ও নির্ভুল হতে হবে। কাগজের দুই পৃষ্ঠায় গ্রহণযোগ্য নয়। অগ্রপথিক-এর ই- মেইল ঠিকানায়ও লেখা পাঠাতে পারেন। অমনোনীত লেখা ফেরত দেয়া হয় না। প্রকাশিত লেখার সম্মানী দেয়া হয়। লেখা সম্পাদকের বরাবরে পাঠাতে হবে।
- ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কেন্দ্রীয় বিক্রয় শাখা (বায়তুল মুকাররম, ঢাকা) সহ বিভাগীয় ও জেলা কার্যালয়ে অগ্রপথিকসহ অন্যান্য প্রকাশনা কিনতে পাওয়া যায়।

প্রচ্ছদ
ফারজীমা মিজান শরমীন

মূল্য : ২০ টাকা

যোগাযোগ
সম্পাদক
অগ্রপথিক
প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর
ঢাকা- ১২০৭
ফোন : ৮১৮১৫১৯
E-mail : ifa.agropothik@gmail.com

সম্পাদকীয়

ঈদ মুবারক। অগ্রপথিক-এর পাঠক গ্রাহক শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি রইলো পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর এর শুভেচ্ছা। আমাদের মুসলিম জীবনের অন্যতম প্রধান উৎসব ঈদ-উল-ফিতর। ২য় হিজরীতে বদর যুদ্ধের পরে প্রথম পালিত হয় পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর। সেই থেকে আজো ঈদ-উল-ফিতর তার পবিত্রতা ফজিলত নিয়ে প্রতি বছর উপস্থিত হয়। মুসলিমসহ সকল মানুষের জীবনে পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর নানাবিধ কারণে গুরুত্বপূর্ণ। এক মাস সিয়াম সাধনা শেষে প্রতিটি মুসলমানের জীবনে ঈদ একদিকে অফুরন্ত নেয়ামত অপরদিকে অন্য সকল ধর্মাবলম্বী মানুষের কাছে বিশেষ মহিমা নিয়ে হাজির হয়। ঈদের আভিধানিক অর্থ খুশি। আর এই খুশি তখনি পরিপূর্ণ হতে পারে যখন সকল মানুষ আনন্দকে উপলব্ধি করতে পারবে। পবিত্র ঈদ উল ফিতর তাই আমাদের জন্য আত্ম উপলব্ধিরও। এক মাসের সিয়াম সাধনার দ্বারা আমরা নিজেদের কতটুকু পরিমাণে আত্মশুদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পেরেছি তার আত্ম উপলব্ধির দিনও ঈদ-উল-ফিতর। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর হাদিস শরীফ মতেই পবিত্র মাহে রমযান পেয়েও যে তার জীবনের গুনাহসমূহকে মাফ করিয়ে নিতে পারেনি তার মত হতভাগা আর নেই। সুতরাং ঈদের দিন আমাদের এই আত্ম উপলব্ধিও

করতে হবে আমরা সেই হতভাগাদের দলে পড়বো না রোযার ফজিলত হাসিলের কাতারে পড়বো।

পবিত্র ঈদের দিনে একজন আরেকজনের সঙ্গে কোলাকুলি করে যে সৌভ্রাতৃত্বের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে সেটি আজীবন ধরে রাখার বিষয়। মনের হিংসা বিদ্বেষ কালিমা দূর করেই একজন আরেকজনের বুকে বুক লাগিয়ে আলিঙ্গন করে থাকেন। আর সেই আলিঙ্গনের মধ্য দিয়ে ইসলামের মাহাত্ম্য ফুটে ওঠে। ঈদের আনন্দের অন্যতম বিষয় পাড়া পড়শী আত্মীয় স্বজন গরীব মিসকিনদেরও এতে শরীক করানো। আশে পাশের লোকেরা যদি এই আনন্দে শরীক না হতে পারে তাহলে ঈদ কখনো পূর্ণতা পেতে পারে না। আল্লাহ তাআলা'র দেয়া বিধান অনুযায়ী আমরা যদি যাকাত ফেৎরা ঠিকমতো প্রদান করতে পারি তাহলে গরীব দুঃখীদের জীবনেও ঈদের আনন্দের পরশ লাগতে পারে।

এবারের পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর পড়েছে ইংরেজি মে মাসে। সারাবিশ্বে করোনা মহামারীর এক কঠিন পরিস্থিতিতে গত বছরের মতো এবারও পবিত্র ঈদ-উল ফিতর পালিত হচ্ছে। ইতোমধ্যে করোনা মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে আমাদের অনেকের আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-পড়শী, নিকটজন মৃত্যুবরণ করেছেন। মহান রাব্বুল আলামামিন তাঁদের মৃত্যুকে শহীদী দরজা দান করুন। অনেকে আক্রান্ত হয়ে ধুঁকছেন। রাব্বুল আলামিন তাদেরকে শেফাহ দান করুন। করোনার বিধি নিষেধ পালন করে এবারের ঈদ উল ফিতর প্রত্যেকে পালন করবেন– আমরা এই প্রত্যাশা করি। মহামারীতে পবিত্র ইসলাম ধর্মের দিক নির্দেশনা নিয়ে আমাদের মধ্যে নানারকম ভুল ধারণা, কুসংস্কার প্রচলিত রয়েছে। করোনা'র এই মহামারীকে সামনে রেখে পবিত্র ইসলাম ধর্মের দিক নির্দেশনার আলোকে আমরা এবারের এই বিশেষ সংখ্যায় 'মহামারী প্রতিরোধে ইসলাম' শিরোনামে একটি বিশেষ লেখা প্রকাশ করছি। লেখাটির মধ্য দিয়ে ইসলাম ধর্মের আলোকে মহামারীর বিষয়ে পাঠকেরা একটি নির্দেশনা পাবেন বলে আমরা আশা করি।

মহাগ্রন্থ পবিত্র আল কুরআন বিশ্বের অধিকাংশ ভাষায় অনূদিত হয়েছে। পবিত্র কুরআন শরীফের বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ নিয়েও এ সংখ্যায় একটি বিশেষ লেখা প্রকাশিত হচ্ছে।

পবিত্র ঈদ উল ফিতর উপলক্ষে এবারের সংখ্যাটি বর্ধিত কলেবরে বিশেষ আয়োজনে বিশেষ সংখ্যা হিসেবে প্রকাশিত হচ্ছে। মহিমান্বিত ঈদের প্রকৃত শিক্ষা প্রত্যেকের জীবনকে সাফল্যমণ্ডিত করুক। ঈদের রহমত ফজিলত বরকত প্রত্যেকের জীবনকে উদ্ভাসিত করুক। আমীন।♦

সূচি

প্রবন্ধ-নিবন্ধ

তাহমিনা বিনতে আব্দুস সোবহান
ঈদুল ফিতর : তাৎপর্য ও শিক্ষা ◆০৯

খান মাহবুব
করোনাকালে ঈদের সামাজিক অর্থনীতি◆১৪

বিশেষ রচনা

কাজী আখতারউদ্দিন
পবিত্র কুরআন বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদের ইতিহাস◆২০

অধ্যাপক ড. সাইয়েদ আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ
মহামারী প্রতিরোধে ইসলাম◆৪১

মুসলিম বিশ্ব সংবাদ

শামস নূর
মুসলিম বিশ্বের টুকরো খবর◆৬৫

মুজিববর্ষ

মাহবুব রেজা
বঙ্গবন্ধু ঠিকই বুঝতে পেরেছিলেন
'হা বৃক্ষ চিরসখা মানবের'◆৮৬

বিশ্ব শ্রমিক দিবস

আলম শামস
কুরআন সুন্নাহর আলোকে শ্রমিকের মর্যাদা◆৯৩

বিশ্ব পরিবার দিবস

শামস সাইদ
পরিবারের গুরুত্ব ও তাৎপর্য◆৯৮

ইতিহাস

আব্দুল্লাহ ইবনে মাহমুদ
সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবী :
ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে ইসলামের মহাবীর◆১০৬

কবিতা

আজিজুর রহমান আজিজ
শিকড়ের খোঁজে ◆ ১১৭
সোহরাব পাশা
'দেশরত্ন' শেখ হাসিনা ◆ ১২১
আ ফ ম ইয়াহিয়া চৌধুরী
হিমাদ্রিশিখরসম বাঙালি কবি কাজী নজরুল ◆ ১২২
সিরিয়া মনি লোদী
আমার মায়ের জন্য শোকগাঁথা ◆ ১২৩
হাসান হাফিজ
স্বগতোক্তি : একা নিরজনে ◆ ১২৪
সেলিম মাহমুদ
পিপাসা পান করি ◆ ১২৫
আনোয়ার কবির
প্রবাহমান সময় ◆ ১২৬
মোহাম্মদ আন্‌ওয়ারুল কবীর
খুরের আওয়াজ ◆ ১২৭
ফরিদুজ্জামান
স্বপ্নগাড়ি ◆ ১২৮
মারইয়াম মনিকা
আমি যখন পরশ পাথর নই ◆ ১২৯

গল্প

সমীর আহমেদ
গুরু-শিষ্য ◆ ১৩০
স্বকৃত নোমান
কালাপীর ◆ ১৩৭

সাহিত্য

গাজী সাইফুল ইসলাম
ফেয়াজ কায়াকান ফের্জার ও আমির আজিজ :
ভারতীয় ও তার্কি দুই কবির কবিতা ◆ ১৫৩

পরশমণি

আল-কুরআন

১। হে ঈমানদারগণ! তোমাদের জন্য রোযা ফরয করা হয়েছে, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর ফরয করা হয়েছিল, যেন তোমরা খোদাভীতি অর্জন করতে পারো। *(সূরা আল-বাকারা : ১৮৩)*

২। রমযান মাস এতে মানুষের দিশারী এবং সৎপথের স্পষ্ট নিদর্শন ও সত্যাসত্যের পার্থক্যকারীরূপে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। অতএব তোমাদের মধ্যে যারা এ মাস পাবে তারা যেন সিয়াম পালন করে। আর যারা অসুস্থ কিংবা মুসাফির অবস্থায় থাকবে তারা অন্য দিনে গণনা পূরণ করবে। আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ করতে চান; আল্লাহ তোমাদের জটিলতা কামনা করেন না যাতে তোমরা গণনা পূরণ কর এবং তোমাদের হেদায়ত দান করার দরুন আল্লাহ তাআলার মহত্ত্ব বর্ণনা কর, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর। *(সূরা আল-বাকারা : ১৮৫)*

৩। কেউ ইচ্ছাকৃত কোন মুমিনকে হত্যা করলে তার শাস্তি জাহান্নাম। সেখানে সে স্থায়ী হবে এবং আল্লাহ তার প্রতি রুষ্ট হবেন। তাকে লা'নত করবেন এবং তার জন্য মহাশাস্তি-প্রস্তুত রাখবেন। *(সূরা নিসা : ৯৩)*

৪। যারা আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হয়েছে তোমরা তাদের মৃত বলো না বরং তারা জীবিত অথচ তোমরা অনুভব করতে পার না। *(সূরা আল-বাকারা : ১৫৪)*

আল-হাদীস

১। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, আল্লাহ তাআলার কাছে সবচেয়ে প্রিয় রোযা হযরত দাউদ (আ)-এর রোযা। তিনি একদিন রোযা রাখতেন এবং একদিন বিনা রোযায় থাকতেন। *(বুখারী, মুসলিম ও নাসাঈ)*

২। নবী করীম (সা) ইরশাদ করেছেন, রোযা একটি বর্ম, নারী-পুরুষকে নিরর্থক বাক্যালাপ, বেহুদা কথাবার্তা, কার্যাবলী, অপকর্মসমূহে নিমগ্ন থাকা হতে বিরত করে। *(মুসনাদে আহমাদ)*

৩। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, 'যখন রমযান মাস উপনীত হয় তখন জান্নাতের দ্বারসমূহ উন্মুক্ত করা হয়, জাহান্নামের দ্বারসমূহ বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং শয়তানকে জিঞ্জিরাবদ্ধ করা হয়।' *(তিরমিযী)*

৪। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা) ইরশাদ করেছেন, 'যে ব্যক্তি এই মাসে একজন রোযাদারকে ইফতার করাবে তার গুনাহসমূহ মাফ হয়ে যাবে এবং দোযখের আগুন থেকে সে মুক্তি পাবে।' *(বুখারী ও মুসলিম)*

৫। প্রিয় নবী (সা) বলেছেন, প্রত্যেক জাতিরই নিজস্ব আনন্দ-উৎসব রয়েছে, আমাদের আনন্দ-উৎসব হচ্ছে এই ঈদ।' *(বুখারী ও মুসলিম)*

৬। মহানবী (সা) ইরশাদ করেছেন, 'একজন মুমিনকে হত্যা অপেক্ষা পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাওয়া আল্লাহর নিকট অধিকতর সহনীয়।' *(ইবনে মাজাহ)*

ঈদুল ফিতর : তাৎপর্য ও শিক্ষা

তাহমিনা বিনতে আবদুস সোবহান

দীর্ঘ একটি মাস সিয়াম সাধনার মাধ্যমে মানবের দেহ-মন যখন ক্লান্ত-শ্রান্ত-পরিশ্রান্ত। মহান রবের পদতলে নিজেদের সপে দিয়ে মানুষ যখন তাঁর সন্তুষ্টি লাভের আশায় ব্যাকুল তখন তাদের পুরস্কার স্বরূপ মহান আল্লাহর সন্তোষ প্রাপ্তির মহা আনন্দের যে দিনটি আল্লাহ নিজেই নির্ধারণ করেছেন তা হলো শাওয়াল মাসের প্রথম দিন ঈদুল ফিতর। এদিন বান্দা নফসের বিরুদ্ধে পরমাত্তার বিজয়

এবং মহান আল্লাহর মহান পুরস্কার লাভ উপলক্ষ্যে মহানন্দের দিন হিসেবে উদযাপন করে। এ দিন মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দাকে খানাপিনার বিশেষ দাওয়াত। তাই এদিনে কোনরূপ রোযা পালন হারাম নিষিদ্ধ। এ আনন্দে খানা পিনা তথা আনন্দভোজ ও নতুন জামা-কাপড় গ্রহণোৎসব সমাজের দরিদ্র শ্রেণীও যাতে শামিল জাতি পারে সে জন্য প্রবর্তন করা হয়েছে সাদাকাতুল ফিতরের বিধান। এটি ইসলামের সার্বজনীনতা ও সাম্যের নিদর্শন। এই ঈদুল ফিতরের পরিচয়, তাৎপর্য ও শিক্ষাকে ঘিরে এ নিবন্ধটি আবর্তিত। ঈদুল ফিতর শব্দটি দুটি শব্দ ঈদ ও ফিতর-এর সমন্বয়ে গঠিত।

ঈদ শব্দটির আভিধানিক অর্থ খুশি, আনন্দ, উৎসব ইত্যাদি। ঈদ শব্দটি 'আউদুন' শব্দমূল থেকে উদ্ভূত হলে এর অর্থ হবে প্রত্যাবর্তন করা, প্রত্যাগমন করা, বারবার ফিরে আসা ইত্যাদি। প্রতি বছর এ দিনটি ঘুরে ঘুরে আসে বলে একে ঈদ বলা হয়। ঈদকে এজন্য ঈদ বলা হয় যে, ঈদ প্রতি বছর নিত্য নতুন আনন্দ ও খুশী নিয়ে ফিরে আসে। তাজুল আরূম ইবন মানযূর আল ইফরীকী (র) ও আল ফিরূযাবাদী (র) বলেন, ঈদ বলা হয়, আরবদের কাছে এমন সময়কে যাতে আনন্দ ও দুঃখ বারবার ফিরে আসে। লিসানুল আরব অনুরূপভাবে লোক সমাগমের দিন বা স্মৃতি বিজড়িত কোন দিন যা বারবার ফিরে আসে এমন দিনকেও ঈদ বলা হয়। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন, ঈসা ইবন মারইয়াম বললেন, হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের প্রতি আকাশ থেকে খাদ্য ভর্তি খাঞ্চা অবতরণ করুন। তা আমাদের জন্য অর্থাৎ আমাদের প্রথম ও পরবর্তী সবার জন্য ঈদ উৎসব হবে এবং আপনার পক্ষ থেকে একটি নিদর্শন হবে। সূরা মায়িদা : ১১৪। এ থেকে বুঝা যায় যে, আসমানী খাদ্য নাযিল হওয়ার দিনটি পরবর্তীদের জন্য স্মৃতিচারণের দিন হওয়ায় সেটিকে ঈদ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

আর ফিতর শব্দটি ইফতার থেকে এসেছে। এর অর্থ হলো ভঙ্গ করা ইফতার ইত্যাদি। যেহেতু সারাদিন রোযা পালন শেষে সন্ধ্যায় কিছু খেয়ে ইফতার করা হয় তাই একে ফিতর নামে নামকরণ করা হয়েছে। শরীয়তের পরিভাষায় ঈদুল ফিতর হলো শাওয়াল মাসের প্রথম দিন। (আল মুফদারাত ফী গারীবিল কুরআন, পৃ. ৩৫৫) হযরত আবু হুরায়রা ও আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, ঈদুল ফিতর হলো যে দিন লোকেরা রোযা ভঙ্গ করে। (জামি উত তিরমিযী)

অতএব ঈদুল ফিতর অর্থ হলো রোযা ভঙ্গের দিন রোযা ভঙ্গের কারণে খুশি উৎসব বা রমযানের পরবর্তী উৎসব। তাই আমরা বলতে পারি ঈদুল ফিতর এ উৎসবে বা আনন্দকে বলা হয় যা মাহে রমযানের পরে আল্লাহ তাআলার পক্ষ

থেকে বড়ত্ব ও মহত্ব ঘোষণার্থে এবং বান্দার প্রতি তার বিশেষ ক্ষমা ও অনুগ্রহের বার্তা নিয়ে প্রতি বছর আমাদের মাঝে ফিরে আসে।

ঈদুল ফিতরের সূচনা : ৬২৮ খ্রিস্টাব্দ মোতাবিক হিজরী দ্বিতীয় বর্ষে রাসূলুল্লাহ (সা) মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করার পর ঈদের সূচনা হয়। (আর রাহিকুল মাখতুম) নবী করিম (সা) মদিনায় গমন করে দেখতে পেলেন যে, পারসিক প্রভাবে মদিনায় বসবাসকারী লোকেরা নওরোজ ও মিহিরজান নামক দুটি উৎসব অত্যন্ত আনন্দ ও উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে পালন করেছে। নওরোজ উৎসব উদযাপিত হতো শরতের পূর্ণিমায়। এ উৎসবে তারা নানা আয়োজন আচার অনুষ্ঠান ও আনন্দ অনুকরণে নববর্ষ ও অন্যান্য উৎসব পালনের রেওয়াজ ছিল।

রাসূলুল্লাহ (সা) মুসলমানদেরকে উক্ত উৎসব দুটি উদযাপন করতে নিষেধ করেন। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সা) মদিনায় আগমন করলেন তখন তাদের দুটি দিন ছিল যাতে তারা উৎসব পালন করে? তারা বললো আমরা জাহেলী যুগে এ দুদিনে উৎসব পালন করতাম। এ ভাব ধারাই চলে আসছে। তাদের এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, আল্লাহ তাআলা তোমাদের ঐ দুদিনের বদলে দুটি মহান উৎসবের দিন প্রদান করেছেন। একটি হলো ঈদুল ফিতর অপরটি হলো ঈদুল আযহা (সুনানু আবু দাউদ)। এতে তোমরা পবিত্রতার সাথে উৎসব পালন করেন।

দ্বিতীয় হিজরীতে রমযানুল মুবারকের রোযা ফরয হয়। রমযান মাস সমাপ্তির দুইদিন পূর্বে অবতীর্ণ হয়। সাদাকায়ে ঈদুল ফিতরের নামাযের বিধান।

ঈদুল ফিতরের শিক্ষা : ঈদুল ফিতর রমযানের রোযার গুরুত্বপূর্ণ ফরয আদায় করে খুশিতে পালন করা হয় ঈদে আল্লাহ তাআলার উদ্দেশ্যে শুকর এর সিজদা আদায় করা হয় এবং তার নিকট গুনাহ ক্ষমার জন্য দুআ করা হয়। রমযানের রোযা পালনের মাধ্যমে বান্দা আল্লাহর রহমত মাগফিরাত ও মুক্তির সুসংবাদের আনন্দ লাভ করেন।

ঈদুল ফিতরের দিন তার আংশিক খুশির বহিঃপ্রকাশ ঘটে। আল্লাহ ঈদের মাধ্যমে বান্দার আনন্দের সামান্য নমুনা দেখান। মুমিনের আসল আনন্দ তো বেহেশত লাভের মাধ্যমে অর্জিত হবে।

ঈদুল ফিতর আমাদেরকে হিংসা দ্বেশ ঘৃণা পরিহার করতে শিখায়। এ দিন আমরা খোলামনে একে অপরকে সালাম ও শুভেচ্ছা জানাই। সুদীর্ঘ একাস সিয়াম সাধনার মাধ্যমে মুমিন ব্যক্তিরা তাকওয়ার গুনে উদ্ভাবিত হয়। নিজেদের আখলাক ও চরিত্রকে করে পূত:পবিত্র।

ঈদের নতুন অথবা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন জামা কাপড় পরা খুশবু লাগানো এবং কিছু মিষ্টান্ন গ্রহণ করে জামাআতে যাওয়া মুস্তাহাব। রাসূলুল্লাহ (সা) মসজিদে নামায না পড়ে ময়দানে নামায পড়েছেন। বড় জামা'আত আমাদেরকে হাশরের ময়দানে সমবেত হওয়ার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

সকলে মিলে আনন্দ করলেই ঈদের প্রকৃত শিক্ষা লাভ করা সম্ভব। এ কারণেই ফিতরার বিধান প্রবর্তন করা হয়েছে যাতে করে গরীব দুঃখী ও অভাবীরাও ঈদের খুশি ভাগাভাগি করে নিতে পারে।

ঈদুল ফিতর বান্দার পুরস্কার পাওয়ার দিন যা পরম আনন্দের। এটি প্রচলিত রিয়েলিটি শোর গ্র্যাণ্ড ফিনালের সাথে তুলনীয়। গ্র্যাণ্ড ফিনালের দিন যিনি চ্যাম্পিয়ন ও রানার আপ হন তাদের আনন্দের যেমন সীমা পরিসীমা থাকে না; তদ্রুপ রামাদান মাসের কঠোর সিয়াম সাধনা শেষে এদিনটিতে পুরস্কার দেওয়া হয়ে থাকে। এ দিনেও প্রকৃত আমলকারীরা আনন্দে উদ্বেলিত হয় মহান রবের শুকর গোজারী করে নুয়ে পড়ে মহান রবের কুদরতী পায়ে পরম শ্রদ্ধাভরে। এ প্রসঙ্গে হাদীসখানা হলো : হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, শবে কদরে জিবরাঈল (আ) ফেরেশতাদের একটি জামাআতসহ অবতরণ করেন। যে ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বসে আল্লাহর তাআলার যিকির করে বা ইবাদতে মশগুল থাকে তার জন্য আল্লাহর রহমতের দুআ করেন। অতঃপর যখন ঈদুল ফিতরের দিন আসে তখন আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদের সামনে বান্দাদের ইবাদত বন্দেগী নিয়ে গর্ব করেন এবং ফেরেশতাদের বলেন, হে আমার ফেরেশতা! যে শ্রমিক নিজ দায়িত্ব পূর্ণভাবে পালন করে তার বিনিময় কি হতে পারে? উত্তরে ফেরেশতারা বলে, হে আমাদের রব! তার বদলা এই যে, তার

বদলা তাকে পূর্ণ দিয়ে দেয়া হোক। তখন আল্লাহ তাআলা বলেন, হে ফেরেশতাগণ! আমার বান্দা আমার ফরয হুকুম (রোযা) পূর্ণভাবে পালন করেছে, এরপর তারা ঈদগাহের দিকে যাচ্ছে। আমার ইবাদতের শপথ! আমার প্রদাপ, বদ্যনতা, বড়ত্ব ও সুউচ্চ মাকামের কসম! আমি তাদের দুআ অবশ্যই কবুল করব। তারপর আল্লাহ তাআলা বান্দাদের প্রতি লক্ষ্য করে বলেন, যাও আমি তোমাদের গুনাহ সমূহ মাফ করে দিলাম এবং তোমাদের গুনাহগুলোকে নেকি দ্বারা পরিবর্তন করে দিলাম। অতঃপর তারা ঈদগাহ থেকে নিষ্পাপ হয়ে ফিরে আসে। (বায়হাকী)

নফসের বা কুপ্রবৃত্তির লাগামাহীনতার জোয়ার উপেক্ষা করে এক মাস কঠোর সাধনার পর নফসকে হারিয়ে দেয়ার যে আনন্দ সেটিও ঈদের আনন্দের সাথে যুক্ত হয়। লাগামহীন ভোগ বিলাস মানুষের পশুত্বকে প্রবল করে তোলে। পুরো রামাদান মাস জুড়ে রোযাদার আল্লাহর ভয় ও মহব্বতের আতিকার্যে নফসের কামনা বাসনাকে পক্ষাঘাত করে উপবাসে ক্লান্ত শ্রান্ত শরীল নিয়ে আবার দীর্ঘ সময় তারাবীহতে দাঁড়িয়ে থেকে শেষ রাতে ঘুম ভেঙ্গে সাহরী খেয়ে তাহাজ্জুদ মহান প্রভুর দরবারে হাজিরা দিয়ে নফসকে লাঞ্ছিত পর্যুদস্ত করেছে আর বিজয় ছিনিয়ে এনেছে পরমাত্মার। সেই বিজয়ের বেহেশত উৎসব ঈদুল ফিতর। তবে ঈদের আনন্দের এ কারণগুলো কতগুলো নিজেদের মধ্যে অর্জিত হয়েছে সেটি হিসাব মিলানোর বিষয়। আমি যদি নফস বা কুপ্রবৃত্তির কাছে হেরে গিয়ে থাকি। তবে এ ঈদের আনন্দ আমার নয়; আমি যদি তাকওয়ার শিক্ষা হৃদয়ে লালন করে নিজেকে মুত্তাকী হিসেবে গড়ে তুলতে না পারি পুরো মাসটিতে কঠোর সাধনা ও আল্লাহর নিকট নজরানা পেশ করে যদি মহান রবের নিকট থেকে পাপরাশি মার্জনা পূর্বক সন্তুষ্টি অর্জন করে নিতেই না পারলাম তবে এ খুশি আমার নয়। এমনটিই উপলব্ধি করেছিলেন হযরত উমার ইবনে খাত্তাব (রা)। এক ঈদের দিনে তিনি অঝোর নয়নে কাঁদছিলেন এবং গভীর চিন্তায় মগ্ন হলেন। জিজ্ঞাসা করা হলো আজ এ খুশির দিনে আপনাকে এত বিমর্ষ দেখছি কেন? তিনি জবাবে বললেন, যাদের রোযা কবুল হয়েছে বলে সঠিকভাবে বলতে পারে তারাই আজ আনন্দিত হতে পারে। আমি জানি না আমার রোযা কবুল হয়েছে কিনা? অতএব তাকওয়া অর্জনের মাধ্যমে মহান রবের সন্তোষ অর্জনই হোক আমাদের একমাত্র সাধনা।♦

করোনাকালে ঈদের সামাজিক অর্থনীতি

খান মাহবুব

মানুষের যাপিত জীবনে উৎসব এক অবিচ্ছেদ্য অনুসঙ্গ। উৎসব যেনো বেঁচে থাকার রক্তবীজ। সঙ্গত কারণেই উৎসবের প্রচলন বহমান আছে অতীত থেকে আজ অবধি। উৎসবের মাধ্যমেই মানুষ সঞ্জিবিত হয়ে স্বীয়কর্মে নিজেকে প্রণোদিত করে। উৎসব মানেই তো সবাই মিলে একত্র হয়ে মিলনের মোহনায় দাঁড়িয়ে এক মঞ্চে উদ্‌যাপন। তাই সব জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে উৎসবের উপস্থিতি লক্ষ্যণীয়। মুসলমানদের সবচাইতে দুটো বড় উৎসব ঈদুল ফেতর ও ঈদুল আযহা। একমাস সিয়াম সাধনার পর ঈদুল ফেতর আর আরবি জিলহাজ মাসের

১০ তারিখে পালিত হয় ঈদুল আযহা। ঈদুল আযহা হচ্ছে ত্যাগের মহীমায় আল্লাহর আদেশে আরাফাতের ময়দানে পুত্র ইসমাঈল (আ) কুরবানি করতে গেলে আল্লাহ তায়ালার আদেশে ও কুদরতি শক্তিতে একটি পশু কুরবানি হয়। ইসমাঈল (আ)-কে আল্লাহ তাঁর খলিল বা বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেন।

আরব জাহানে পাক ইসলাম যুগেও উৎসবের সরব উপস্থিতি লক্ষ্যণীয়। মদীনায় শরতের পূর্ণিমায় নওরোজ উৎসব এবং বসন্তের পূর্ণিমায় মেহেরজান পালিত হতো। মুসলমানদের মদীনা জয়ের পর সাম্য, সৌহার্দ্য, প্রীতি ও ভ্রাতৃত্বের বার্তা নিয়ে ঈদের প্রচলন হয় হিজরী ৬২৪ খ্রি.।

ঈদুল ফিতর পালিত হয়েছিলো ৩০ বা ৩১ মার্চ। বঙ্গদেশে ফরায়েজী আন্দোলনের পর মুসলিম জনসমাজে ঈদের সরব উপস্থিতি লক্ষ্যণীয়। ঈদের সামাজিক তাৎপর্য হচ্ছে– ঈদের নামায, কুরবানি, দান, সামাজিক সমাবেশ, ভোজ, উপহার, বিনিময় ইত্যাদি।

সাম্প্রতিক সময়ে ঈদের ধর্মীয়ভাব-গাম্ভীর্যকে ছাপিয়ে উৎসব, যোগাযোগ, তারণ্য প্রবাহ, বাণিজ্যেও ঈদের বড় নিয়ামক। ঈদে পরিবার জাতি, সমাজ, স্থানিকতা, পূর্বপুরুষের ভিটের প্রতি মানুষের শেকড়ের টান শক্তিশালী হয়। ঈদে মৃত পূর্বপুরুষ ও আত্মীয়ের কবর জিয়ারতে শুধু ধর্মীয় মাধুর্য নয় সামাজিক সত্তায় জড়িয়ে-মানুষের মনোসামাজিক ও ধর্মীয় প্রেক্ষাপট প্রাসঙ্গিকতা পায়।

অতিমারি করোনার তান্ডব শুধু ঈদ নয় জীবনের স্বাভাবিক সমস্ত গতি প্রবাহ স্থবির করে দিয়েছে। যখন জীবন ও জীবিকা অনিশ্চয়তা নিয়ে সুতোয় ঝুলছে তখন ঈদ কী কোন আনন্দ ধ্রুপদ নিয়ে হাজির হতে পারে। সারা বিশ্বে এ পর্যন্ত ৪০ লাখের অধিক মানুষের প্রাণ সংহার হয়েছে করোনায়। বাংলাদেশে মৃত্যুর সংখ্যা ১৫ হাজার ছাড়িয়েছে। ইতোমধ্যে মিশরে সরকারী পরিপত্র জারি করে ঈদ উৎসবের আয়োজন বাতিল করা হয়েছে।

ঈদের আভিধানিক অর্থ পুনরাগম বা বারবার ফিরে আসা হলেও দু'বছর ধরে ঈদ সেভাবে হাজির হচ্ছে না। বরং করোনাকালে ঈদ মানে আরেকটি বিষাদমাখা দিন– যে দিনেও গুণতে হয় মৃত্যুর সংখ্যা। অনেককে ছুটতে হয় হাসপাতালে, গোরস্থানে কিংবা শ্মশানে।

ঈদতো এমন ছিলনা কিছুদিন আগেও। ঈদে মোটাদাগে কত টাকার প্রবাহ বা বাণিজ্য হয় সেটা বলা মুশকিল। তবে ব্যবসায়িদের সংগঠন এফবিসিসিআই সূত্রে জানা যায় ঈদে শুধু জুতো কসমেটিক্স বিক্রি ৩ হাজার কোটি টাকা, ভোগ্য

পণ্য ৭ হাজার কোটি টাকা, সোনা-হীরা ৫ হাজার কোটি টাকা, ভ্রমণ খাতে ৫ হাজার কোটি টাকা, ইলেকট্রোনিক্স ৪ হাজার কোটি টাকা ইত্যাদি।

ঈদে শুধু সেমাই বিক্রি ১০৫ কোটি টাকার। করোনাকালে ই-প্ল্যার্টফর্মে গত ১৪ মাসে বিক্রি হয়েছে ১৬ হাজার কোটি টাকা। এর একটা বড় অংশের লেনদেন হয়েছে ঈদকে কেন্দ্র করে। আর পোষাক বিক্রি কত টাকা হয় তা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু ঈদ বাণিজ্য দু'বছর স্থবির হওয়ায় আভ্যন্তরীণ পোষাকখাত অস্তিত্বের সংকটে ভুগছে। পোষাক শিল্পের মালিকরা ধার দেনা, কর্মচারী ছাটাই, ঘর ভাড়া বাকি, ঋণের কিস্তির চাপে আকণ্ঠ নিমজ্জিত। তারা জানে না আগামী দিনের দিশা। সরকার মানুষের জীবিকার অন্বেষণেই হয়তো করোনার আফ্রিকান ও ইন্ডিয়ান ভেরিয়েন্টের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে দোকানপাট খুলে দিয়েছে। কারণ দান-দাক্ষিণ্য দিয়ে তো আর দীর্ঘমেয়াদী জীবন চলে না, মেহনতি পেশার মাধ্যমেই জীবনের স্বয়ংর্ভরতা অর্জন করতে হয়।

করোনাকালের ঈদ বড়ই দুর্বিসহ। অনুপুঙ্খন বিশ্লেষণে দেখা যায় মানুষের কাছে অর্থের প্রবাহ নেই আবার সঞ্চিত কিছু অর্থ থাকলেও এতো দিনে সেটার পুরোটা ক্ষয়িষ্ণু। ঈদ যেন আনন্দ না হয়ে বাড়তি চাপ। মানুষের হাতে টাকা না থাকলে উৎসব কি করে হয়? ঈদের কোলাকুলির ছবি এখন কেবলই স্মৃতি।

বিনোদনকেন্দ্র, পার্ক ইত্যাদিতে এখন যাওয়া বারণ। বরং ঈদের দিনটিও কোনো কোনো পরিবারকে শবযাত্রায় অংশ নিতে হয়।

করোনা পূর্ববর্তী সময়ে ঢাকায় এটিএম বুথ থেকে প্রতিদিন ১৫-২০ কোটি টাকা উত্তোলন হতো ঈদ মৌসুমে। এখন টাকার সঞ্চয় কম বলে উত্তোলনও কম। ঈদ মৌসুমে অন্য যে কোন সময়ের চাইতে ১০ গুন বেশি টাকার লেনদেন হয়। যাকাত ও ফিতরা বাবদ ৭০ হাজার কোটি টাকা গরীবদের মাঝে বিতরণ হয়– এখন সব কিছুতেই করোনাকালে ভাটার টান।

তবে কিছু সংখ্যক মানুষ পোষাকবাজারে ঈদকে সামনে রেখে স্বাস্থ্যবিধি না মেনে এমন উপচে পড়া ভিড় করে, মনে হয় কাপড় না কিনলে হয়তো উলঙ্গ থাকতে হবে। তাদের আচরণে মনে হয় ঈদের পোষাক পড়ে হাসপাতালে যেতে হলেও তারা রাজি। কিন্তু মরার আগে যে বাঁচতে শিখতে হয় এ শিক্ষা কে দিবে?

করোনা মোকাবেলায় সরকারের ভালো কিছু উদ্যোগ থাকলেও বেশ কিছু পরস্পর বিরোধী কর্ম ররেছে। সাম্প্রতিক সময়ে করোনাকে মান্য করে লকডাউনগুলোও মানবিক। বিভিন্ন রেডজোন ছাড়া সারা দেশের লকডাউন একেবারেই ঢিলেঢালা। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাড়া অন্য কোথাও লকডাউনের তেমন কোনো বালাই নেই।

সকালে ঘোষণা দোকানপাট বিকেল ৫টা খোলা কিছুক্ষণ পরই ঘোষণা রাত ৮টা। আর জন-পরিবহন করোনাকালে ঈদ উপলক্ষে ভীড় ও ভাড়া দ্বিগুন হয়েছে। এসব বিষয়ে সরকারের নিউক্লিয়ারের কর্মকর্তাদের গভীর পর্যবেক্ষণ ও ধী শক্তির প্রয়োজন। এতোটা চঞ্চল উদ্যোগ জাতীয় দুর্যোগের কালসমুদ্র পর্বে ইতিবাচক নয়। সরকার করোনার মধ্যেও চলমান প্রকল্পের বাস্তবায়ন হার ধরে রাখতে বদ্ধ পরিকর। এ তালিকায় পদ্মাসেতু হতে মেট্রোরেল অগ্রগণ্য। শুধু তাই নয় গত ৪ মে তারিখে জাতীয় নির্বাহী কমিটি (একনেক) সভায় ১১ হাজার ৯০১ কোটি টাকার ১০টি প্রকল্পের অনুমোদন– সাহসী পদক্ষেপ। ২০৩০ সালের মধ্যে ৫০ বিলিয়ন ডলারের রিজার্ভ গড়ার দ্বারপ্রান্তে এখন বাংলাদেশ। কিন্তু সাধারণ মানুষের মধ্যে ঈদ পূর্ব তারল্য প্রবাহ কম। ফলে ঈদের আনন্দ মলিন ও ধূসর। ঈদে উপলক্ষ্য করে সরকার ৩০ হাজার কোটি টাকার নতুন নোট ছেড়েছে মুজিববর্ষে, ৮ লাখ গৃহহীন মানুষকে ঘর উপহার দিচ্ছে কিন্তু সামষ্টিক অর্থনীতিতে এর প্রভাব কম।

ঈদের মূল চালিকা শক্তি পণ্য ও অর্থের গমনাগমন। সেটা করোনা কালে যথার্থভাবে হচ্ছে না। তবে এই দুর্যোগকালেও একটা সুখের খবর এবছর

রেমিটেন্স প্রবাহ আশাব্যঞ্জক। এর মাধ্যমে আমরা স্বপ্ন দেখতে পারি গ্রামীণ অর্থনীতিতে এই রেমিটেন্স প্রবাহ ঈদ বাজারে কল্যাণনিষ্ঠ প্রভাব ফেলবে।

ঈদ বাজারে করোনার স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা এখন হিমঘরে কিন্তু বেচাকেনার স্কেলে কাঙ্খিত ঊর্ধ্বগতি নেই। শুধু আর্থিক দৈন্যতা নয় করোনায় মানুষের মনোচৈতনিক ভুবনেও এক অসারতা এনে দিয়েছে। মানুষের ভিতর দীর্ঘদিনের ঘরে বসে থাকার ট্রমায় মানুষ যেন আনন্দ দর্শন থেকে অনেকটা দূরে সরে গেছে। মুক্তিযুদ্ধের পর মানুষের জীবন ও জীবিকা নিয়ে এতোটা ভাবতে হয়নি।

করোনার মধ্যে নগরজনেরা হাপিয়ে উঠেছে। যাদের ছোট বাসস্থান তাদের করোনার গৃহবন্ধি দশায় ভ্যাপসা গরম, ঘিঞ্চিঘর– কী করে এতটা আটকা থাকা যায় ভেবে দেখুন! ঈদকে সামনে নিয়ে মাটির টানে গ্রামের খোলামেলা পরিবেশে ক'টা দিন আয়েশ করবে– সে জো নেই। মানুষ করোনার কষাঘাতে একটাই জড়থবু যে, চিরায়ত প্রথায় রমাদানের নেক আমল পালনের মাধ্যমে রহমত ও মাগফিরাতের মাধ্যমে মহান প্রভুর কাছে নিজেকে সমর্পন করতে পারছেনা। আত্মশুদ্ধি ও আত্মোৎসর্গের রমাদানের মহান আহ্বানে নিঃসঙ্গচিত্তে নিজেকে সালিম করা সম্ভব হয়না। এতো অনিশ্চয়তার মাঝে কী একাগ্রচিত্তে স্রষ্টার দিদার লাভের সুযোগ সম্ভব?

করোনাপূর্ব ২০১৮ সালের ঈদুল আযহায় পশু কুরবানি হয়েছিলো ১ কোটি ১৭ লক্ষ পশু। করোনাকালে এই সংখ্যা প্রায় অর্ধেকে নেমে এসেছে। বাংলাদেশে হাইড এন্ড স্কিল মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের তথ্যমতে গতবছর চামড়া ঈদ মৌসুমে সংগ্রহ হয়েছে পূর্বতন বছর থেকে ৪০% কম। ২০১৮ সালের ঈদে ভোক্তা পর্যায়ে যে ৪৫ হাজার কোটি টাকার লেনদেন হয়েছিলো সেই পর্বেও এমন ভাটার টান। ঈদকে কেন্দ্র করে বার্ষিক পেঁয়াজের চাহিদার ২৫ লক্ষ মেট্রিক টন, রসুনের ৬ লক্ষ মেট্রিক টনের ও আদার ৪ লক্ষ মেট্রিক টনের অধিকাংশের চাহিদা ছিলো ঈদকে ঘিরে– এখন এসব চাহিদা অনেক কম।

ঈদের উৎসবের ডামাডোলের বর্ণিল রূপকে মলিন করেছে আতিমরি করোনা। ঈদের মিলন ও সংযোগের চরিত্র এখন বিলিন। বরং ঈদের দিনটাও আরেকটা সঙ্গ নিরোধ ও বিচ্ছিন্ন দিন মাত্র। সারা বছরের খাদ্য, পোষাক, পরিবহন সেক্টরের ব্যবসায়ী, কারিগর, উৎপাদক, আমদানিকারকসহ বহু মানুষ এখন ঈদের আর্থিক সংযোগ নয় বরং দেনার ভয়ে ভীত। কারণ দেশের সামগ্রিক গতি এখন অনেকটা মন্থর। করোনাকালে দেশের হতদরিদ্র মানুষের সংখ্যা ২০ শতাংশ থেকে বেড়ে ৫০ শতাংশে উঠেছে।

গত তিন দশকে মানুষের আর্থিক সামর্থবৃদ্ধি ও যোগাযোগের উন্নয়নের ফলে ঈদের ফ্যাশন ও খাদ্যাভ্যাসে গ্রাম ও শহরে একটা নৈকট্য এসেছিলো। ঈদ আর যাই হোক জৌলুসের কমতি দেখা যায়নি। ঈদ উপলক্ষ্যে ধারদেনার শোধ, অর্থের গমনা-গমন শহর থেকে প্রান্তিকের মানুষের মধ্যে কমবেশি ছিল। ঈদের দিনের ন্যূনতম হাসির রশদ সংগ্রহের জোগারের সামর্থ্য প্রায় প্রতিটি পরিবার অনেকটা অর্জন করেছিল। আজ করোনার কারণে ঈদের সকল সামাজিক অর্থনীতির চিরায়ত রূপের স্বরূপ ধরে রাখতে পারেনি।

ঈদকে কেন্দ্র করে গ্রামবাংলার যে সমাজ-জামাত প্রথা ছিলো সেটিও বর্তমানে ক্রমক্ষয়িষ্ণু। গ্রামের মানুষের ভালো মন্দ বিচার বিবেচনা, সামাজিক নানা বিবাদ ঈদকে কেন্দ্র করে সমাজের বা জামাতের মাধ্যমে রফা হওয়ার রেওয়াজ করোনাকালে আরো দুর্বল হয়েছে।

ঈদের ধর্মীয় রীতির মাধ্যমে যে সামাজিক রেওয়াজ দীর্ঘদিন ধরে চলমান তা এখন ভংগুর। সমষ্টিকভাবে সমাজকে অবলোকন করে ঈদের আনন্দ ভাগাভাগি করে সাম্যের কাতারে একযোগে দাঁড়িয়ে সবাই মিলে সমাজের মূলধারায় মিশে যাওয়ার যে আহবান ঈদের বার্তায় নিহিত ছিলো করোনাকালে নিষ্প্রভ।

বর্তমান ভোগবাদী সমাজ ব্যবস্থায় ঈদকে কেন্দ্র করে একটু হলেও সাম্যের আহবানে সমাজের চিরায়ত বৌদ্ধিক চরিত্র (Intellectual character) যে ইতিবাচক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় সারাবছর সেই গতিটা ধরে রাখা প্রয়োজন।

জীবনে যে উৎসব আনন্দের কতটা প্রয়োজন করোনাকালে ঈদগুলো মিস করে বাঙালি মুসলমান তা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে। আজ এ করোনাকালে স্মৃতির খেরোখাতার পাতা উল্টে মনে পড়ে ছোট বেলায় নানা ভাইয়ের সঙ্গে দলবেঁধে ঈদ ময়দানের প্রাণে জিকিরে-ফিকিরে নানা ভাইকে অনুসরণ করে চলতাম। আজ ঝলমলে কাপড় লেজটুপি পড়ে ঈদের মাঠে যাওয়ার তাড়া নেই। তবে এখনো কানে বেজে ওঠে সেই নানা ভাইয়ের ঈদ মাঠের তাকবীর– আল্লাহু আকবার, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ওয়াল্লাহু আকবার ওয়া লিল্লাহিল হাম্‌দ।

জানি না আবার কবে ঈদ তাকবীরে খোদার প্রাণে উন্মুক্ত প্রান্তরে পরস্পর কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়িয়ে সবাই এক কাতারে নিজেকে সমর্পণ করে মুক্ত হতে পারবো– এই অপার মুক্তির প্রতীক্ষায় এখনও ঈদ উৎসবের জন্য।♦

পবিত্র কুরআন বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদের ইতিহাস

কাজী আখতারউদ্দিন

আধুনিক ভাষায় কুরআন অনুবাদ করার বিষয়টি ইসলামিক ধর্মতত্ত্বে সবসময় একটি কঠিন আলোচ্য বিষয় হয়ে রয়েছে। কেননা মুসলমানরা কুরআনকে অলৌকিক এবং অনুকরণীয় হিসেবে গভীরভাবে শ্রদ্ধা করেন। তারা যুক্তি দেখান যে, কুরআনে বর্ণিত টেক্সটগুলো এর সত্যিকার ধরন থেকে অন্য ভাষায় বা লিখিত আকারে আলাদা করা উচিত নয়। অন্তত মূল আরবি ভাষ্যটি সাথে না রেখে অন্যভাষায় মোটেই অনুবাদ করা উচিত নয়। তাছাড়া হিব্রু বা আরামিক শব্দের মতো রচনার কোন একটি বর্ণনার উপর ভিত্তি করে একটি আরবি শব্দের বিভিন্ন ধরনের অর্থ হতে পারে। সকল সেমেটিক ভাষায় এটা দেখা

যায়। সে তুলনায় ইংরেজি, লাতিন এবং অন্যান্য ভাষায় অনুবাদ করতে গেলে যথাযথ অনুবাদ করা আরো কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

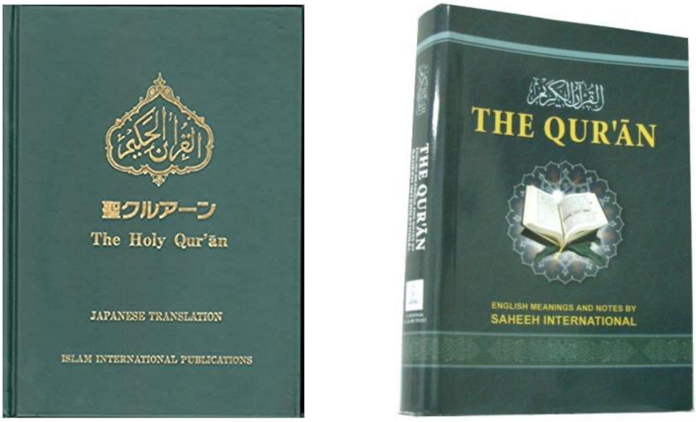

জাপানি ও ইংরেজি ভাষায় অনূদিত পবিত্র কুরআন শরীফ

ইসলামিক ধর্মতত্ত্ব অনুসারে পবিত্র কুরআন একটি দৈববাণী (ঐশীবাণী), যা মূলত আরবি ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে এবং এটি কেবল কুরআনের আরবি ভাষায় আবৃত্তি (তেলাওয়াত) করা উচিত। অন্যান্য ভাষায় কুরআন অনুবাদ যেহেতু মানুষের হাতেই করা হয়, সে-কারণে মুসলমানরা মনে করেন এতে মূল আরবি ভাষার অনন্যসাধারণ (পবিত্র) বৈশিষ্ট্যটি আর থাকে না। এসব অনুবাদে অর্থগুলো অতিসূক্ষ্মভাবে পরিবর্তন করা হয়। যেহেতু ভিন্ন ভাষায় অনুবাদে অবশ্যম্ভাবীরূপে সূক্ষ্মভাবে অর্থ পরিবর্তীত হয়, তাই অনেক সময় এই অনুবাদগুলোকে 'ভাষ্য' বা 'অর্থের অনুবাদ' বলা হয়ে থাকে। এখানে 'অর্থ' বলতে বিভিন্ন অংশের এবং একাধিক সম্ভাব্য অর্থের মধ্যেকার দ্ব্যর্থক বোঝানো হয়েছে। যার সাথে প্রতিটি শব্দ আলাদা করে সংযুক্ত করা যায়। আর পরবর্তী গূঢ়ার্থে স্বীকার করা হয় যে, তথাকথিত অনুবাদটি কেবল একটি সম্ভাব্য ভাষ্য এবং এটাকে মূল বিষয়ের সমার্থক দাবি করা যায় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় ব্রিটিশ ইসলামিক স্কলার ধর্মান্তরিত মুসলিম মোহাম্মদ মার্মাডিউক পিকথাল (৭ এপ্রিল ১৮৭৫-১৯ মে ১৯৩৬) তার অনুবাদটিকে কেবল *কুরআন* না বলে *মহিমান্বিত কুরআনের অর্থ* বলেছেন। ১৯৩০ সালে তিনি পবিত্র কুরআনের যে ইংরেজি অনুবাদ করেন, তার শিরোনাম ছিল *দা মিনিং অব দা গ্লোরিয়াস কোরান।*

কুরআন অনুবাদের কাজটি সহজ নয়; কিছু কিছু স্থানীয় আরবীভাষী নিশ্চিত করে বলেন যে, কুরআনের কোন কোন অংশ মূল আরবী হস্তলিপি বা পাণ্ডুলিপি

পড়েও বোঝা শক্ত। এর একটি অংশই যে কোন অনুবাদের সহজাত শ্রমসাধ্য ব্যাপার। অন্যান্য ভাষার মত আরবি ভাষাতেও একটি মাত্র শব্দের বিভিন্ন অর্থ থাকতে পারে।

কোন একটি রচনা বুঝা এবং অনুবাদের কাজে মানুষের মতামত জড়িত থাকে। এই ব্যাপারটা আরো জটিল করা হয় এই তথ্যটি দিয়ে যে, চিরায়ত এবং আধুনিক আরবি ভাষার মধ্যে শব্দের ব্যবহার বহু পরিমাণে পরিবর্তীত হয়েছে। ফলে কুরআনের কোন আয়াত আরবিভাষীদের কাছে পুরোপুরি পরিষ্কার মনে হলেও, যারা আধুনিক শব্দভাণ্ডার ব্যবহার করতে অভ্যস্ত, তাদের কাছে ঐ আয়াতটির মূল অর্থ পরিস্ফুট নাও হতে পারে।

কুরআনের একটি পরিচ্ছদের (সূরার) মূল অর্থ আবার নির্ভর করে নবী মোহাম্মদের (সা) জীবন এবং প্রথমদিককার আরব-সমাজের ঐতিহাসিক পরিস্থিতির উপর, যেখান থেকে এর উদ্ভব হয়েছিল। রচনার ঐ অংশের বর্ণনা প্রসঙ্গ অনুসন্ধান করতে হলে হাদিস এবং সিরাহ-এর উপর বিস্তারিত জ্ঞান থাকতে হবে। এগুলোও আবার বিশাল এবং যথেষ্ট জটিল রচনা। এটাও একটি অতিরিক্ত অনিশ্চয়তার উপাদান তুলে ধরে, যা অনুবাদের কোন ধরনের ভাষাগত নিয়ম দিয়ে বাদ দেওয়া যায় না।

ইতিহাস

কুরআন প্রথম অনুবাদ হয় সপ্তম শতকের শুরুর দিকে। সালমান আল ফার্সি নামে একজন পারস্যবাসী সূরা ফাতিহা মিডল ফার্সি বা পাহলভি ভাষায় অনুবাদ করেন। হাদিসে বর্ণিত ইসলামের ইতিহাসে জানা যায় যে, ইথিওপিয় সাম্রাজ্যের নেগাস এবং বাইজানটাইন সম্রাট হিরাক্লিয়াস মোহাম্মদের (সা) কাছ থেকে চিঠি পেয়েছিলেন। ঐ চিঠিগুলোতে কুরআনের আয়াত লিপিবদ্ধ ছিল। তবে মোহাম্মদের (সা) জীবদ্দশায় কুরআনের কোন অংশই এইসব ভাষা কিংবা অন্য ভাষায় অনূদিত হয়নি।

দ্বিতীয় অনুবাদ ছিল গ্রিক ভাষায় এবং কন্সটান্টিনোপলের এক পণ্ডিত নিকেটাস বাইজানটিয়াস ৮৫৫ এবং ৮৭০ খ্রিষ্টাব্দের মাঝে রচিত ‘রিফুটেশন অব কুরআন’ (কুরআনকে খণ্ডন করা) নামে একটি রচনায় এটা ব্যবহার করেছিলেন। তবে জানা যায়নি কে এবং কী উদ্দেশ্যে এই অনুবাদটি করেছিল। সম্ভবত এটা কুরআনের একটি পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ ছিল।

কুরআনের সম্পূর্ণ প্রত্যায়িত চিরায়ত ফার্সি ভাষার অনুবাদটি করা হয় ১০ এবং ১২ শতকের মাঝে। সামানিদ সম্রাট প্রথম মনসুর (৯৬১-৯৭৬) খোরাসান

থেকে আগত একদল পণ্ডিতকে মূল আরবি ভাষায় রচিত *তফসির আল তাবারি* ফার্সি ভাষায় অনুবাদ করার নির্দেশ দেন। পরবর্তীতে ১১ শতকে সুফি সাধক খাজা আবদুল্লাহ আনসারির একজন ছাত্র পবিত্র কুরআনের সম্পূর্ণ তফসির ফার্সি ভাষায় অনুবাদ করেন। ১২ শতকে বিশিষ্ট ঐতিহাসিক এবং মোফাস্‌সির কুরআন ফার্সি ভাষায় অনুবাদ করেন। এই তিন অনুবাদের পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত করা হয় এবং এগুলো বেশ কয়েকবার ছাপা হয়েছিল।

১৯৩৬ সালে পবিত্র কুরআনের ১০২টি ভাষায় অনুবাদের কথা জানা গেছে। তবে এরপর ২১ শতক পর্যন্ত পৃথিবীর প্রায় সব ভাষাতেই কুরআনের অনুবাদ হয়েছে।

ইউরোপিয় ভাষা

লাতিন

১১৪৩ সালে পবিত্র কুরআন লাতিন ভাষায় প্রথম অনুবাদ করেন রবার্ট অব কেটন, যিনি রবার্টাস কেটেনেনসিস (১১৪১-১১৫৭) নামে পরিচিত ছিলেন। রবার্ট কেটন ছিলেন একজন ইংরেজ জ্যোতির্বিদ, অনুবাদক এবং যাজক। তার অনুবাদের শিরোনাম ছিল লেক্স মোহামেত সিউডোপ্রফেট (‘জাল/মেকি নবী মোহাম্মদের আইন’) ফ্রান্সের ক্লুনি মঠের অধ্যক্ষ, পিটার দা ভেনেরেবেলের (১০৯২-১১৫৬) নির্দেশে এই অনুবাদটি করা হয়েছিল। বর্তমানে এই অনুবাদ পুস্তকটি প্যারিসের বিবলিওথেক দা লা আর্সেনালে বা আর্সেনাল লাইব্রেরিতে রক্ষিত আছে। আধুনিক পণ্ডিতদের মতে এই অনুবাদটির ‘কিছু নির্দোষ রচনার অংশবিশেষে অতিশয়োক্তি করে এটাকে একটি নোংরা বা অসচ্চিত্র রূপ’ দেওয়ার প্রবণতা ছিল। এছাড়া যেখানে ভাল অর্থ হওয়ার কথা সেখানে অসম্ভাব্য এবং অপ্রীতিকর অর্থ দিতেও ওরা সচেষ্ট ছিল। রবার্ট কেটনের অনুবাদ কর্মটি সুইজারল্যান্ডের ব্যাসল শহরের প্রকাশক থিওডোর বিবলিয়াণ্ডার ১৫৪৩ সালে পুনরায় তিনবার ছাপেন। ক্লুনি করপাস এবং আরো কিছু খ্রিষ্টিয় প্রচারণার সাথে এটা প্রকাশ করা হয়। জার্মান ধর্মযাজক মার্টিন লুথার (১৪৮৩-১৫৪৬) প্রতিটি সংস্করণের ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন। বিবলিয়াণ্ডারের অনুবাদের একটি কপি বতর্মানে বাহরাইনের বায়তুল কুরআনে রক্ষিত আছে। পরবর্তীকালে রবার্ট কেটনের এই লাতিন ভাষ্য থেকেই অন্যান্য ইউরোপীয় ভাষায় কুরআন ‘অনুবাদ’ করা হয়। ওরা কেউ সরাসরি আরবি থেকে কুরআন অনুবাদ করেননি। ফলে কুরআনের বিভিন্ন ইউরোপীয় ভাষায় প্রথমদিককার অনুবাদগুলো ভুলে ভরা এবং বিকৃতভাবে উপস্থাপন করা ছিল।

১৩ শতকের শুরুতে স্পেনের প্রাচীন টলেডো নগরীর চিকিৎসক এবং খ্রিষ্টান যাজক মার্ক (১১৯৩-১২১৬) পবিত্র কুরআনের আরেকটি লাতিন অনুবাদ করেন। অধিক আক্ষরিক এই অনুবাদটির কয়েকটি পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত করা হয়েছিল। এরপর ১৫ শতকে মুর/মুসলিম পণ্ডিত ইসা ইবনে জবিরের সহায়তায় স্পেনের স্বশাসিত এলাকা কাসটিলের সেগোভিয়ার খ্রিষ্টীয় যাজক এবং ধর্মতত্ত্ববিদ জন বা জুয়ান (১৩৯৫-১৪৫৮) আরেকটি অনুবাদ করেন। এর কেবল ভূমিকাটি সংরক্ষিত হয়েছে। ১৬ শতকে জুয়ান গেব্রিয়াল অব টেরুয়েল আরেকটি লাতিন অনুবাদ করার জন্য কার্ডিনাল এগুইডা ডা ভিটেরবোকে সহায়তা করেন (১৫০২ সালে আরাগনের আরো অনেক স্পেনিয় (মুর) মুসলমানের মতো আলি আলাইজারও সম্ভবত খ্রিষ্ট ধর্মে দিক্ষীত হতে বাধ্য হয়েছিলেন এবং ধর্মান্তরিত হওয়ার পর তিনি জোহান গেব্রিয়েল নাম ধারণ করেন)। ১৭ শতকের শুরুতে গ্রিক ধর্মতাত্ত্বিক সিরিল লুকারিস আরেকটি লাতিন অনুবাদ করেন।

১৬৯৮ সালে রোমের সেপিয়েনজা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি ভাষার অধ্যাপক লুইস মারাক্কি (১৬১২-১৭০০) দ্বিতীয় আরেকটি লাতিন অনুবাদ পদুয়ায় প্রকাশ করেন। তাঁর অনুবাদে লাতিনের পাশাপাশি কুরআনের আরবি টেক্সটও ছিল। সেই সাথে বিশদভাবে বোঝার জন্য টীকা সম্বলিত অনুবাদ ছিল। অনুবাদটি ইসলাম বিদ্বেষি হওয়া সত্ত্বেও যথাযথ মন্তব্যসহ তার অনুবাদটি সঠিক ছিল। এছাড়া বিভিন্ন ইসলামি সূত্র থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি অবশ্যই তার সময়ের দিগন্ত প্রসারিত করেছেন।

মারাক্কির অনুবাদটি অন্যান্য ইউরোপীয় ভাষায় কুরআন অনুবাদের একটি উৎস হয়ে দাঁড়ায়। এর মধ্যে সাভারি (১৭৫১) ফরাসি ভাষায় এবং ডেভিড নেরেটার (১৬৪৪-১৭২৬) জার্মান ভাষায় ১৭০৩ সালে অনুবাদ করেন। এছাড়া সাভারির অনুবাদটির সত্যতা নিশ্চিত করার জন্য এর একটি সংস্করণের প্রচ্ছদে উল্লেখ করা হয় যে, এই ভাষ্যটি ১১৬৫ হিজরিতে মক্কায় প্রকাশিত হয়েছে।

আধুনিক ভাষার অনুবাদ

১৫ শতকে পবিত্র কুরআন একটি আধুনিক ইউরোপীয় কাস্টিলিয় স্পেনিয় ভাষায় প্রথম অনুবাদ করেন জুয়ান আন্দ্রেস। তবে এই অনুবাদটি হারিয়ে গেছে। এছাড়া ক্যাটালান ভাষায় কুরআনের আরো কিছু হারানো অনুবাদের কথা শোনা যায়, যার মধ্যে একটি অনুবাদ ১৩৮২ সালে ফ্রান্সিস পন্স স্যাকলোটা করেছিলেন। আরেকটি ক্যাটালান অনুবাদ ১৩৮৪ সালে ফ্রান্সের পেরিপিগনানে দেখা যায়। ১৫৪৭ সালে আন্দ্রেয়া আরিভাবেন ইতালিয় ভাষায় আরেকটি অনুবাদ করেন।

তিনি রবার্ট কেটনের লাতিন অনুবাদ অনুসরণ করেছিলেন। এই ইতালিয় অনুবাদটি ব্যবহার করেই ১৬১৬ সালে নুরেমবার্গের ধর্মযাজক এবং প্রাচ্যবিদ সলোমন শাইগার (৩০ মার্চ ১৫৫১-২১ জুন ১৬২২) প্রথম জার্মান ভাষার অনুবাদটি করেন। এরপর আবার তার জার্মান অনুবাদ থেকে ১৬৪১ সালে ওলন্দাজ ভাষায় পবিত্র কুরআনের প্রথম অনুবাদটি হামবুর্গ থেকে প্রকাশিত হয়।

ফরাসি ভাষার কুরআনের প্রথম অনুবাদ করেন প্রাচ্যবিদ ও কূটনৈতিক আন্দ্রে দু রাইয়ার (আনু. ১৫৮০-১৬৭২)। *L'Alcoran de Mahomet* শিরোনামে ১৬৪৭ এবং ১৭৭৫ সালে তাঁর দুটি অনুবাদ প্রকাশিত হয়। দু রাইয়ারের অনুবাদ থেকে আরো অনেক অনুবাদ হয়েছে, যার মধ্যে স্কটল্যান্ডবাসী লেখক ও ধর্ম যাজক আলেকজান্ডার রসের (আনু. ১৫৯০-১৬৫৪) ইংরেজি অনুবাদটি (১৬৪৯) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আলেকজান্ডার রসের অনুবাদটি অনুসরণ করে জান হেনড্রিক গ্ল্যাজমেকার (১৬১৯-১৬৮২) ওলন্দাজ ভাষায় এবং জোহান ল্যাঞ্জ করেন জার্মান ভাষার অনুবাদ করেন।

ফরাসি ভাষার অনুবাদ (১২টি)

আন্দ্রে দু রাইয়ার প্রথম ফরাসি ভাষায় পবিত্র কুরআন অনুবাদ করেন। *লা' আলকোরান দা মাহোমেত* নামে এই অনুবাদটি ১৬৪৭, ১৬৪৯, ১৬৭২, ১৬৮৩, ১৭১৯, ১৭৩৪, ১৭৭০ এবং ১৭৭৫ সালে প্রকাশিত হয়। দুইশত বছর পর ১৮৪০ সালে অ্যালবার্ট কাজিমিরিস্কি (১৮০৮-২২ জুন ১৮৮৭) নামে ফরাসি-পারসিক কূটনৈতিক দূতাবাসের একজন দোভাষী প্যারিসে এই অনুবাদটি অনুসরণ করে আবার ফরাসি ভাষায় একটি ভাষ্য প্রকাশ করেন। তারপর বিশ শতকের মধ্যভাগে ফরাসি প্রাচ্যবিদ রেজিস ব্লাকের (৩০ জুন ১৯০০-৭ আগস্ট ১৯৭৩) নতুন আরেকটি ফরাসি অনুবাদ প্রকাশ করেন। এর কয়েকবছর পর ১৯৫৯ সালে প্রথম একজন মুসলিম মূল আরবি থেকে ফরাসি ভাষায় পবিত্র কুরআন অনুবাদ প্রকাশ করেন। হায়দরাবাদের বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ ও মোহাদ্দেস ডক্টর মোহাম্মদ হামিদুল্লাহ (১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯০৮-১৭ ডিসেম্বর ২০০২) অনূদিত এই ভাষ্যটি প্যারিস এবং লেবাননে একাধিকবার প্রকাশিত হয়। কেননা অন্য সকল অনুবাদের তুলনায় এই অনুবাদটিকেই ভাষাগতভাবে সবচেয়ে সঠিক বিবেচনা করা হয়, যদিও কোন কোন সমালোচক অভিযোগ করেন যে, এই অনুবাদের কোথাও কোথাও মূল আরবির আবেদনটি খুঁজে পাওয়া যায় না। এছাড়া আলজিরিয় মুসলিম হামজা আবুবকরও (১৫ জুন ১৯১২-৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫) কুরআনের একটি ফরাসি অনুবাদ করেন।

স্পেনিয় ভাষার অনুবাদ

আধুনিক স্পেনিয় ভাষার চারটি পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ বর্তমানে দেখতে পাওয়া যায়।

১. জুলিও কর্টেস সোরোয়া (১৯২৪-২০০৯) অনূদিত, 'আল কোরান' উত্তর আমেরিকায় ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়েছে। তেহরিকে তার্সিলে কুরআন নামে নিউইয়র্কের একটি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান থেকে এই অনুবাদটি প্রকাশিত হয়েছে।

২. আর্জেন্টিনার দুইজন ধর্মান্তরিত মুসলিম আহমেদ আবুদ এবং রাফায়েল কাস্টালানোস 'এল সাগরাদো কোরান' (এল নিলো, বুয়েন্সআর্য়াস, আজেন্টিনা, ১৯৫৩) নামে স্পেনিয় ভাষায় একটি অনুবাদ প্রকাশ করেন।

৩. কামাল মুস্তাফা হালাক অনূদিত 'এল কোরান সাগরাদো' মনোরম হার্ডকভারে মেরিল্যন্ডের *আমানা পাবলিকেশন* থেকে ১৯৯৭ সালে প্রকাশিত হয়।

৪. আবদেল গনি মেলারা নাভিও নামে একজন স্পেনিয় ১৯৭৯ সালে ইসলাম ধর্মে দিক্ষীত হন। তাঁর অনুদিত 'ট্রাডুসিওন-কমেন্টারিও দেল নোবল কোরান' নামে স্পেনিয় ভাষার অনুবাদটি প্রথমে ১৯৯৭ সালে রিয়াদের দারুসসালাম পাবলিকেশন থেকে প্রকাশিত হয়। *দা কিং ফাহাদ প্রিন্টিং কমপ্লেক্সের* কাছে এই অনুবাদটির নিজস্ব একটি ভাষ্য রয়েছে। এর সম্পাদনা করেছেন ওমর কাদুরা এবং ইসা আমের কুইভেদো।

জার্মান অনুবাদ

জার্মান ভাষায় মোট একুশটি অনুবাদ হয়। প্রথম অনুবাদটি ১৬১৬ সালে নুরেমবার্গ থেকে প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে বেশ কয়েকজন মুসলিমও ছিলেন। এঁরা হচ্ছেন– মিসরীয় লেখক ও অনুবাদক মোহাম্মদ আহমেদ রসুল ১৯৮৬ সালে, আহমদ ভন ডেনফার ১৯৯৬ এবং সিরিয় লেখক আমির মোহাম্মদ আদিব জায়দান ২০০৯ কুরআন অনুবাদ করেন।

ইংরেজি ভাষার অনুবাদ

লেখক ও ধর্মযাজক আলেকজান্ডার রস (আনু. ১৫৯০- ১৬৫৪) সর্বপ্রথম ইংরেজি ভাষায় কুরআন অুনবাদ করেন। তিনি ছিলেন ইংল্যান্ডের রাজা প্রথম চালর্সের ধর্মযাজক। দু রাইয়ারের ফরাসি অনুবাদ, *ল' আলকোরান দে মোহামেত* থেকেই তিনি ইংরেজি অনুবাদটি করেছেন। ১৭৩৪ সালে প্রাচ্যবিদ জর্জ সেইল

(১৬৯৭-১৭৩৬) প্রথম সরাসরি আরবি থেকে ইংরেজি ভাষায় কুরআন অনুবাদ করেন। তবে এতে তিনি তাঁর নিজস্ব ধর্মপ্রচারকের দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলন ঘটান। তারপর থেকেই পবিত্র কুরআনের একের পর ইংরেজি অনুবাদ হতে থাকে। ১৮৬১ সালে যাজক এবং ইসলাম বিশেষজ্ঞ জন মেডোস রডওয়েল (১৮০৮-১৯০০) এবং ১৮৮০ সালে ইংরেজ প্রাচ্যবিদ ও পর্যটক এডওয়ার্ড হেনরি পামার (৭ আগস্ট ১৮৪০-১০ আগস্ট ১৮৮২) ইংরেজি অনুবাদ করলেও, বেশকিছু ভুল অনুবাদ এবং ভুল ব্যাখ্যার কারণে তাদের মূখ্য উদ্দেশ্য প্রশ্নের সম্মুখিন হয়। তারপর ১৯৩৭ সালে আরবি ভাষার অধ্যাপক রিচার্ড বেল (১৮৭৬-১৯৫২) এবং ১৯৫০ সালে প্রাচ্যবিদ আর্থার জন আরবারি'র (১২ মে ১৯০৫-২ অক্টোবর ১৯৬৯) পবিত্র কুরআনের ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয়।

পূর্ব বাংলার (বর্তমান বাংলাদেশের) অধিবাসী ডক্টর মির্জা আবুল ফজল (১৮৬৫-১৯৫৬) *দা কুরআন* নামে একটি ইংরেজি অনুবাদ ১৯১১ সালে প্রকাশ করেন। তিনি ভারতের এলাহাবাদে বসবাস করতেন। একজন মুসলিম হিসেবে তিনিই প্রথম মূল আরবিসহ পবিত্র কুরআনের ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর সমসাময়িক মুসলিম জ্ঞানী ব্যক্তিদের মধ্যে ডক্টর আবুল ফজলই প্রথম কুরআনের কালানুক্রমিক বিষয় নিয়ে গবেষণায় আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং এর গুরুত্বের প্রতি মুসলিম জ্ঞানী ব্যক্তিদের মনোযোগ আকর্ষণ করেন।

২০ শতকের শুরুতে ইংরেজি ভাষাভাষি মুসলিমদের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায়, মুসলিম অনুবাদকদের তিনটি ইংরেজি অনুবাদ প্রথম আত্মপ্রকাশ করলো। প্রথমটি ছিল ১৯১৭ সালে প্রকাশিত মাওলানা মোহাম্মদ আলী অনূদিত একটি ইংরেজি সংস্করণ। তবে এতে আহমদিয়া দৃষ্টিভঙ্গির ছোট ছোট কিছু বিষয় অন্তর্ভূক্ত ছিল, যা ভিন্নমার্গী ব্যাখ্যা হওয়ায় অধিকাংশ মুসলমান প্রত্যাখান করেন। এরপর ১৯৩০ সালে ধর্মান্তরিত মুসলিম মার্মাডিউক পিকথাল (৭ এপ্রিল ১৮৭৫-১৯ মে ১৯৩৬) আরো আক্ষরিক একটি ইংরেজি অনুবাদ করেন। এর কিছুদিন পর ১৯৩৪ সালে আবদুল্লাহ ইউসুফ আলি (১৪ এপ্রিল ১৮৭২-১০ ডিসেম্বর) নামে একজন ব্রিটিশ-ভারতীয় ব্যারিস্টার ও মুসলিম পণ্ডিত একটি ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেন। তাঁর অনুবাদে প্রচুর ব্যাখ্যামূলক টীকা ছিল। মূল অনুবাদের সম্পূরক অংশ হিসেবে এতে ছয় হাজারেরও বেশি টীকা ছিল। বিভিন্ন প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান থেকে এই অনুবাদটির ৩০টিরও বেশি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। মার্মাডিউক পিকথাল এবং সউদি সরকারের অর্থানুকূল্যে প্রকাশিত হিলালি-খান অনুবাদের সাথে এই অনুবাদটিও ইংরেজি ভাষাভাষি মুসলমানদের কাছে সবচেয়ে জনপ্রিয় হয়েছে।

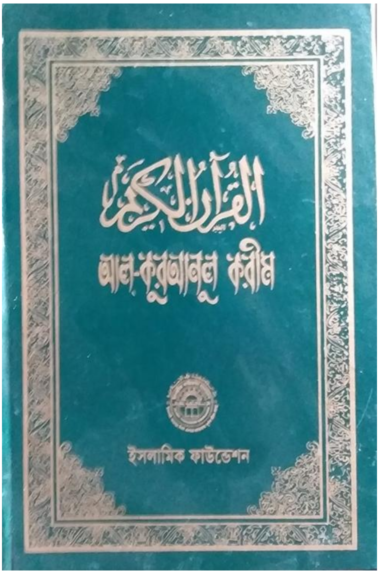

ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে অনূদিত বাংলা ভাষায় পবিত্র কুরআন শরীফ

১৯৫০ থেকে ১৯৮০ সালের মধ্যে আরো কিছু নতুন ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হলেও, এই তিনটি মুসলিম অনুবাদকের অনুবাদকর্ম দিন দিন আরো জনপ্রিয়তা অর্জন করতে থাকে এবং ২১ শতক পর্যন্ত এদের খ্যাতি বজায় থাকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বড় ধরনের অনুবাদ হিসেবে ১৯৫৫ সালে প্রাচ্যবিদ আর্থার আরবারি এবং ১৯৫৬ সালে এন. জে. দাউদ (২৭ আগস্ট ১৯২৭-২০ নভেম্বর ২০১৪) নামে একজন ইরাকি ইহুদি ভিন্নমার্গী ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেন। ইংরেজি অনুবাদের মধ্যে এ.জে.আরবারি অনূদিত *দা কোরান ইন্টারপ্রিটেড* নামের অনুবাদটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ মান হিসেবে গণ্য হয় এবং পেশাজীবী পণ্ডিত এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা এটি ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেন।

আহমেদ রাজা খান বেরেলভির (১৪ জুন ১৮৫৬- ২৮ অক্টোবর ১৯২১) কানজুল ইমানের ইংরেজি অনুবাদটি *দা ট্রেজার অব ফেইথ* নামে পরিচিত। অধ্যাপক ফরিদুল হক এই অনুবাদটি করেন। সহজে বোধগম্য আধুনিক ইংরেজি ভাষায় এটি অনূদিত হয়েছে। বিভিন্ন ব্যাখ্যা বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া হয়েছে, যাতে দ্ব্যর্থকতা এড়ানো যায়। এতে বিষয়গুলো আরো ভালভাবে বুঝতে সহজ হয় এবং একই ধরনের আয়াত অন্য কোথাও থাকলে তা রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে।

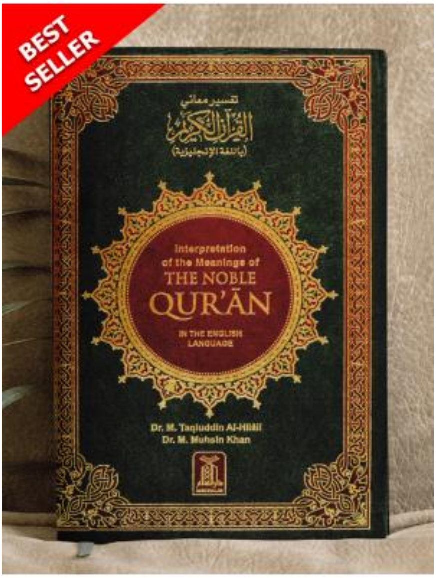

ইংরেজি ভাষায় অনূদিত পবিত্র কুরআন শরীফের বেস্ট সেলার সংস্করণ

পদ্মভূষণ পুরস্কারপ্রাপ্ত ডক্টর সৈয়দ আবদুল লতিফের ইংরেজি অনুবাদটি ১৯৬৭ সালে প্রকাশিত হয়। অনেকে এই অনুবাদটিরও উচ্চ প্রশংসা করেন। তিনি ছিলেন হায়দরাবাদের ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি ভাষার অধ্যাপক।

১৯৭৪ সালে দাক্ষিণাত্যের হায়দরাবাদের হাশিম আমির আলি (১৯০৩-১৯৮৭) প্রকাশ করেন *দা মেসেজ অব দা কোরান: প্রেজেন্টেড ইন পার্সপেকটিভ*। ১৯৩৮ সালে তিনি ডক্টর আবুল ফজলের সান্নিধ্যে এসে কুরআন নিয়ে গবেষণা করার ব্যাপারে গভীরভাবে আগ্রহী হন। এই পর্যায়ে তিনি কুরআনের বিভিন্ন সূরার আয়াতের কালানুক্রমিক ধারার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারেন।

ইহুদি ধর্ম থেকে ধর্মান্তরিত কূটনৈতিক এবং সাংবাদিক মুসলিম মোহাম্মদ আসাদ (২ জুলাই ১৯০০-২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৯২) *দা মেসেজ অব দা কোরআন* (১৯৮০) নামে পবিত্র কুরআন অনুবাদ প্রকাশ করেন। লিওপোল্ড উইস নামে অস্ট্রো-হাংগেরির একটি ইহুদি পরিবারে তাঁর জন্ম। ১৯২৬ সালে তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন।

১৯৮৪ সালে করাচির আকরাশ পাবলিশিং থেকে লেখক ও অধ্যাপক আহমদ আলি (১ জলাই ১৯১০-১৪ জানুয়ারি ১৯৯৪) অনূদিত *আল-কুরআন: এ কনটেমপরারি ট্রান্সলেশন* প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে যথাক্রমে ১৯৮৭ সালে

অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, দিল্লি; প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি প্রেস, নিউ জার্সি থেকে ১৯৮৮ এবং ২০০১ পুনঃপ্রকাশিত হয়। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুর রহমান মালিক বলেন, 'এই অনুবাদে কুরআনের মূল ভাষা এবং ছন্দোলয় প্রতিফলিত হয়েছে। এটি অনুবাদের সনাতন ধারা থেকে বের হয়ে এসে গুরুত্বপূর্ণ ধারণা সমূহের আরো পরিমার্জিত এবং সুক্ষ্ণ পার্থক্যের মাত্রা তুলে ধরেছে। নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্রান্সিস এডওয়ার্ড পিটার্সের মতে, 'আহমেদ আলির অনুবাদকর্মটি স্বচ্ছ, সরাসরি এবং রুচিশীল। রচনাশৈলীগত গুণের এত সমাহার কুরআনের অনুবাদে খুব কমই দেখা যায়। আমি যে কয়টি কুরআনের অনুবাদ পড়েছি, তার মধ্যে তাঁর অনুবাদটিই সেরা।'

১৯৭৩ সালে জ্বালানি তেলের সংকট, ইরানের বিপ্লব, দা ন্যাশন অব ইসলাম এবং ঠাণ্ডা যুদ্ধের একটি নতুন ঢেউ উঠে। যার ফলে ১৯৮০ সালের শুরুর দিকে ইউরোপ এবং উত্তর আমেরিকার উদ্দেশ্যে মুসলিম অভিবাসীর ঢল শুরু হয়। ফলে পশ্চিম ইউরোপ এবং উত্তর আমেরিকায় এই প্রথম ইসলাম পাদপ্রদীপের আলোর সামনে চলে আসে। এই সুযোগে পশ্চিমা জগতের প্রকাশকরা পবিত্র কুরআনের ইংরেজি অনুবাদের নতুন চাহিদার উপর ভিত্তি দেখে ব্যবসা করার সুযোগ খুঁজে পেতে চেষ্টা শুরু করে। অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস এবং পেঙ্গুইন বুকস এসময়ে একের পর এক কুরআনের ইংরেজি সংস্করণ বের করতে থাকে। এদিকে সউদি সরকারও ইউসুফ আলির মূল অনুবাদটির নিজস্ব একটি সংস্করণ প্রকাশ করেন। কানাডিয় মুসলিম অধ্যাপক টি.বি. ইর্ভিং অনূদিত 'মডার্ন ইংলিশ' অনুবাদটিও (১৯৮৫) এই সময়কার একটি বড় ধরনের মুসলিম অনুবাদ প্রচেষ্টা ছিল।

১৯৮৯ সালে আরিজোনা অঙ্গরাজ্যের টাকসনের ইসলামিক প্রডাকশন থেকে রাশাদ খলিফা (১৯ নভেম্বর ১৯৩৫-৩১ জানুয়ারি ১৯৯০), *কুরআন: দা ফাইনেল টেস্টামেন্ট* নামে একটি অনুবাদ প্রকাশ করেন। তাঁর অনুবাদটিতে বিতর্কিত ব্যক্তব্য ছিল এবং পবিত্র কুরআন নিয়ে তিনি যে গবেষণা করেছিলেন, তা পাশ্চাত্যে তেমন কদর পায়নি।

১৯৯০ সালের পর থেকে পশ্চিম ইউরোপ এবং আমেরিকায় ইংরেজি ভাষাভাষি বহু মুসলমান স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। ফলে পবিত্র কুরআনের ইংরেজি অনুবাদের চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় আরো কয়েকটি বড় আকারের মুসলিম অনুবাদ প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে ১৯৯০ সালে প্রথম একজন মুসলিম নারী অনূদিত কুরআনের ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয়। আমাতুল রহমান ওমর নামে এই মহিলা ও তাঁর স্বামী আব্দুল মান্নান ওমর এই অনুবাদটি প্রকাশ করেন।

১৯৯১ সালে ঢাকায় মোহাম্মদ খলিলুর রহমান (১৯০৬-১৯৮৮) : *দা ক্ল্যারিঅন কল অব দা এটারন্যাল কুরআন* শিরোনামে একটি ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেন। তিনি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন লেকচারার শামসুল উলামা মাওলানা মোহাম্মদ ইসহাকের জ্যেষ্ঠ পুত্র।

১৯৯৬ সালে সউদি সরকার 'দা হিলালি-খান কুরআন' নামে পবিত্র কুরআনের একটি নতুন ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেন। এই সংস্করণটি সউদি সরকার সমগ্র বিশ্বে বিনামূল্যে বিতরণ করেন। তবে এই অনুবাদটিকে তাদের নিজস্ব কোন ব্যাখ্যার সাথে সমার্থক হওয়ার কারণে কেউ কেউ সমালোচনা করেন। এর অনুবাদক ছিলেন মরোক্কোর মোহাম্মদ তকিউদ্দিন আল হিলালি (১৮৯৩-১৯৮৭) এবং আফগান লেখক ও চিকিৎসক মোহাম্মদ মোহসিন খান (১৯২৭-)।

দা *সহিহ ইন্টারন্যাশনাল* নামে একটি ইংরেজি অনুবাদ ১৯৯৭ সালে সউদি আরব থেকে প্রকাশিত হয়। তিনজন আমেরিকান ধর্মান্তরিত মুসলিম নারী এই অনুবাদটি করেন। এই অনুবাদটি অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। এরা হলেন ক্যালিফোর্নিয়ার এমেলি আসামি, ধর্মান্তরিত হওয়ার পর আমিনা; অরল্যান্ডোর মেরি কেনেডি এবং আমাতুল্লাহ বান্টলি।

১৯৬৮ সালে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে আমেরিকান নারী আইশা আবদুর রহমান বেউলি (১৯৪৮-) তাঁর স্বামী হাজি আবদাল হক বেউলির সহায়তায় কুরআনের একটি নতুন ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেন। '*দা নোবল কুরআন-এ নিউ রেন্ডারিং অব ইটস মিনিং ইন ইংলিশ*' শিরোনাম এই অনুবাদটি ১৯৯৯ সালে বুকওয়ার্ক প্রকাশনা থেকে প্রকাশিত হয়। ২০০৫ এবং ২০১১ সালে এর সংশোধিত সংস্করণ পুনরায় প্রকাশিত হয়।

২০০০ সালে চারজন তুর্কি সুন্নি পণ্ডিত সমন্বয়ে গঠিত একটি কমিটি *দা ম্যাজেস্টিক কুরআন: এন ইংলিশ রেনডিশন অব ইঁস মিনিংস* নামে একটি অনুবাদ প্রকাশ করেন। ওরা কাজটি এভাবে ভাগ করে সম্পন্ন করেন– প্রফেসার ডক্টর নুরুদ্দিন উজুনগ্লু ১ থেকে ৮ পর্যন্ত সূরা; ডক্টর তউফিক রুস্তু তপুজুগ্লু : ৯-২০; প্রফেসার ডক্টর আলি ওজেক: ২১-৩৯; প্রফেসার ডক্টর মেহমেত মাকসুতগ্লু: ৪০-১১৪ পর্যন্ত সূরাসমূহ অনুবাদ করেন। বিস্তারিত টীকা ও ব্যাখ্যাসহ অনুবাদটি আধুনিক স্ট্যান্ডার্ড ইংরেজি ভাষায় করায় অন্যান্য পুরোনো অনুবাদের চেয়ে এটা বুঝতে সহজ ছিল।

ইরানি কবি ও লেখক তাহেরা সফারজাদেহ (১৯৩৬-২৫ অক্টোবর ২০০৮) 'দা কুরআন ইন পার্সিয়ান এন্ড ইংলিশ' নামে একটি দ্বিভাষিক অনুবাদ ২০০১

সালে প্রকাশ করেন। আমাতুল রহমান ওমর এবং আইশা বিউলির পর ইনিই হচ্ছেন তৃতীয় নারী, যিনি কুরআনের ইংরেজি অনুবাদ করেছেন। তবে তিনিই প্রথম কুরআনের দ্বিভাষিক অনুবাদক।

২০০৩ সালে ৮টি ভলিউমের মারিফুল কুরআন ইংরেজি অনুবাদ সম্পন্ন করে প্রকাশিত হয়। পাকিস্তানের মোহাম্মদ তকি উসমানি (৩ অক্টোবর ১৯৪৩-) এবং তাঁর ভাই ওয়ালি রাজি উসমানি এবং তাঁর শিক্ষকবৃন্দ অধ্যাপক হাসান আসকারি এবং মোহাম্মদ শামিমের সহযোগিতায় এই অনুবাদটি করা হয়।

২০০৪ সালে লন্ডনের অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে মিসরীয় অধ্যাপক মোহাম্মদ আবদেল হালিম কুরআনের একটি নতুন ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেন। ২০০৫ এবং ২০০৮ সালে এর সংশোধিত সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

২০০৬ সালে তুর্কি লেখক আলি উনাল (১৯ জানুয়ারি ১৯৫৫-) অনূদিত *দা কুরআন উইথ অ্যানোটেটেড ইন্টারপ্রিটেশন ইন মডার্ন ইংলিশ* প্রকাশিত হয়। অনুবাদের চেয়ে এটাকে অনেকটা সহজ তফসির মনে হয়। তিনি আধুনিক ইংরেজি ভাষায় অনূদিত এই ভাষ্যটিতে বিভিন্ন জায়গায় সংক্ষিপ্ত টীকা বন্ধনীর মধ্যে যুক্ত করেছেন।

২০০৭ সালে *কুরআন: এ রিফর্মিস্ট ট্রান্সলেশন*, প্রকাশ করেন কুর্দি-আমেরিকান লেখক এদিপ ইউকসেল (২০ ডিসেম্বর ১৯৫৭-) লায়েথ সালেহ আল-শাবান এবং মার্থা শুলট নাইফা।

২০০৭ সালে, *দা মিনিংস অব দা নোবল কুরআন উইথ এক্সপ্ল্যানেটারি নোট* শিরোনামে একটি অনুবাদ করেন মোহাম্মদ তকি উসমানি। প্রথমে দুই খণ্ডে প্রকাশিত হলেও পরবর্তীতে এক খণ্ডে প্রকাশিত হয়। এছাড়া তিনি সহজ উর্দুতেও পবিত্র কুরআনের অনুবাদ করায় তাঁকেও দুইভাষায় একজন কুরআন অনুবাদক বলা যায়।

২০০৭ সালে ইরানি-আমেরিকান লেখক এবং অনুবাদক লালেহ মেহরি বখতিয়ার (২৯ জুলাই ১৯৩৮-১৮ অক্টোবর ২০২০) *দা সাবলাইম কুরআন* নামে একটি ইংরেজি সংস্করণ প্রকাশ করেন। ইনি ছিলেন কুরআন অনুবাদ করা দ্বিতীয় আমেরিকান নারী।

২০০৯ সালে ভারতীয় ইসলাম বিশেষজ্ঞ ওয়াহিদউদ্দিন খান (১ জানুয়ারি ১৯২৫-২১ এপ্রিল ২০২১) কুরআন ইংরেজি অনুবাদ করেন। গুডওয়ার্ড বুকস থেকে এই অনুবাদটি প্রকাশিত হয়, *দা কুরআন: ট্রান্সলেশন এন্ড কমেন্টারি উইথ প্যারালাল এরাবিক টেক্সট*। সহজ এবং আধুনিক ইংরেজি ভাষা ব্যবহারের কারণে এই অনুবাদটিকে অত্যন্ত সহজবোধ্য বিবেচনা করা হয়। দাওয়াত কার্যক্রমের

জন্য কেবল ইংরেজি টেক্সটসহ এই অনুবাদটির পকেট সাইজ সংস্করণটি ব্যপকভাবে বিলি করা হয়।

সমগ্র কুরআনের অন্তমিলযুক্ত-ছন্দোবদ্ধ পংক্তির একটি সংস্করণ ইংরেজিতে অনুবাদ করেন আমেরিকান লেখক ও চিন্তাবিদ থমাস ম্যাকএলওয়াইন (১৯৪৯-)। অন্তমিলযুক্ত টীকা বা ব্যাখ্যাসহ ২০১০ সালে প্রকাশিত এই অনুবাদটি হার্ডব্যাক সংস্করণের শিরোনাম ছিল *দা বিলোভেড এন্ড আই, ভলিউম ফাইব* এবং পেপারব্যাকের শিরোনাম ছিল *দা বিলাভেড এন্ড আই: কনটেমপ্লেশন অন দা কুরআন।*

২০১৫ সালে আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর. মুস্তাফা খাত্তাব দা ক্লিয়ার কুরআন: এ থিমেটিক ইংলিশ ট্রান্সলাশেন নামে একটি অনুবাদ কর্ম সম্পন্ন করেন। একদল বিশেষজ্ঞ, সম্পাদক এবং প্রুফ-রিডারের সহায়তায় তিন বছরে কাজটি শেষ করা হয়। স্পষ্ট/স্বচ্ছতা, নির্ভুল এবং সাবলীল হিসেবে বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ এই অনুবাদটি কানাডা থেকে প্রথম প্রকাশিত কুরআনের একটি ইংরেজ অনুবাদ।

তুর্কি পণ্ডিত হাক্কি ইলমাজ (১৯৪৯-) কুরআনের আরবি শব্দগুলোর মূল অর্থ নিয়ে কাজ করেন এবং তেবিইন-উল কুরআন নামে একটি গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন। এছাড়া তিনি (Order of Revelation) ঐশীবাণীর ধারাবাহিকতার নিয়ম মেনে আলাদা আলাদাভাবে তুর্কি ভাষায় ব্যাখ্যা প্রকাশ করেন।

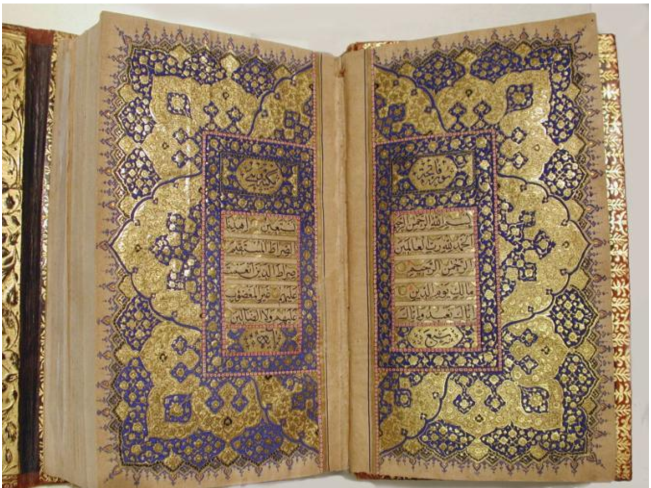

ঊনিশ শতকের শুরুতে মেট্রোপলিটন মিউজিয়ামে সংরক্ষিত পবিত্র কুরআন শরীফ

২০১৮ সালে ব্রিটিশ-পাকিস্তানি বিজ্ঞানী ও ইসলাম বিশেষজ্ঞ ডক্টর মোশারফ হোসাইন *দা ইনফলিবল ওয়ার্ড অব আল্লাহ* শিরোনামে কুরআনের ইংরেজি অনুবাদের একটি পাঠক-বান্ধব উপস্থাপনা প্রকাশ করেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল পাঠককে সহায়তা করা যাতে পাঠক পাঠ্য বিষয়ের বক্তব্য বুঝতে পারেন এবং কুরআনের চলমান এবং রূপান্তরিত বার্তাগুলো শিখতে পারেন। শিরোনামসহ এতে ১৫০০ কর্ম-অংশ ছিল। বাংলাদেশের ডক্টর মোহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান ইংরেজি ও বাংলা, দুই ভাষাতেই কুরআন অনুবাদ করেন।

এছাড়া মোহাম্মদ জাফরুল্লাহ, মৌলভি শের আলি, আল-হজ্জ হাফিজ গুলাম সারওয়ার, মাওলানা আবদুল মজিদ দরিয়াবাদি, খাদিম রহমান নুরি, ডক্টর জহুরুল হক, ডক্টর এস. এম আফজালুর রহমান, তারিফ খালিদি, শাব্বির আহমদ, আলি কুল কারাই, থমাস ক্লিরি, সৈয়দ ভিকার আহমদ, মুফতি আফজাল হোসেন ইলিয়াস, এজে দ্রোজ, তাতাল ইতানিসহ আরো অনেকে ইংরেজি অনুবাদ করেছেন।

অন্যান্য ইউরোপীয় ভাষার মধ্যে ওলন্দাজ ভাষায় উনিশটি, আলবেনিয় ভাষায় পাঁচটি, আর্মেনিয় ভাষায় পাঁচটি, বসনিয় ভাষায় দশটি, বুলগেরিয় ভাষায় একটি, চেক ভাষায় তিনটি, ফিনিশ ভাষায় তিনটি, জর্জিয় ভাষায় দুটি, ইতালিয় ভাষায় ১১টি, কাজাক ভাষায় সাতটি, পর্তুগিজে সাতটি, রোমানিয় ভাষায় চারটি, পোলিশ ভাষায় তিনটি, সুইডিশ ভাষায় তিনটি এবং রুশ ভাষায় ১৪টি, আলবেনিয় ভাষায় পাঁচটি অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে।

এশিয় ভাষার অনুবাদ

ফার্সি

ফার্সি ভাষায় ৬০টির বেশি অনুবাদ হয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য–

সপ্তম শতকে সালমান আল ফার্সির আংশিক অনুবাদ।

সৈয়দ মাখদুম আশরাফ জাহাংগির সিমনানি (১৩০৮-১৪০৫)।

প্রথম ভারতীয় শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভি (১৭০৩-১৭৬২) ফার্সি ভাষায় অনুবাদ করেন।

ইরানি মরমিবাদি কবি মির্জা মেহেদি ইলাহি গুমশাহি (১ জানুয়ারি ১৯০১-১৫ মে ১৯৭৩)।

মাহদি ফাওলাদবন্দ (-আগস্ট ২০০৮)।

নাসের মাকারেম শিরাজি (২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯২৭-)।

কবি ও লেখক অধ্যাপক তাহেরা সফরজাদেহ (১৯৩৬-২৫ অক্টোবর ২০০৮) ফার্সি এবং ইংরেজি ভাষায় কুরআন অনুবাদ করেছেন।

তুর্কি

তুর্কি ভাষায় পবিত্র কুরআনের পঞ্চাশটিরও বেশি অনুবাদ হয়েছে। তুর্কি ভাষায় প্রথম কুরআন অনুবাদ হয় ১১ শতকে। ১৩৬৩ সালে খাওয়ারাজম তুর্কি অনুবাদের হাতে লেখা কপিটি বর্তমানে ইস্তামবুলের সুলেমানিয়া লাইব্রেরি, হেকিমগলু আলি পাশা মসজিদ নম্বর ২ রেজিস্টার করা আছে। কুরআনের অন্যান্য ভাষায় অনুবাদের মতো খাওয়ারিজম তুর্কি ভাষার অনুবাদটিও ভাষা নিয়ে গবেষণা বা ভাষা চর্চার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। কেননা লিখিত টেক্সটের পবিত্রতা রক্ষার জন্য অনুবাদের সময় অনুবাদককে অত্যন্ত সতর্ক হতে হয়। এছাড়া ধর্মীয় পরিভাষার প্রতি মনোযোগ দেওয়া হয়, যাতে মানুষ তা বুঝতে পারে আর তাই তুর্কি ভাষার শব্দের উপর জোর দেওয়া হয়। জি. সাগোল এই অনুবাদ নিয়ে কাজ করেছেন। মোহাম্মদ হামদি ইয়াজির ১৯৩৫ সালে হাক দিনি কুরান দিলি তুর্কি ভাষায় প্রকাশ করেন।

১৯৯৯ সালে এদিপ ইউকসেল কুরআনের তুর্কি অনুবাদ, MESAJ মেসাজ শিরোনামে প্রকাশ করেন। হাক্কি ইলমাজ কুরআনের শব্দের মূল অর্থ নিয়ে কাজ করে তাবিঈন উল কুরআন নামে ২০১২ সালে একটি গবেষণা পুস্তক প্রকাশ করেন।

হিব্রু ভাষা

২০১৯ সালে ওজ ইওনা ও তার দল কুরআনের হিব্রু ভাষার অনুবাদ প্রকাশ করেন। গুডওয়ার্ড বুকস প্রকাশনা থেকে এটি প্রকাশিত হয়। এছাড়া অ্যারন বেন শেমেশ (১৯৭১), উরি রুবিন (২০০৫) অনুবাদ করেন।

ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন ভাষার অনুবাদ

পশতু

পশতু ভাষায় বহু অনুবাদ হয়েছে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে– সর্বপ্রথম ১৮ শতকে মাওলানা মোহাম্মদ ইলিয়াস (আখনজাদা) কুরআন অনুবাদ করেন আফগানিস্তানে। ১৮ শতকে মোহাম্মদ ফাতুল্লা খান কান্দাহারির আরেকটি অনুবাদ প্রকাশিত হয় ভুপাল থেকে। এরপর কবি ও লেখক মৌলভি মুরাদ আলি খান সাহিবজাদা ১৯১৭ সালে, মাওলানা আবদুল্লা ও মাওলানা আবদুল আজিজ ১৯৩০ (মুম্বাই), ডক্টর দিন মোহাম্মদ খান, মাওলানা জানবাজ সরফরাজ খান, মৌলভি সুলতান আজিজ খান এবং মৌলভি ফারুক খান গাজির নাম উল্লেখযোগ্য।

সিন্ধি অনুবাদ (মোট ১২ টি)

আখন্দ এজাজ উল্লা মোতাওয়ালি ছিলেন সিন্ধু প্রদেশের একজন মুসলিম ধর্মতাত্ত্বিক। তিনিই প্রথম ১৮৭০ সালে পবিত্র কুরআন আরবি থেকে সিন্ধি ভাষায় অনুবাদ করেন। সিন্ধি ঐতিহ্য মতে ২৭০ হিজরি/৮৮৩ খ্রিষ্টাব্দে একজন আরব পণ্ডিত প্রথম সিন্ধি ভাষায় কুরআন অনুবাদ করেন। পরবর্তীতে ইমাম আবুল হাসান বিন মোহাম্মদ সাদিক আল সিন্ধি আল মা এটা সিন্ধি ভাষায় অনুবাদ করেন।

উর্দু অনুবাদ

দিল্লির হাদিস শিক্ষক শাহ আবদুল আজিজ দেহলভির (১১ অক্টোবর ১৭৪৬-৫ জুন ১৮২৪) ভাই শাহ আবদুল কাদির দেহলভি ১৮২৬ খ্রি. প্রথম উর্দু ভাষায় কুরআন অনুবাদ করেন। মাওলানা আশিক ইলাহি মারাঠিও উর্দুতে কুরআন অনুবাদ করেন। তফসির এ মেরাঠি কুরআনের একটি বিখ্যাত উর্দু অনুবাদ। এর সাথে আশিক ইলাহি বুলন্দশাহরির (১৯২৫-২০০২) তারসিয়ের এবং শান এ নজুল রয়েছে উর্দুতে। ১৯৬১ সালে গুলাম আহমদ পারভেজ (১৯০৩-১৯৮৫) করেন মাফহুম উল কুরআন। এছাড়া মোহাম্মদ তাহির উল কাদরিও (১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৫১-) ইরফানুল কুরআন নামে একটি উর্দু অুনবাদ প্রকাশ করেন। ২০১৪ সালে আবদুল্লার অনূদিত মুতালাহ কুরআনও একটি উর্দু অনুবাদ।

বাংলা অনুবাদ

বাংলাদেশের নরসিংদির পাঁচদোনা গ্রামের গিরিশ চন্দ্র সেন (আনু. ১৮৩৫-১৫ আগস্ট ১৯১০) নামে ব্রাহ্ম সমাজের একজন মিশনারি ফারসি থেকে পবিত্র কুরআনের সম্পূর্ণ বাংলা অনুবাদ করার পর টীকাসহ ১৮৮৬ সালে প্রকাশ করেন। এছাড়া আরো কয়েকজন অমুসলিম/হিন্দু পণ্ডিত কুরআনের আংশিক, বিশেষত আমপারা বাংলায় অনুবাদ করেন। এরা হচ্ছেন রাজেন্দ্রকুমার মিত্র (১৮৭৯), বসন্তকুমার মুখোপাধ্যায় (১৯৩৭), কিরন গোপাল সিং (১৯০৮), তারাচরণ বন্দোপাধ্যায় (১৮৮২) এবং শ্রী ফিলিপ বিশ্বাস (১৮৯১)। (*সূত্র: বাংলাভাষায় কোরান চর্চার পটভূমি ও অমুসলিমদের দ্বারা তার প্রচার ও প্রসার, ডক্টর মোহাম্মদ মুজিবর রহমান, শেখ প্রকাশনি, কলকাতা, ২০১১, পৃ ৭৬)*

আর প্রথমদিককার মুসলিম অনুবাদকদের মধ্যে রংপুরের মাওলানা আমিরুদ্দিন বসুনিয়া (১৮০৮) কবিতার আকারে একটি অসমাপ্ত বাংলা অনুবাদ করেছিলেন।

এছাড়া মির ওয়াহিদ আলি (১৮৬৮), মাওলানা মোহাম্মদ নাঈমউদ্দিন (১৮৮০), তসলিমউদ্দিন আহমদ (১৯০৭)। শেখ আবদুর রহিমও (১৮৫৯-১৯৩১) কুরআনের বেশ কয়েকটি আয়াত বাংলায় অনুবাদ করেন। তবে প্রথম মুসলমান হিসেবে পশ্চিমবঙ্গের কান্দিপুরের মাওলানা আব্বাস আলি কুরআনের সম্পূর্ণ বাংলা অনুবাদ (১৯০৬) করেন। এছাড়া পবিত্র কুরআনের বাংলা অনুবাদক হিসেবে শাহ মোহাম্মদ সগীরসহ (১৩৮৯) আরো অনেকের নাম শোনা যায়। এমনকি জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামও আমপারা অনুবাদ করেছেন। (সূত্র : কালের কণ্ঠ)

টাঙ্গাইলের মোহাম্মদ নইমুদ্দিন কুরআনের প্রথম দশটি অধ্যায় বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন। এছাড়া কুরআনের বহু ব্যাখ্যা বাংলা ভাষায় পাওয়া যায়। আজাদ পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক মোহাম্মদ আকরম খান (১৮৬৮-১৮ আগষ্ট ১৯৬৯) ১৯২৬ সালে ব্যাখ্যাসহ কুরআনের ৩০ পারা বাংলায় অনুবাদ করেন। ১৯৩৮ সালে মোহাম্মদ নকিবুল্লাহ খান এবং মাসিক মদিনা পত্রিকার সম্পাদক মাওলানা মুহিউদ্দিন খানও (১৯৩৫-২০১৬) মারিফুল কুরআন বাংলায় অনুবাদ করেছেন। পর্যায়ক্রমে বাংলায় আরো অনুবাদ করেন, ডক্টর মোহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান (মৃ. জানুয়ারি ২০১৪), আল কুরআনুল হাকিম নামে, নুরুর রহমান ১৯৮৪, প্রফেসার মাওলানা হাফেজ শেখ আইনুল বারি আলাভি, ২০০৫, (কলকাতা/সুফিয়া প্রকাশনি)। রফিকুর রহমান চৌধুরী, ২০১১। বিচারপতি মুহম্মদ হাবিবুর রহমান, মোহাম্মদ মুজিবুর রহমান, ডক্টর আবুবকর মোহাম্মদ জাকারিয়া। সর্বোপরি সাধু ভাষায় সরকারিভাবে বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকেও আল কুর-আনুল করিম নামে বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। একটি সম্পাদনা পরিষদ এই অনুবাদটি করেছেন। এ পর্যন্ত এই অনুবাদটিই সেরা এবং একমাত্র নির্ভরযোগ্য হিসেবে বিবেচিত। এই অনুবাদটি ১৯৬৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়। দেশের শীর্ষস্থানীয় ১৯ জন আলিম ও শিক্ষাবিদদের নিয়ে গঠিত একটি সম্পাদক পরিষদ এই অনুবাদটি করেন। এ পর্যন্ত এই অনুবাদটির অন্তত ষাটতম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে।

অসমিয়া অনুবাদ

ডাক্তার জহুরুল হক (১১ অক্টোবর ১৯২৬-১৮ জানুয়ারি ২০১৭) নামে আসামের করিমগঞ্জের একজন বাঙালি ইসলামি বিশেষজ্ঞ বাংলা (১৯৮৬) ও অসমিয়া ভাষায় কুরআন অনুবাদ করেন।

হিন্দি

১৯১০ সালে আলা হজরত ইমাম আহমদ রেজা খান কানজুল ইমান হিন্দি ভাষায় অনুবাদ করেন।

কুরআন শরিফ: অনুবাদ আউর ব্যাখ্যা প্রকাশ করেন আরশাদ মাদানি এবং প্রফেসার সুলাইমান (১৯৯১, নিউদিল্লি)।

লখনউ থেকে আল্লামা ডক্টর সাঈদ আলি ইমাম জায়দি। এরপর গুলাম রাজিক শেখ ২০১১ সালে অনুবাদ করেন উর্দু থেকে।

গুজরাটি মোট চারটি অনুবাদ

মাওলানা হাসান আদম কলভানি উর্দু থেকে কানজুল ইমানের গুজরাটি ভাষায় অনুবাদ করেন। এছাড়া দিব্য কোরান এবং কোরান মজিদ গুজরাটি তরজমা সাথে নামেও দুটি অনুবাদ হয়েছে।

তামিল ভাষার পাঁচটি অনুবাদ

শ্রীলঙ্কার শেখ মোস্তাফা (১৮৩৬-২৫ জুলাই ১৮৮৮) বেরুওয়ালা ফাথুর-রামা ফি তরজমাতি তাফসির আল-কুরআন অনুবাদ করেন। পরবর্তীতে ভারতের তামিলনাড়ু ও আবদুল হামিদ ভাকাভিও তামিল ভাষায় কুরআন অনুবাদ করেন। এছাড়া ইকবাল মাদানি, মৌলভি পি জয়নুল আবেদিন উলাভিও অনুবাদ করেন।

সংস্কৃত ভাষায়

ভারতের দেওবন্দের মুসলিম নারী রাজিয়া সুলতানা সর্বপ্রথম পবিত্র কুরআন সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদ করেন। এই কাজটি সম্পন্ন করতে তাঁর ১২ বছর লেগেছিল। তবে ইতিপূর্বেও কুরআন সংস্কৃতে অনুবাদ হওয়ার কথা জানা যায়। দুটি সংস্কৃত ভাষ্য হচ্ছে– কুরান শরিফ, দা হোলি কুরান, কানপুর: রাজ্জাকি প্রেস ১৮৯৭, পৃ–৬১৬। মোহাম্মদ ইউসুফ, কাদিয়ান এবং অমৃতসর ১৯৩২, পৃ-৭২৪ (RCICA)। এছাড়া জায়জা ত্রাজিম কুরানি মতে এইচ. গান্দা রাও অনূদিত আরেকটি সংস্কৃত ভাষ্য রয়েছে। বিশিষ্ট পণ্ডিত এবং পর্যটক রাহুল সাংকৃতায়ন (১৮৯৩-১৯৬৩) যখন কারাগারে ছিলেন, তখন তিনি কুরআন সংস্কৃতে অনুবাদ করেন।

এছাড়া বেলুচি ভাষায় তিনটি, কানাড়া ভাষায় সাতটি, কাশ্মিরি ভাষায় দুটি, মালয়ালাম ভাষায় তেরোটি, মনিপুরি ভাষায় একটি, মুলতানি (সারাইকি) ভাষায় অন্তত ২০টি, সিংহলী ভাষায় একটি, তেলেগু ভাষায় আটটি অনুবাদ হয়েছে।

জাপানি

জাপানি ভাষায় মোট সাতটি পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ হয়েছে। ১৯২০ সালে সর্বপ্রথম সাকামতো কেনিচি রডওয়েলের ইংরেজি অনুবাদ থেকে জাপানি ভাষায় কুরআন

অনুবাদ করেন। এরপর ১৯৩৮ সালে তাকাহাশি গরো, বানপাছিরো (আহমদ) আরিগা এবং মিজুহো ইয়ামাগুচি জাপানি ভাষার দ্বিতীয় অনুবাদটি করেন। ১৯৫০ সালে শুমেই ওকাওয়া, ১৯৫৭ সালে তোশিহিকো ইজুৎসুর অনুবাদ প্রকাশিত হয়। ১৯৭০ সালে ফুজিমোতো কাতসুজি, ১৯৭২ সালে উমর রাইওছি মিতা আরেকটি অনুবাদ করেন।

চীনা অনুবাদ

ইউসুফ মা দেক্সিনকে (১৭৯৪-১৮৭৪) পবিত্র কুরআনের চীনা ভাষার প্রথম অনুবাদক মনে করা হয়। তবে ১৯২৭ সালের আগে চীনা ভাষার কুরআনের সম্পূর্ণ অনুবাদ বের হয়নি, যদিও তাং রাজবংশের (৬১৮-৯০৭) সময় থেকেই চীনে ইসলাম ছিল। মুসলিম স্কলার ওয়াং ঝিংহাই (১৮৭৯-১৯৪৯) ১৯২৭ অথবা ১৯৩২ সালে গুলানজিং ইজি নামে চীনা ভাষায় কুরআন অনুবাদ করেছিলেন। এরপর ১৯৪৩ এবং ১৯৪৬ সালে এর সংশোধিত সংস্করণ পুনঃপ্রকাশিত হয়। লি তিয়েঝেং নামে একজন অমুসলিম চীনা যে অনুবাদটি করেন, তা মূল আরবি থেকে করা হয়নি, বরং মেডোস রডওয়েলের ইংরেজি অনুবাদটি সাকামতো কেনইচির জাপানি অনুবাদের মাধ্যমে করা হয়েছিল। দ্বিতীয় আরেকজন অমুসলিম চীনা কুরআনের অনুবাদ ১৯৩১ সালে প্রকাশ করেন, জি জুয়েমি এর সম্পাদনা করেন। এছাড়া ১৯৪৩ সালে লিউ জিনবিয়াও এবং ১৯৪৭ সালে ইয়াং ঝংমিংও অনুবাদ করেন। তবে আজকাল সবচেয়ে জনপ্রিয় চীনা অনুবাদটি হচ্ছে হুই-মুসলিম মোহাম্মদ মা জিয়ানের (১৯০৬-১৯৭৮) অনুবাদটি। ১৯৪৯ এবং ১৯৫১ সালে এই অনুবাদটি আংশিক প্রকাশিত হলেও, তাঁর মৃত্যুর পর ১৯৮১ সালে সম্পূর্ণ সংস্করণ বের হয়।

তং দাওঝ্যাং নামে একজন মুসলিম চীনা আমেরিকান ১৯৮৯ সালে গুলানজিং শিরোনামে একটি আধুনিক অনুবাদ প্রকাশ করেন। সবচেয়ে সাম্প্রতিক চীনা অনুবাদটি ১৯৯৬ সালে তাইপে থেকে প্রকাশিত হয়। দা কিংঝেন জিলিউ-গুলানজিং জিনি নামে এই অনুবাদটি করেন শেন জিয়াঝুন। সর্বশেষ চীনা অনুবাদটি অনুবাদ ও প্রকাশ করেন ইউনুস সিয়াও শিয়েন মা। ২০১৬ সালে তাইপে থেকে এটা প্রকাশিত হয়েছে।

ইন্দোনেশিয় ভাষার অনুবাদ

পৃথিবীর সবচেয়ে জনবহুল মুসলিম দেশ ইন্দোনেশিয়ায় পবিত্র কুরআন আচেনিজ, বুগিনিজ, গোরোনতালো, জাভানিজ, সন্দানিজ এবং ইন্দোনেশিয় ভাষায় অনূদিত হয়। মাহিজদ্দিন ইউসুফ ১৯৯৫ সালে আচেনিজ ভাষায় কুরআন অনুবাদ করেন; ১৯৮২ সালে দাউদ ইসমাইল এবং নুহ দায়ে। মানোম্পো

বুগিনিজ ভাষায়, ২০০৮ সালে লুকমান কাতিলি গোরোনতালো ভাষায়; জাভানিজ ভাষায় গারপাহ (১৯১৩), কিআই বিসরি মুস্তাফা রেমবাং (১৯৬৪) এবং কে.এইচ.আর মোহামদ আদনান; সান্দানিজ ভাষায় এ.এ. দাল্লান, এইচ.কমরউদ্দিন সালেহ, জাস রুসামসি ১৯৬৫ সালে এবং ইন্দোনেশিয় ভাষায় অন্তত তিনটি অনুবাদ হয়: এ দাতো ফখরুদ্দিন, এইচ.এম কাসিম বেকারি, ইমাম এম. নুর ইদ্রিস, এ হাসান, মাহমুদ ইউনুস, এইচ.এস. ফখরুদ্দিন, এইচ. হামিদি, এরা সবাই ১৯৬০-এর দশকে অনুবাদ করেন। ১৯৭০ দশকে মোহাম্মদ দিপোনেগরো, বখতিয়ার সুরিন এবং ডিপার্টমেন্ট আগামা রিপাবলিক ইন্দোনেশিয়া (ইন্দোনেশিয় ডিপার্টমেন্ট অব রিলিজিয়াস এফ্যায়ারস)।

নিউক্লিয়ার মালয়-পলিনেসিয়ান ভাষা

উইলিয়াম শেলাবিয়ার (১৮৬২-১৯৪৮) নামে একজন ব্রিটিশ স্কলার এবং মিশনারি মালয়েশিয়ায় অবস্থানরত অবস্থায় মালয় ভাষায় বাইবেল অনুবাদ শেষ করার পর কুরআনের অনুবাদ শুরু করেছিলেন, তবে শেষ করার আগেই ১৯৪৮ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

এছাড়া থাই ভাষায় দুটি, উইঘুর ভাষায় ১টি অনুবাদ হয়েছে।

আফ্রিকান ভাষা

সোহালী ভাষায় অন্তত সাতটি পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ হয়েছে।

* ট্রান্সলেশন অব দা কুরআন টু সোয়াহিলি ভাষায় শেখ আলি মুহসির আল বারওয়ানি।

হাওসা ভাষায় কুরআন অনুবাদ করেন শেখ মোস্সত গুমি।

* ইরোবা ভাষায় অনুবাদ করেন শেখ আদম আবদুল্লাহ আল-গোরি।

* দাগবানি ভাষা কুরআন অনুবাদ করেন শেখ এম. এ বাবা বেতোবু।

আফ্রিকানা ভাষায় অনুবাদ করেন ইমাম মোহাম্মদ এ. বেকার ১৯৬১ সালে।♦

সূত্র:

১. ফাতানি, আফনান (২০০৬)। 'ট্রান্সলেশন এন্ড দা কুরআন।' ইন লিয়াম্যান অলিভার (এড)। দা কুরআন: এন এনসাইক্লোপিডিয়া। গ্রেট ব্রিটেন: রুটলেজ পৃষ্ঠা ৬৫৭-৬৬৯

২. রুথভেন, মেলিস (২০০৬) ইসলাম ইন দা ওয়ার্ল্ড। গ্রান্তা পৃ– ৯০

৩. আন-নাওয়াই, আল-মাজনু, (কায়রো, মাতবাকাত, এট-টাডামন এন.ডি), ৩৮।

৪. কালের কণ্ঠ, ২৬ জুলাই ২০১৯, বাংলাভাষায় কুরআন অনুবাদের ধারাক্রম, মাওলানা সাখাওয়াতউল্লাহ।

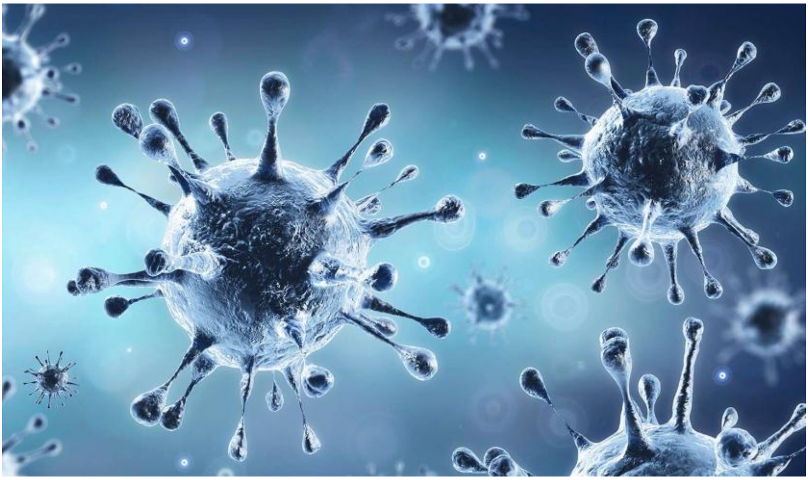

মহামারী প্রতিরোধে ইসলাম

অধ্যাপক ড. সাইয়েদ আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ

প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে ইসলাম

COVID-19 সারা পৃথিবীকে এমনভাবে ঝাঁকুনি দিয়েছে যে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর বিশ্বে মানুষ এত ভায়বহ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়নি। এখন আমাদের সংগ্রাম এমন শত্রুর বিরুদ্ধে যাকে খালি চোখে দেখা যায় না। এত ক্ষুদ্র যে বাতাসে ভেসে বেড়ানো ধূলির চেয়েও সূক্ষ্ম। অথচ এটি মানব দেহে ঢুকে তাকে মৃত্যুর দুয়ারে নিয়ে যায়।

চীনের উহানে কীভাবে প্রথম ব্যক্তির মধ্যে এই ভাইরাস সংক্রমিত হয় বা এর জন্ম কীভাবে হয় এটি আমাদের কাছে পুরোপুরি স্পষ্ট নয়। অনেকটা শয়তানের মত, যাকে দেখা যায় না; কিন্তু মানুষের মনে কুপ্ররোচনা দিয়েই যাচ্ছে। শয়তানকে আউযুবিল্লাহ পড়ে প্রতিরোধ করা যায়; কিন্তু করোনা ভাইরাসকে প্রতিরোধ বা প্রতিহত করার কোন উপায় এখনও মানুষ জানে না। এত বড় পৃথিবী কিন্তু এই

ভাইরাস মানুষের সহযাত্রী হয়ে অতি অল্প সময়ের মধ্যে সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে। চিকিৎসাবিজ্ঞানে উন্নত ইতালি কি ভেবেছিল তারা এত অসহায় হয়ে প্রতিদিন শত শত লোকের মৃত্যু প্রত্যক্ষ করবে?

বাংলাদেশে চিকিৎসক, অচিকিৎসক, স্পেশালিস্ট, অ-স্পেশালিস্ট সবাই এখন কথা বলছে। সবার সচেতন হওয়ার প্রয়োজন; কিন্তু সবাই সঠিক সময়ে সঠিক কথা বলছে না। তবে কেউ কেউ বলছে।

বিভিন্ন মাধ্যমে যে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে তাতে বড় একটা গ্যাপ থেকে যাচ্ছে। তা হচ্ছে ধর্মীয় দিক-নির্দেশনা সঠিকভাবে উপস্থাপন হচ্ছে না। ক্ষেত্র বিশেষে ধর্মীয় দিকটা অপ্রয়োজনীয় ও কুসংস্কার মনে করা হচ্ছে। বাংলাদেশের মত বিপুল জনগোষ্ঠীর একটি দেশ– যার ৯২% ভাগ মুসলিম এবং ধর্মকে বিশ্বাস করে প্রশ্নাতীতভাবে – যদিও প্রতিপালনে ঢিলেমী অনেক– ধর্মীয় নির্দেশনাকে এড়িয়ে যেতে পারে না।

এ কারণে আমি কলম ধরলাম। করোনা ভাইরাস চলে গেলেও এই নির্দেশনাগুলো ভাইরাসজনিত রোগ বা জীবাণুঘটিত মহামারীর ক্ষেত্রে সবসময় কাজে লাগবে– ইন্‌শা-আল্লাহ।

আমাদের উচিত, ডাক্তারদের কথা শোনা ও মানা, সাথে মহান আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া। এটিও প্রয়োজন। ইতালির প্রধানমন্ত্রী যখন চিকিৎসা ব্যবস্থায় হতাশ হয়ে গেলেন তখন বললেন (২২-০৩-২০২০) এখন আকাশের দিকে চেয়ে থাকা ছাড়া আর কিছুই করণীয় নেই। এই আকাশ মানে GOD।

প্রকৃতির সাথে মানুষ সংগ্রাম করে এ পর্যন্ত এসেছে। প্রকৃতিও আল্লাহর সৃষ্টি। এই করোনা ভাইরাসটিও আল্লাহর সৃষ্টি। তিনি ইচ্ছে করলে তার প্রাণ হরণ করতে পারেন। তাই শেষ কথা বলি : আল্লাহ! আমাকে বাঁচাও। এ কথাটি প্রতিদিন আমরা নামাযে বলি– ওয়া ইয়্যাকা নাসতা‘ঈন (আর তোমারই নিকট আমরা সাহায্য প্রার্থনা করি)।

এখন কতগুলো প্রশ্নের উত্তর দেওয়া প্রয়োজন :

(১) জীবাণু বা ভাইরাস বলতে কিছু আছে কি না?
(২) আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল কি যথেষ্ট নয়?
(৩) মসজিদে জামাত বন্ধ করা কি ঠিক?
(৪) জীবন-মৃত্যু যখন আল্লাহর হাতে তাহলে এত সতর্কতার কি দরকার আছে?
(৫) করোনা ভাইরাস কি আল্লাহর রহমত হতে পারে না?
(৬) কিছু বুযুর্গ যে স্বপ্ন দেখেছেন, এগুলো কতটুকু সত্য?
(৭) জীবাণু রোধক দু‘আ আছে? থাকলে কী কী?

(৮) এ সময় মেহমানদারী করা কি সুন্নাত?

(৯) বিদেশ থেকে যদি জামাই বাবু শ্বশুর বাড়ি আসে তার সাথে কি ব্যবহার করব?

(১০) এক মুসলিম অন্য মুসলিমের সাথে মুসাফা করা বা কোলাকুলি করা বা সামাজিক কাজে অংশগ্রহণ করার ধর্মীয় বিধান কি?

(১১) মহামারী সম্পর্কে ইসলামে কি কোন সুস্পষ্ট নির্দেশনা আছে?

এর উত্তরে বলবো : জীবাণু যে আছে, এটা মহানবী (সা) নিজেই বলে গেছেন। এ ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনার একটি রূপরেখাও দিয়ে গেছেন। মহানবী (সা) বলেছেন : "উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, আমি মহানবী (সা)-কে মহামারী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তখন তিনি আমাকে জানালেন, এ হচ্ছে একটি শাস্তি, আল্লাহ যাকে চান তার উপর নিপতিত করেন, তখন মু'মিনদের জন্য এটিকে অনুগ্রহ সাব্যস্ত করেন। এ সময় কোন ব্যক্তি যদি মহামারী আক্রান্ত হয়ে নিজ ঘরে ধৈর্য ধরে সওয়াবের প্রত্যাশা করে, নিজেকে সঙ্গনিরোধভাবে ঘরে স্বেচ্ছাবন্দী থেকে এই দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করে যে, আল্লাহ যা ভাগ্যে লিখে রেখেছেন তার বাইরে কোন কিছু স্পর্শ করবে না, এমন ব্যক্তি শহীদের সমতুল্য সাওয়াবের অধিকারী হবে।"[১]

এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, অন্যের জন্য আযাব হলেও মু'মিন যদি সবর করে তাহলে সেটি তার জন্য রহমত হিসেবে সাব্যস্ত হয়।

মহামারীকে আরবীতে (তা'উন) বলে। খলিফা উমর (রা)-এর আমলে একবার প্লেগ রোগ মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়েছিল। অকুস্থল ছিল ফিলিস্তিনে অবস্থিত এক জিহাদের ময়দান। কমান্ডার ইন চিফ ছিলেন আবু উবায়দাহ ইবনুল জাররাহ (রা)। তিনি নিজেও আক্রান্ত হয়ে মারা যাবার আগেই মু'আয ইবনে জাবাল (রা)-কে সেনাপ্রধান নিযুক্ত করে যান। তিনিও মাত্র ৪৮ বছর বয়সে মহামারীতে মারা যান। এ সময় উমর (রা) খলীফা, তিনি যুদ্ধের ময়দানের অবস্থা নিজে দেখার জন্য যখন আল্-কুদ্সের নিকট ওই অঞ্চলের প্রধান ফটকে উপনীত হন, তখন তাকে জানানো হলো যে, এ অঞ্চলে মহামারীর প্রকোপ চলছে। তখন তিনি তার সাথে সেনাদলকে নির্দেশ দেন যেন এ রাতটি ঘোড়ার পিঠেই সবাই অবস্থান করে। সকালে তিনি ফিরে যাচ্ছিলেন। কেউ একজন বললেন, আমীরুল মু'মিনীন! আপনি কি আল্লাহ্র তাকদির থেকে পালাচ্ছেন? তিনি উত্তরে বললেন– "আমি তো আল্লাহর এক তাকদীর থেকে অপর তাকদীরের দিকেই যাচ্ছি।"

আল্লাহ্ তা'আলার বিধান

আল্লাহ তা'আলার একটি স্বভাব ও স্বাভাবিকতার উপর মহাবিশ্ব পরিচালনা করেন। এটি হচ্ছে ফিতরাত। তিনি বলেছেন : "মানুষকে যে স্বভাব প্রকৃতিতে সৃজন করেছেন তা অনুসরণ কর।"[২] প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ করলে প্রকৃতি তার বিরূপ প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করে।

এই ফিতরাত বা সিস্টেমকে মহান আল্লাহ্ কখনও কখনও বদলে দেন। তিনি "যা চান তাই করেন"[৩] তাঁকে কেউ প্রশ্ন করতে পারে না। কিন্তু তিনি তার দেওয়া System এ হস্তক্ষেপ করেন যখন তিনি খুব রেগে যান অথবা কারও প্রতি বিশেষ দয়া দেখান। তাঁর একটি System হলো, যা তিনি এই আয়াতে বলেছেন : "তোমরা এমন বিপর্যয়কে ভয় কর যা কেবল তোমাদের মধ্যকার যালিমদেরকেই স্পর্শ করবে না।"[৪]

বরং বন্যা এলে মসজিদও ডুবে যায়, ঘরে আগুন লাগলে ধর্মগ্রন্থের পাতাও পুড়ে যায়। এ জন্যই মহামারী হলে নিরপরাধ লোক মারা পড়ে। বনে দাবানল হলে বেগুনাহ পশুপাখিও মারা পড়ে। ভূমিকম্প, সুনামী এ ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগে ওই অঞ্চলের সকলেরই একদশা হয়। তবে মাঝে মাঝে কিছু অলৌকিক ঘটনাও ঘটে। তা হচ্ছে আল্লাহর ব্যতিক্রমী সুপার পাওয়ার। এ জন্যই মাঝে মাঝেই কিছু মহামারী, যুদ্ধ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদি মানুষের অসহায়ত্বকে খুবই স্পষ্ট করে প্রকাশ করে যায়।

ইতালির প্রধানমন্ত্রী তাই বলেছেন, "এখন আকাশের দিকে চেয়ে থাকা ছাড়া কিছুই করার নেই।" অবশেষে তাই আল্লাহর ক্রোধ থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর কাছেই বিনয়াবনত হয়ে আশ্রয় প্রার্থনা করি। এ জন্যই মহান আল্লাহ ভরসা দিয়ে বলেছেন : "আর যে আল্লাহর উপর ভরসা করবে, তিনিই তার জন্য যথেষ্ট।"[৫] "আল্লাহর দিকেই সব বিষয় ঘুরেফিরে যায়।"[৬]

এ ক্ষেত্রে খলিফা উমর (রা), মহানবী (সা)-এর নির্দেশনাই অনুসরণ করেছেন।

মহানবী (সা) বলে গেছেন : "যদি তোমরা শোন যে কোন এলাকায় মহামারী চলছে তবে সেখানে প্রবেশ করবে না। আর যদি তোমরা যেখানে আছ সেখানে মহামারী দেখা দেয় তাহলে সেখান থেকে বের হবে না।"[৭]

দ্বিতীয়ত খলিফা উমর (রা) মহানবী (সা)-এর আরেকটি হাদীসের উপর আমল করে ঘোড়ায় অবস্থান করেছেন।

মহানবী (সা) বলে গেছেন: "সংক্রমিতকে সুস্থের মাঝে রাখা যাবে না।"[৮]

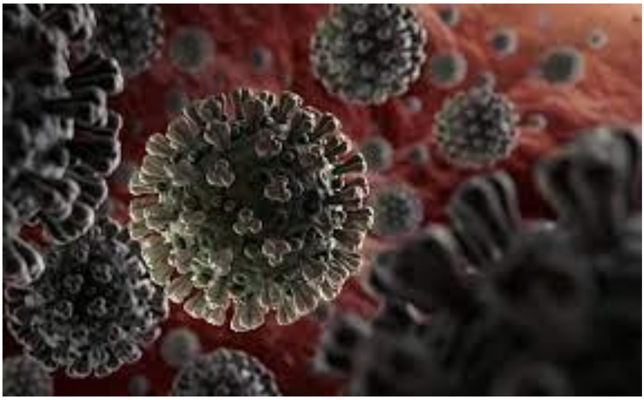

এটি যদিও সংক্রমিত উটের প্রসঙ্গে বলেছিলেন বলে কেউ কেউ উল্লেখ করেছেন তবে বিষয়টি জীবাণু প্রসঙ্গে আসাতে মানুষ, পশু-পাখি সবার ক্ষেত্রেই সমভাবে প্রযোজ্য। যারা বলে, “জীবাণু, ভাইরাস নেই”[৯] –এটি হাদীসে এসেছে, তারা মূলত হাদীসটির অপব্যাখ্যা করেছে। কারণ সংক্রমিত উটের বেলায় যে হাদীসটি এসেছে তাতে মহানবী (সা) যে বলেছিলেন– “প্রথমাকে কে সংক্রমিত করেছে?”[১০] এর অর্থ কখনই এ নয় যে, জীবাণু নেই; বরং তিনি সাহাবীকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে এটাই শেষ কথা নয় বরং এই ক্ষতিকর জীবাণু মহান আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন। যিনি অনস্তিত্ব থেকে প্রথম ভাইরাস সৃষ্টি করতে পারেন, তিনিই এটিকে আবার অনস্তিত্বে নিক্ষেপ করতে পারেন। কোন অবস্থায় আল্লাহকে ভুলবে না। তাছাড়া প্রাসঙ্গিক অন্যান্য বর্ণনাগুলো একসাথে সামনে রেখে সিদ্ধান্ত নিলেই সঠিক পথ পাওয়া যায়। তাছাড়া একজন খলিফা রাশেদ এর আমলও আমাদের জন্য প্রামাণ্য দলিল। জীবাণুর সংক্রমণ সম্পর্কে জ্ঞান না থাকলে তো তিনি ক্লান্ত সফরসঙ্গীদের রাতেও ঘোড়ার পীঠে অবস্থান করার কঠোর নির্দেশটি দিতেন না।

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে, তিনি দুর্গত সেনাদেরকে রেখে চলে গেলেন? এর উত্তরে বলব, এটাও শরীয়তের মূলনীতি সঙ্গত হয়েছে। শরীয়তে দুটি অনিবার্য ক্ষতি থেকে একটি গ্রহণ করতে হলে বা অপেক্ষাকৃত কম ক্ষতির অপশনটি গ্রহণ করতে হবে। মহামারীতে খালি হাতে, ওষুধ-পথ্য ছাড়া বা ডাক্তার নার্স না হয়ে প্রবেশ করা, আত্মহননের শামিল। কাজেই এ ক্ষেত্রে তিনি Safe and sound ফিরে আসাই কম ক্ষতির দিক ছিল।

নিশ্চয়ই তিনি দু‘আ করেছেন। কিন্তু আগেই বলেছি, আল্লাহর সুপ্রিম ইচ্ছার সামনে কারোর দু‘আ দাঁড়াতে পারে না। দু‘আ করা সুন্নত, কিন্তু এটি গ্রহণ করা

আল্লাহর উপর ওয়াজিব নয়। বুঝতে হবে– মহান আল্লাহর কাজকে প্রশ্নবিদ্ধ করা যায় না।

এছাড়া পবিত্র কুরআনে সুস্পষ্ট নির্দেশ আছে : "তোমরা নিজেদেরকে নিজ হাতে ধ্বংসের দিকে নিক্ষেপ করো না, বরং উত্তমভাবে ব্যবস্থা নাও নিজেরাই। আল্লাহ্ উত্তমকাজ উত্তমভাবে সম্পাদনকারীকে পছন্দ করেন।"[১১]

মহামারী কবলিত এলাকায় যাওয়া তো নিজহাতে নিজেকে মৃত্যুকূপে নিক্ষেপ করাই। ধূমপানের বেলায়ও আমরা এই আয়াত উপস্থাপন করে থাকি। যাহোক, মহানবী (সা) কখনও বলেননি যে, জীবাণু বা অণুজীব নেই। কোন কিতাবের কোন অনুচ্ছেদের শিরোনামে বলা আছে "কোন জীবাণু, কোন ভাইরাস নেই" এটি কোন সিদ্ধান্ত নয়। মহানবী (সা) বলতে চেয়েছেন, জীবাণু মৃত্যু ঘটায়, ওই জীবাণুর সৃষ্টিকর্তা কে? ভাল ও মন্দ উভয়েরই সৃষ্টিকর্তা হচ্ছেন আল্লাহ। মু'তাজিলারা বলে মন্দের সৃষ্টিকারী হচ্ছে শয়তান বা মানুষ। সে জন্যেই খাবার দু'আ করেছেন :

"প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাকে খাইয়েছেন, পান করিয়েছেন এবং মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।"[১২]

এখানে মুসলিম বানাবার কথাটা অপ্রাসঙ্গিক মনে হতে পারে। আসলে ওই সময়ও তার সবচেয়ে বড় নিয়ামত যেন না ভুলে সেজন্য এটি জুড়ে দেয়া হয়েছে।

মূল কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া ছিল মহানবী (স)-এর একটি দাওয়াতি কৌশল। ওই সময় জাহেলী যুগের লোকদের আকীদা বিশ্বাসে প্রকৃত খালেক - মালেককে না ভুলার জন্য এমনকি খাওয়ার দু'আতেও মুসলিম হওয়ার প্রসঙ্গ আনা হয়েছে।

"সংক্রমিতকে সুস্থের সাথে আনবে না" এ হাদীসে উট বলা হয়নি এবং এখানে সঙ্গ নিরোধের কথাটি স্পষ্ট। তাহলে কীভাবে বলা হয় জীবাণু নাই। বরং আমাদেরকে সকল হাদীস সামনে রেখে সিদ্ধান্ত দিতে হবে।

জীবাণু বা অণুজীব যে রোগের জন্য দায়ী, তা আবিষ্কৃত হয় মাত্র ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে। এটাকে অনুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া দেখা যায় না। এ যন্ত্রটিও বেশিদিন আগে আবিষ্কৃত হয়নি। মহানবী (সা) যদি 'অণুজীব' বলতেন তখন কাফেররা বলতো, দেখান তো? তাই তিনি বিজ্ঞানের কথা তাদের না বলে যা করতে হবে সেই Quarantine বা সঙ্গ-নিরোধের কথা বলেছেন। যা উমর (রা) আমল করেছেন।

যে সকল লেখক লিখেছেন যে, মহানবী (সা) বলেছেন, কোন জীবাণুর অস্তিত্ব নেই, তারা সে যামানায় বৈজ্ঞানিক তথ্য না থাকায় আন্দাজে ব্যাখ্যা

করেছেন। বিস্তারিত দেখুন: ভূমিকাংশ; বায্‌লুল মা'ঊন ফী ফাদ্‌লিত্‌ তা'ঊন। যেমন 'আলাক সর্ম্পকেও ভুল ব্যাখ্যা করেছেন অনেকে।

মহানবী (সা) সব সময় মূল খালেক মহান আল্লাহ-এর প্রতি মানুষের আকীদা-বিশ্বাসকে মজবুত করতে চেয়েছেন। আর তা সত্য বরং মহাসত্য। আল্লাহর ইচ্ছার ওপরে কোন ইচ্ছা নেই। তিনি ছাড়া কোন খালেক নেই। যা বান্দা ভুল করে বা চিন্তা করে Invent করে তাও আল্লাহরই সৃষ্টি। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন :

"আর আল্লাহ তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং যা তোমরা করে থাকো।"[১৩]

কাজেই জীবাণু আছে। মহানবী (সা) "জীবাণু নেই" বলেননি।

বাংলাদেশের কিছু অসচেতন আবেগপ্রবণ লোকের মনোভাব হচ্ছে, হলেও আমার কিছু হবে না। মুসলমানরা বলে, আল্লাহ ভরসা, আমাদের কিছু হবে না। আমরা তো বার বার অযু-গোসল করি। কিছু লোক যারা ওয়ায-নসিহত শুনে নামায, রোযা করে নিজেদেরকে ধার্মিক লোক মনে করে এবং শ্রোতার কাতার থেকে এখন বিজ্ঞ পরামর্শকের স্থানে নিজেকে বসিয়ে নিজেরাও বিভ্রান্ত হয়, অন্যদেরকেও বিভ্রান্ত করে বলে থাকে : "জীবাণু বলে কিছুই নেই"[১৪] আল্লাহর হুকুম হলে করোনা ধরবে, না হলে ধরবে না। সতর্ক হয়ে লাভ কি? আল্লাহ কি নামাযিদের মারবে? এ ধরনের অতি আত্মবিশ্বাস অতি আবেগ তাদেরকে বাস্তবতা থেকে দূরে রাখছে। সম্প্রতি দিল্লীর নিজামুদ্দীনের ঘটনা এর জ্বলন্ত প্রমাণ। সে ক্ষতিগ্রস্ত হলে অন্যরাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যেহেতু সে জীবাণুর বাহক হয়ে থাকে। সেজন্যই বিষয়টা খোলাসা করা দরকার।

পবিত্র কুরআনে আছে : "যে আল্লাহর উপর ভরসা করে তিনিই তার জন্য যথেষ্ট।"[১৫]

এখন তাওয়াক্কুল কাকে বলে? প্রয়োজনীয় উপকরণ ও ব্যবস্থাদি গ্রহণ না করে কেবল নিশ্চেষ্ট বসে থাকা তাওয়াক্কুল নয়; বরং এটি হচ্ছে অর্থাৎ অলসতা ও পরনির্ভরশীলতা। জমিতে বীজ, সেচ, সার ইত্যাদি দিয়ে ভাল ফলনের জন্য আল্লাহর উপর ভরসা করা হচ্ছে তাওয়াক্কুল। কারণ শেষ মুহূর্তে চিটা হতে পারে, বিরূপ আবহাওয়ায় ফসল নষ্ট হতে পারে। তাই চূড়ান্ত সফলতা বা ফল লাভের জন্য আল্লাহর অনুগ্রহের ওপর নির্ভর করা হচ্ছে তাওয়াক্কুল।

এখন জীবাণু বিরোধী বা প্রতিরোধ ব্যবস্থা না নেওয়াটা আহাম্মকী ছাড়া কিছুই নয়। জীবাণু আক্রান্ত হওয়ার পর এরাই বলবে, মাগো গেছি, ডাক্তার আনো, ঔষুধ খাওয়া সুন্নত। তাদের তো জানা নেই যে, আরও আয়াত, হাদীস আছে যেখানে ব্যক্তির নিজের দায়িত্ব পালনের কথা বলা হয়েছে। যেমন

আল্লাহতাআলা বলেন– "আল্লাহ কোন জাতি, সম্প্রদায়ের অবস্থা পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না তারা তাদের মধ্যকার অবস্থার মধ্যে পরিবর্তন আনে।"

জীবাণু প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ এবং গুনাহর পথ ছেড়ে তাওবা করাই হচ্ছে প্রধান পরিবর্তন।

মসজিদে জামাত

একজন নামাযী মুসলমানের চোখে মসজিদে নামায বন্ধ হয়ে যাওয়া যে কত কষ্টের তা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। সমাজে অনেক বেনামাযী থাকা সত্ত্বেও প্রতি ওয়াক্ত নামাযের আযান হলে মসজিদে বেশ কিছু মুসল্লীর উপস্থিতিতে জামাত হয়। ফজরেরটা ছোট, মাগরিবেরটা বড়। জুমার দিন তো তাদেরও সমাবেশ হয় যারা কেবল সপ্তাহে সালাতটিই আদায় করে!

হঠাৎ মসজিদে নববী, মসজিদুল হারামকে জনশূন্য এক বিরান প্রাসাদ দেখে হৃদয় মোচড় দিয়ে ওঠে। এটা কি ঠিক হলো! কত কথা মনে হয়। মুসল্লী এখানে এসে থমকে দাঁড়ায়– কাজটা কি শরীয়ত সম্মত?

ইতিহাস ঘুরে ফিরে আসে। দুশো বছর ও হাজার বছর পরে হলেও। মসজিদুল হারাম একবার ৩ দিন ধরে বন্ধ ছিল। ইয়াজিদ বাহিনীর অত্যাচারে এটি ঘটেছিল। ৬০ হিজরীতে আবার হারুরার কারামতিয়া বাতিল ফিরকার আক্রমণে বন্ধ ছিল। তখন তারা কালো পাথরটি সন্ত্রাসী আক্রমণ করে নিয়ে যায়। বিশ বছর পর দুভাগ অবস্থায় ফেরত পাওয়া যায়, সেসব ছিল মানবঘটিত। আর এখন জীবাণু নামক অদৃশ্য ঘাতকের ভয়ে তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃপক্ষ নিজেরাই বন্ধ করে দিল।

এটা কি ঠিক হলো? না! তবে কী ঠিক হতো? সীমিত পরিসরে শরীরের স্পর্শ এড়িয়ে জামাত চালিয়ে যাওয়া উচিত ছিল। না যা করেছে ঠিকই করেছে। তাদের অবস্থাটা তারা ভাল বুঝবেন। সেখানেও বড় বড় আলেম আছেন। কাজেই আমরা হয়তো ভয়াবহতা অনুধাবন করতে পারছি না এ জন্যই এ কথা বলছি। তবে যখন জীবন-মৃত্যুর প্রশ্ন দেখা দেয় তখন সালাতের জামাত– যা সুন্নাত তা তরক করা যায়। বৃষ্টি হলে এমনকি জুমার জামাতেও না যাওয়ার অনুমতি আছে। তাহলে জীবন-মৃত্যুর প্রশ্নে তো জায়েয হবেই। "হ্যাঁ নামায বাদ দিতে তো বলা হয়নি।"

এছাড়া যাদের আতঙ্ক আছে, যারা ঝুঁকিতে আছে, যাদের হাঁচি, কাশি সন্দেহের কবলে পড়ছে তাদের তো মসজিদে এখন না যাবার অনুমতি আছে। এখন আবেগের চেয়ে বাস্তবতা বড়। আগে তো বাঁচুন পরে সংঘবদ্ধ ইবাদত করা যাবে।

ইসলামী ফিকহে একটি সূত্র আছে : “উপকারের চেয়ে অগ্রগাম্য হচ্ছে অপকারকে দূর করা।”

“হানাফী মাযহাব অনুযায়ী ১৮টি কারণের যেকোন একটির জন্য জামাতে উপস্থিত হওয়া বাদ দেওয়া যায়, বৃষ্টি, ঠাণ্ডা, ভয়..., ব্যাধি,..., পথে কাদা থাকা...।” (ড. ওয়াহাবা আয্-যুহাইলী, আল্-ফিক্হুল ইসলামী ওয়া আদেল্লাতুহ, খ.২, পৃ ১৭২)

মহান আল্লাহ্ বলেন– “তোমাদের ওপর দীনের জন্য কোন কষ্টকর কিছু রাখা হয়নি।” ইবন আব্বাস (রা)-এর হাদীসে আছে– কী ওযরে সালাতের জামাত ত্যাগ করা যাবে? মহানবী (সা) বললেন– আতনু অথবা ব্যাধি।” (আবু দাউদ)

জীবন মৃত্যু আল্লাহর হাতে! তাহলে সতর্কতার কি প্রয়োজন?

জীবন মৃত্যু আল্লাহর হাতে কথাটির অর্থ আল্লাহর ইচ্ছা বা অনুমোদন ছাড়া চূড়ান্ত অর্থে কেউ জীবন দিতেও পারে না নিতেও পারে না। রাখে আল্লাহ মারে কে! তাই বলে আল্লাহ বাপ-মা ছাড়া সন্তান দেন না। মহামারীর মাঝখানেও কেউ কেউ সুস্থ থেকে যায়। আক্রান্তরা সবাই মরে না। তাই বলে অসুস্থ হলে ডাক্তার ওষুধের দ্বারস্থ হয় না, এমন কোন বুদ্ধিমান লোক পাওয়া যাবে? আল্লাহর হুমুক ছাড়া মশাও কামড় দিতে পারে না, তাই বলে কি কেউ আছে, যে মশারী উপেক্ষা করতে পারে? অলসতা করে সারা রাত মশারী না টাঙ্গালেও মশার জন্য যখন ঘুমাতে পারে না তখন ঠিকই মধ্য রাতে মশারী টাঙ্গায়।

এসবের একটিই উত্তর আছে– আমার সতর্কতা আমি গ্রহণ করব, আল্লাহ আমাকে ইচ্ছে করলে রক্ষা করবেন অথবা করবেন না। আল্লাহর কাছে চাইলে, বিগতিল বিনম্র ভাষায় তাঁর করুণা ভিক্ষা করলে তিনি তাতে সাড়া দিয়ে থাকেন।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন : “আর যখন আমার বান্দারা আপনাকে জিজ্ঞেস করে তখন আপনি (উত্তরে বলুন যে) আমি অতি নিকটেই আছি, আহ্বানকারীর আহ্বানে সাড়া দেই, যখনই সে আমাকে ডাকে।”[১৬]

এ জন্যই এক হাদীসে আছে, “যাকে আল্লাহ কোন কিছু দেবেন না তাকে সে জিনিসের জন্য দু‘আ করার তাওফীকই দেন না।” কাজেই বিপদে আল্লাহকে ডাকা অর্থহীন নয়; বরং তিনি বলেছেন (নবীর ভাষায়): “আর যখন আমি রোগাক্রান্ত হই তখন তিনিই আমাকে শেফা দিয়ে থাকেন।”[১৭] আবার বলেন : “যদি আল্লাহ তোমাকে কোন রোগ বা ক্ষতি দেন তখন তিনি ছাড়া আর কেউ তা থেকে মুক্তি দেবার নেই।”[১৮]

জীবন-মৃত্যু যার হাতে তিনি চান তাঁর বান্দাহ্ আযাব দেখে তাঁরই কাছে ফিরে আসুক, তারই কাছে সাহায্য চাক। দেখেন না সূরা ফাতেহায় কি বাণী বারবার বলে : "আমরা তোমারই ইবাদত করি আর তোমারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি।"[১৯] –"আল্লাহ্ তা'আলা যখনই কোন ব্যাধি নাযিল করেন, তখনই তার নিরাময়ও নাযিল করেন।" (বুখারী, আবু হুরায়রা (রা) থেকে)। এ ব্যাপারে তাকদীর যেহেতু আমাদের কাছে অজানা, তাই সতর্কতা অবলম্বন ছাড়া আর কি বা করার আছে।

মহানবী (সা) বলেছেন : "দাওয়াই সেবন কর, কারণ সকল ব্যাধিরই নিরাময় আছে।"[২০]

আল্লাহ তা'আলা তো বলেই দিয়েছেন : "মানুষের জন্য ততটুকুই যার জন্য সে চেষ্টা করে।"[২১]

যে সংযম ও সতর্কতা অবলম্বন করে আল্লাহ তার বের হবার পথ করে দেন : "আর যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার নিষ্কৃতির পথ বের করে দেন এবং তাকে তার ধারণাতীত জায়গা থেকে রিযিক দিয়ে থাকেন।"[২২]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন : "যারা আমাতে প্রচেষ্টা চালাবে- তাদেরকে অবশ্যই আমি আমার পথসমূহের সন্ধান দিব।"[২৩]

সতর্কতার আরও বহু আয়াত ও হাদীস থাকায় কেবল তাওয়াক্কুল এর অপব্যাখ্যাকে পুঁজি করে আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থাদিকে পাত্তা না দেওয়া ইসলাম সম্মত নয় বরং এটি তাওয়াক্কুল সমর্থিতও নয়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন : "মু'মিন তো তারা যারা ... এবং তাদের প্রতিপালকের উপর ভরসা করে।"[২৪] "যারা সালাত কায়েম করে এবং তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে (আল্লাহর রাস্তায়) খরচ করে।"[২৫] এ আয়াতে দেখা যায় তাওয়াক্কুলের পরও সালাত-যাকাত আদায় করতে হয়।

মহানবী (সা)-এর নিকট এক লোক দীন সম্পর্কে জানতে এসে তার সামনে বসল। তখন একবার রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দিকে তাকায় আবার বাইরে উদ্বিগ্ন চোখে তাকায়। মহানবী (সা) জিজ্ঞেস করলেন, তুমি অস্থির কেন? সে বলল, বাইরে রাখা আমার উট আবার পালিয়ে যায় কিনা সে ভয় করছি। তখন মহানবী (সা) বললেন, আগে উট বেঁধে আস। কাজেই সতর্কতা গ্রহণ করা– বিশেষ করে যখন করোনা ভাইরাসের মত জীবন বিপন্নকারী বিষয় হয়, নিজের জন্য ও অন্যদের জন্য, সে ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সতর্কতা অনিবার্য করণীয় (ফারদ)।

তারপরও সমাজে তো হঠকারী ও বোকা লোক কিছু থাকেই। এজন্য যা করার দরকার তাই করা বাঞ্ছনীয়।

করোনা ভাইরাস কি আল্লাহর অনুগ্রহ?

করোনা ভাইরাস অবশ্যই অপ্রত্যাশিত ও অনাকাঙ্ক্ষিত। এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি আযাব ও লা'নাত। হ্যাঁ, মু'মিনদের বিষয়টি একটু আলাদা। আল্লাহতে বিশ্বাসীরা যদি এই মসিবতে ধৈর্যধারণ করে তাহলে আল্লাহ তাদেরকে যে পুরস্কার দেন তা পাবার পর তাদের পক্ষে এটি শাপে বর হয়ে যায়। ইতিপূর্বে যে হাদীসে বলা হয়েছে যে, মু'মিন যদি সবর করে এবং সওয়াবের নিয়তে নিজ ঘরে স্বেচ্ছাবন্দী থাকলে তাকে শহীদের সওয়াব দেওয়া হবে। বুখারী শরীফের ওই হাদীস (৩৪৭৪) এর ব্যাখ্যায় 'ফাতহুল বারী'তে ব্যাখ্যাকার ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী বলেন, এখানে শহীদের সওয়াব পাওয়ার জন্য মৃত্যু শর্ত নয়। জীবিত থাকলেও তা পাবে।

ব্যস্ত মানুষ ঘরে নিঃসঙ্গ নিজেকে আটকে রাখাও একটি যুদ্ধ। তাই শহীদের সওয়াব পাবে। বাকী থাকলো তাদের কষ্ট ও জীবনাবসান। তাই এটিকে আযাব বলা হয়েছে। তবে মানুষ হিসেবে আমরা কোন মানুষের জন্য এই আযাব কামনা করি না। হাদীসটিতে যৌক্তিক পক্ষপাত রয়েছে, এ নিয়ে বিরূপ ভাবনা সঠিক নয়। এমন বহু ঘটনা রয়েছে যা একজনের জন্য অকল্যাণ হলে অন্যের জন্য কল্যাণ হয়ে থাকে। মানব সভ্যতার ইতিহাসে আদ, সামুদ জাতি ফেরাউন, নমরুদ এর মতো স্বেচ্ছাচারী রাজাদের পতন হয়েছিল– তা তো শাস্তিই ছিল।

এই করোনা ভাইরাস আরেকবার বিশ্বের ক্ষমতাসীনদেরকে বুঝিয়ে দিয়েছে যে, আল্লাহর শক্তির সামনে মানুষ কত অসহায়। এ থেকে আমাদের উপদেশ গ্রহণের সুযোগ আছে। কাজেই ভাইরাসঘটিত অবস্থা কখনও কখনও অনুগ্রহ রূপে আবির্ভূত হয়। এটি কঠিন পরীক্ষা। এতে ধৈর্যের সাথে যারা উত্তীর্ণ হবে তাদের জন্য পুরস্কার আছে। পুরস্কার হোক আর তিরস্কার–এ থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করতে হবে। ধৈর্য, সাহস ও ঈমানী শক্তি দিয়ে একে সামাল দিতে হবে।

মিশরের আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামী সংস্কৃতি ও নৈতিকতা বিভাগের দায়িত্বশীল প্রফেসর ও প্রাক্তন সংসদ সদস্য, শায়খুল আযহার আহমাদ আত-তায়্যিব নিম্নরূপ একটি বার্তা প্রেরণ করেন :

“করোনা ভাইরাসকে ঘৃণা করবেন না। আল্লাহকে ধন্যবাদ, এই ভাইরাস বিশ্ব মানবতাকে তার সঠিক পথে ফিরিয়ে এনেছে। এতে মানুষ তার স্রষ্টার কাছে ফিরে এসেছে এবং নৈতিক মূল্যবোধকে পুনরায় ধারণ করছে। অনৈতিক

কাজগুলো যথা- মদের বার, নাইট ক্লাব, পতিতালয়, ক্যাসিনো বন্ধ করে দিয়েছে। এছাড়াও–

- এটি সুদের হারকে কমিয়ে এনেছে।
- পরিবারের সদস্যদের একত্রিত করেছে। পরিবারকে সময় দেওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।
- যাবতীয় অশ্লীল আচরণ বন্ধ করেছে।
- এটি মৃত পশু-পাখি, অখাদ্য এবং নিষিদ্ধ প্রাণী খাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে।
- এরই মধ্যে এর কারণে সামরিক ব্যয়ের এক-তৃতীয়াংশ স্বাস্থ্যসেবাতে স্থানান্তরিত হয়েছে।
- বিভিন্ন মুসলিম দেশে শিশা, হুক্কা পান, জনসমক্ষে অশ্লীল বেলি ড্যান্স ও আবাসিক অশ্লীলতা ও সকল অনৈতিক কাজ নিষিদ্ধ করা হয়েছে।
- করোনা ভাইরাস মানুষকে স্রষ্টার কাছে দু'আ করতে বাধ্য করছে।
- এটি স্বৈরশাসক এবং তাদের ক্ষমতাকে তুচ্ছ করে স্রষ্টার ক্ষমতাকে সামনে মাথা নত করতে বাধ্য করেছে।
- প্রযুক্তির উপর একান্ত নির্ভরতা না করে মহান প্রভুর ইবাদতে মনোযোগী হচ্ছে। কারাগার ও বন্দীদের প্রতি কর্তৃপক্ষের সহানুভূতি সৃষ্টি করেছে। বিভিন্ন দেশে কিছু বন্দী মুক্তি দেওয়া হচ্ছে।
- এটি মানুষকে হাঁচি, কাশি দেওয়ার তালীম দিচ্ছে যেমনটি আমাদের মহানবী (সা) ১৪০০ বছর আগে শিখিয়েছিলেন।
- ঘরে সময় কাটালে সহজ জীবন যাপন হয়। অহেতুক প্রতিযোগিতা না করতে শিখিয়েছে।
- আমাদের মধ্যে ইসলামী চেতনা জাগ্রত করে, মহান সৃষ্টিকর্তার নিকট ক্ষমা ও প্রার্থনা করার সুযোগ দেওয়ার জন্য আমরা আল্লাহর কাছে শোকরিয়া জ্ঞাপন করি।

আলহামদুলিল্লাহ, জ্ঞানীদের জন্য এতে মূল্যবান শিক্ষা রয়েছে (আরব নিউজ)।

অনেকে আবার এও বলেছে– এই মহাপরীক্ষায়- প্রাণপ্রকৃতি দূষণমুক্ত হয়েছে। লকডাউনের কারণে কার্বন নিঃসরণ বন্ধ হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব অনুভূত হচ্ছে। গাছে গাছে পাখ-পাখালীর কলরবে মুখরিত হচ্ছে আমাদের প্রতিবেশ। সৈকতে ডলফিনেরা এখন আবার নিরুপদ্রবভাবে জলকেলি করছে।

যান-জটের লা'নতমুক্ত রাস্তা আর শব্দ ও গ্যাসের দূষণমুক্ত শান্ত-সুন্দর নীরবতা যেন আমাদের চৈতন্যে এক নব-বারতা নিয়ে এসেছে।

এইসব স্বপ্ন কি গ্রহণযোগ্য?

ফেইসবুকে দেখা যায়, কোন কোন তথাকথিত বুযুর্গ (?) স্বপ্নে করোনা ভাইরাসের সাথে কথা বলেছেন। এমন এমন কিছু কথা বলেছেন যাতে কিছু আবেগী মুসলিম উদ্বেলিত ও উৎফুল্ল হয়েছে। তবে স্বপ্ন তো স্বপ্নই। বাস্তবে তার কোন ভিত্তি নেই। শুদ্ধ স্বপ্ন সত্যের ৪৬ ভাগের একভাগ। আর অশুদ্ধ স্বপ্নের তো কোন দামই নেই। শুদ্ধ স্বপ্নও অন্যের জন্য প্রমাণ হিসেবে গণ্য হয় না। অভিজ্ঞ আলেমই কেবল শুদ্ধাশুদ্ধ আন্দাজ করতে পারেন। এ ধরনের স্বপ্ন বলার কী দরকার। চোখ খুলেই তো আমরা সত্য দেখতে পাই। আমাদের সামনে পবিত্র কুরআন, মহানবী (সা)-এর আদর্শ এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের পরামর্শ রয়েছে। এ ধরনের স্বপ্ন গুজবের বাহন। এ সব দায়িত্বহীন কথাবার্তা থেকে আমাদের দূরে থাকতে হবে।

আল্লাহর রাসূল (সা) বলে গেছেন: "একটি লোক মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা শুনে তা ই বলে বেড়ায়।"[২৬] "ওহে, যারা ঈমান এনেছ! যদি তোমার নিকট কোন অনির্ভরযোগ্য ব্যক্তি কোন সংবাদ নিয়ে আসে তাহলে তা যাচাই করে নেবে।" -সূরা আল্-হুজুরাত - আয়াত: ৬

গুজব এখন গজব। গুজব এমনই যে করোনা ভাইরাস চাঁদের বুড়ির কোলে বসে দাঁত কেলিয়ে হাসে। কিন্তু সরকারের শক্ত অবস্থানের কারণে গুজব ছড়ানো এখন এত সহজ নয়। তারপরও সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অসৎ উদ্দেশ্যে অনেকেই অপপ্রচার করে। এক্ষেত্রে কাউকে হেয় করার জন্য করোনা আক্রান্ত বলে প্রচার করা, বাজারে দ্রব্যমূল্য বাড়াবার জন্য মিথ্যা কথা রটানো। আতঙ্ক ছড়ানো এবং রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্য অপপ্রচার চালানোর সম্ভাবনা আছে। মহামারী বা প্রাকৃতিক দুর্যোগে অনেক সুযোগসন্ধানী পাপাত্মা ভিত্তিহীন খবর ফেরি করে থাকে। তাদেরকে আখিরাতের ভয় দেখানো যেতে পারে। দুষ্ট লোকদের জন্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থা তো আছেই। তবে এই বিপদের সময় সবাই নিজ নিজ অবস্থান থেকে ভাই বন্ধুদের নসিহত করা উচিত। সবাই জানি দুষ্ট লোকের সংখ্যা কম থাকে। তবে তারা সক্রিয় থাকে আর ভাল লোকেরা প্রায়শ নিষ্ক্রীয় থাকে। এটিই অসুবিধা।

জীবাণু রোধক দু'আ আছে?

"আউযু বিল্লাহি মিন জীবাণু ওয়া আউযু বিকা মিন ভাইরাস" এভাবে সরাসরি দু'আ নেই। তবে এমন দু'আ আছে যা সকল জীবাণু, সকল রোগ, সকল

মন্দ থেকে সুরক্ষা দেয়। কেউ হয়তো বলবেন, দু'আ দিয়ে কি হবে। ফিলিস্তিনে যে 'এমওয়াস' নামক তাউন বা মহামারী হয়েছিল তাতে তো জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত সাহাবীরাও মারা পড়েছিলেন। এর জবাবে বলব, ডাক্তারগণ রোগীকে ওষুধের প্রেসক্রিপশন দেন, সে ওষুধ সেবন করার পরও অনেক রোগী মারা যায়। এজন্য কি বলবেন যে, ওষুধে কোন লাভ নেই?

আগেই বলেছি চিকিৎসকদের পরামর্শ অক্ষরে অক্ষরে পালন করুন। তবে পাশাপাশি আল্লাহর কাছে রোগ থেকে সুরক্ষা অথবা মুক্তির জন্য প্রার্থনাও করুন। কারণ আল্লাহর দয়া না হলে ডাক্তারের ওষুধ কোন কাজেই আসবে না। চিকিৎসাই শেষ কথা হলে তো হাসপাতাল থেকে এত লাশ বের হতো না। যারা দু'আ বিশ্বাস করেন না, এটা তাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার। কিন্তু যারা কুরআন সুন্নাহ বিশ্বাস করেন তাদের জন্য কয়েকটি দু'আ এখানে লিখে দিলাম, পবিত্র কুরআন থেকে :

১। –প্রভাত অরুণিমার মালিক এর নিকট আশ্রয় চাই, যা তিনি মন্দ সৃষ্টি করেছেন তা থেকে।

মূলত সূরা আল্-ফালাক ও সূরা আন্-নাস এ দুটো সূরা নাযিল হয়েছিল মহানবী (সা)-কে এক ইহুদী চুলে যাদু করার কারণে তা নস্যাৎ করে দেওয়ার জন্য। এ জন্যই এ দুটি সূরাকে মন্দ মুক্তির সূরা বলা হয়। এ দুটি সূরা দিয়ে দু'আ করলে তা অব্যর্থ।

২। পবিত্র কুর'আনে একজন নবীর জবানীতে আছে:– "আমি যখন অসুস্থ হই তখন তিনিই আমাকে নিরাময় করেন।" (সূরা আশ্-শু'আরা: ৮০)

৩। – যখন আল্লাহ তোমাকে কোন ব্যাধি দিয়ে পাকড়াও করেন তখন তিনি ছাড়া আর কেউ নেই যে তা অপসারণ করবে। (সূরা আল্-আন'আম: ১৭)

৪। এছাড়া সূরা ফাতিহা দিয়ে তো সাপের বিষও নামিয়ে দিয়েছিলেন সাহাবা কেরাম– দূর দেশে, নিজেরা ইজতেহাদ করে। বিনিময়ে খাসি নিয়ে খেয়েছিলেন। ফিরে এসে মহানবী (সা)-কে বিষয়টি বলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কিভাবে জানতে পারলে যে ফাতিহা দিয়ে সাপের বিষ নামানো যায়? আমার অংশ কই? –এ হাদীসটি তো সহীহ বুখারীতে আছে।

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেই দিয়েছেন : "আমি অবতীর্ণ করি কুরআন, যা মু'মিনদের জন্য আরোগ্য ও রহমত; কিন্তু তা যালিমদের ক্ষতি বৃদ্ধি করে।"[২৭]

"হে মানবমণ্ডলী! তোমাদের প্রতি তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে এসেছে উপদেশ ও তোমাদের অন্তরে যা আছে তার আরোগ্য এবং মু'মিনদের জন্য হিদায়ত ও রহমত।"[২৮]

পবিত্র কুরআনে বিশেষ বিশেষ আয়াত বিশেষ বিশেষ রোগের জন্য নিরাময় হিসাবে কাজ করে। তবে পবিত্র কুরআন নাযিলের মূল উদ্দেশ্য মানুষকে সঠিক পথ দেখানো।

তবে কেউ ফুঁক দিলে গ্লাস ফেটে যায়। আবার কেউ কেউ ফুঁ দিতে দিতে ক্লান্ত হয়ে গেলেও কাজ হয় না। কারণ মহান আল্লাহর বাণী ফাসেক লোকের ঝাড়-ফুঁকের জন্য আসেনি। গভীর ঈমান নিয়ে আমলদার লোক আল্লাহর বাণী আবৃত্তি করে ফুঁ দিলে তা শেফা হয়ে থাকে।

হাদীসে মহামারীর জন্য সুনির্দিষ্ট দু'আ আছে :

১। মহানবী (সা)-এর শেখানো হাদীস : "হে আল্লাহ আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি শ্বেত রোগ, উন্মাদ হওয়া, কুষ্ঠ রোগ ও যাবতীয় দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে।"[২৯]

২। "আমি মহান আল্লাহর সম্পূর্ণ বাণীসমূহ এর উসিলায় পানাহ চাচ্ছি, তার সৃষ্টির সকল মন্দের অনিষ্ট থেকে।"[৩০]

৩। মহানবী (সা)-এর শেখানো আরেকটি দু'আ যা সর্ব রোগের জন্য প্রযোজ্য :

"মানুষের প্রভু, করে দিন মন্দকে দূর, শেফা দিন, আপনিই তো নিরাময়কারী আপনার শেফা ছাড়া নাই কোন শেফা, এমনই নিরাময় যারপর থাকে না কোন ব্যাধি।"[৩১]

৪। "আমি সকাল বা সন্ধ্যায় উপনিত হয়েছি এমন আল্লাহর নামে। যার নামের বরকতে আসমান ও যমীনের কোন কিছুই ক্ষতি করতে পারে না। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।"[৩২]

আমরা জানি এ ভাইরাসটি অভিনব (Novel) এবং দ্রুত বিস্তারকারী ঘাতক জীবাণু। এটি ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া নয়। ভাইরাসকে খালি চোখে দেখা যায় না। ব্যাকটেরিয়ায় একটি কোষ থাকে এবং অনেকগুলো এক জায়গায় বাসা বাঁধলে দেখা যেতেও পারে। ভাইরাস আল্লাহর সৃষ্টি, এর জীবন ও বংশ বিস্তার আছে। এর মৃত্যু আছে। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা জীবাণু এর প্রকারভেদ, এগুলোর গতি-প্রতিরোধ, প্রতিকার ইত্যাদি বিষয় আবিষ্কার করেছেন। কিন্তু করোনা ভাইরাস, যাকে World Health Organization (WHO) Covid-19 নাম দিয়েছেন। তা প্রতিরোধ করার কোন উপায় এখনও জানতে পারেনি। চেষ্টা চলছে। এ অবস্থায় এই ঘাতক থেকে দূরে থাকাটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় দরকার।

রেডিও, টেলিভিশন, পত্র-পত্রিকায় ও মসজিদের ইমামদের মাধ্যমে দেশের প্রায় সবাই জানে যে, হাত ধোয়া, কতটুকু দূরত্বে থাকা, আক্রান্ত হলে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া প্রয়োজন। অসুবিধা হলো হাত ধুলেও সাবান

ব্যবহার করে না, সাবান ব্যবহার করলেও ২০ সেকেন্ড ধরে তা কচলায় না, দূরত্ব বজায় রাখে না, হাঁচি, কাশি দেওয়ার সময় টিস্যু বা রুমাল ব্যবহার করে না। লোকে জানবে বলে চেপে রাখে, ডাক্তারের কাছে যায় না। জামাই বাবু ইতালি থেকে এসে শ্বশুর বাড়িতে নিবিড় মেলামেশায় মগ্ন হয়। মাত্রই স্পেন বা আরব থেকে এলো, পরের দিনই শাদী মোবারক সেরে নিল। এসব মূর্খ গোয়ার হঠাৎ দু'পয়সা হওয়া ব্যক্তিদের কারণে আজ মা-বাবা, শ্বশুর-শাশুড়ি পর্যন্ত আক্রান্ত হয়ে মারা যাচ্ছে। চোখে না দেখলে বিশ্বাস পূর্ণ হয় না।

জীবাণু আছে কিন্তু আমার কিছুই হবে না। আল্লাহ আছে। কিন্তু তাঁকে না দেখার কারণে পাপ করতে ভয় পায় না, এই যে আত্মপ্রবঞ্চনা, এই অসচেতনতাই আমদের জন্য এই ভয়াবহ পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলতে পারে।

মু'মিন তো অদৃশ্যকে বিশ্বাস করে, দেখা না গেলেও অস্তিত্ব, বায়ুর মত টের পাওয়া যায়, সে জন্যই মৃত্যু দূতকে যেমন দেখা যায় না, বিশ্বাস করতে হবে। করোনা ভাইরাসকেও দেখা যায় না তবে তা মৃত্যু ঘটাতে পারে। সে জন্যই জীবাণু ভাইরাসকে বিশ্বাস করে এ থেকে অত্যন্ত সর্তক থাকতে হবে।

এ সময় মেহমানদারী কিভাবে করবে?

এ সময় কোন মেহমানদারী নয়। ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজন যখন বিনা নোটিশে এসে দরজার সামনে দাঁড়ায় তখন তাদেরকে ফেরানো খুবই বিব্রতকর। তবুও দাঁতে দাঁত চেপে তাকে বলতে হয়– কিছু বলার থাকলে দূর থেকে বলে যান। আপনার নিজের স্বার্থে বাসায় না ঢুকে ফিরে চলে যান। Please don't mind! এরপরও মাইন্ড করলে পরে সুধরে নেওয়া যাবে। এখনতো জীবন বাঁচাই। জীবনের দাম মেহমানদারীর বা অনাকাঙ্ক্ষিত অতিথির বেজার হওয়া থেকে অনেক বেশি মূল্যবান।

মুসাফাহা

মুসাফাহা করা যাবে না, হাতের তালু, চোখ, মুখ, ঠোঁট বরং মুখমণ্ডলের জায়গা নরম হওয়ায় ভাইরাসটি এ পথগুলো দিয়ে সহজেই গমনাগমন করতে পারে।

হ্যাঁ, দুজন মুসলিম কিছু সময়ের ব্যবধানে সাক্ষাৎ হলে হাত মেলানোর সময় বলে "আল্লাহ আমাদেরকে এবং আপনাকে ক্ষমা করুন।" এতে ঝরা পাতার মত তাদের হাত হতে গুনাহ ঝরে পড়ে। এটি সহিহ হাদীস। কিন্তু এমন হাদীস কি আছে যে, মুসাফাহা করলে দু'আ পড়লে এই ভাইরাস এক দেহ থেকে অন্য দেহে ছড়াবে না? তাহলে অবশ্যই মুসাফাহা করবেন না। আবেগে কোলাকুলি করোনা ভাইরাস আপনাকে আলিঙ্গন করবে। কাজেই মানুষ মানুষে কমপক্ষে ৬ ফুট বা এক মিটার দূরত্ব বজায় রাখতে হয়। এটিই Social distancing মনে রাখবেন।

একদিকে একটি সুন্নাত– যা পালন না করলে ছোট গুনাহও হবে না। অপরদিকে জীবন– যা একবার নিভে গেলে আর জ্বালানো যাবে না। কাজেই যে যে কাজে ভাইরাসটি স্থানান্তরিত হয় তা থেকে সাবধান থাকতে হবে। বিষয়টি এত বেশি আলোচিত যে, এখানে বিস্তারিত বলার প্রয়োজন নেই, বাইরে না গিয়ে স্বেচ্ছাবন্দী জীবন এবং জীবাণুনাশক বা সাবান পানি দিয়ে হাত ধোয়া ও শরীর ভাইরাস মুক্ত রাখার ব্যাপারে সদা সতর্ক থাকতে হবে।

আজ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু নেই, যার আহ্বানে গোটা জাতি ঐক্যবদ্ধ হয়ে যেত। কিন্তু ভয় নেই, তার প্রজাবৎসল সহানুভূতিশীল ও প্রিয় কন্যা রয়েছেন। তিনি সাহস জুগিয়ে যাচ্ছেন এবং সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছেন। আমাদের আছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি দরিদ্র মানুষের পাশে দাঁড়াতে নিজে প্যাকেজ ঘোষণা করেছেন এবং ব্যবসায়ীসহ সকলকে দরিদ্র ও অসহায় লোকদের পাশে দাঁড়াতে আহ্বান করেছেন। ৫ হাজার কোটি টাকার প্রনোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেছেন শ্রমিকদের বেতন-ভাতা অব্যাহত রাখার জন্য। ব্যাংক, এনজিও ও সরকারী প্রতিষ্ঠানকে ঋণ, কিস্তি ইত্যাদি বিষয়ে কড়াকড়ি না করে অবকাশ দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। আমাদের দেশের ডাক্তার, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মীরা খুবই আন্তরিক।

বঙ্গবন্ধু মহান মুক্তিযুদ্ধের ডাক দিয়েছিলেন। এই মার্চ মাসের ২৬ তারিখে, তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন। আজ এই মার্চে তারই কন্যা, যোগ্য রাষ্ট্রনায়ক, আমাদের প্রিয় প্রধানমন্ত্রী গোটা জাতিকে মুক্তিযুদ্ধের মত জাতিকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন। আশা করি, এ যুদ্ধেও আমরা জয়ী হবো–ইনশাআল্লাহ।

বিপদে বিভেদ নয়–ঐক্য চাই। এই বিপদের পর আরেক বিপদ আছে। তা হচ্ছে অর্থনৈতিক মন্দা। তবে আজকের খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ বাংলাদেশ হেরে যাবে না। আমাদের গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে এখন পিপিই– ব্যক্তিগত সুরক্ষা পোশাক বানানো শুরু করছে। আমরা ইবলা, ডেঙ্গু, চিকনগুনিয়া কতকিছুই পিছনে ফেলে এসেছি। করোনাও পরাজিত হবে। এক সময় কলেরা, বসন্ত, মহামারী আমাদের চোখের সামনে মা-বাবা, ভাই-বোন কেড়ে নিয়েছিল, আমরা অসহায়ের মত চেয়ে চেয়ে দেখেছি আর কেঁদেছি। সে দিনও শেষ হয়েছে। সারা বিশ্ব এখন একটি গ্রামের মত। সবাই মিলে মিশে চেষ্টা করছে এ বিপর্যয় থেকে রক্ষা পেতে।

পূর্ব পশ্চিমের দ্বন্দ্ব, জাতিতে জাতিতে ধ্বংসের প্রতিযোগিতা বিশ্বজুড়ে হানাহানি সবকিছুকে থামিয়ে দিয়ে এই করুণাহীন করোনা ভাইরাস তার দামামা বাজাচ্ছে। সবকিছু ছাপিয়ে এখন মানবতাই একটিমাত্র ব্যানার আমাদের। বিশ্ব মানবতার জয় হোক– এ হোক আমাদের সম্মিলিত গণকণ্ঠ।

করোনায় করণীয়

হাত ধোয়া

কাঙ্গালের কথা বাসি হলেই ফলে। নবীর কথা সব যমানায় চলে।

আমাদের মহানবী (সা) হাত ধোয়ার উপর খুবই গুরুত্ব দিয়ে গেছেন। বলেছেন খাবার গ্রহণের আগে ও পরে হাত ধুয়ে নেবে। ঘুম থেকে উঠে পানির বালতিতে হাত ঢুকাবার আগে আলাদা হাত ধুয়ে নেবে। তখন তো টেপ বা আধুনিক পাত্র ছিল না। সাধারণ সাহাবীদের হাত পরিষ্কার রাখার কারণ বলেছিলেন : "তুমি জানোনা রাতে ঘুমের মধ্যে তোমার হাত কোথায় কোথায় স্পর্শ করেছিল।"[৩৩] তিনি বলেছেন, "পবিত্রতা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা হচ্ছে ঈমানের অর্ধেক।" সেই উম্মতকে হাত ধোয়া প্রজেক্ট নিয়ে পশ্চিমের লোকেরা বাংলাদেশে আসে এবং সেমিনার করে। এখন বলা হচ্ছে, নামাযের দেশে করোনার প্রকোপ খুবই কম, মনে হয়। এই করোনা বিপর্যয় যদি ভাল কিছু রেখে যায় তা হচ্ছে নবী করীম (সা)-এর সুন্নতের উপর আমল।

করোনা চলে গেলেও হাত ধোয়া, গোসল করা ও পরিচ্ছন্নতা এই অভ্যাস অব্যাহত রাখতে হবে।

করোনা কথোকথা

করোনা নিয়ে কত কথা (১) ২য় বার আক্রান্ত হতে পারে তবে সম্ভাবনা কম, (২) আক্রান্ত ব্যক্তি যে পুকুরে গোসল করে সেখানে অন্যরা ৩ দিন গোসল করা একটু হলেও ঝুঁকিপূর্ণ, (৩) একই ঘরে আলাদা থাকা, Home Quaraintaine আসলে No Quaraintaine। কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, (৪) আলাদা Wash room ব্যবহার করতে হবে, (৫) ৬ ফুট দূর থেকে খাবার দেবে, (৬) নিজের প্রটেকশন নিয়ে রোগীর সেবা করতে হবে। প্রবাসী ফেরত এলে কথা না শুনলে ভর্ৎসনা করা যায়, তবে পেটানো ঠিক নয়, (৭) সেনাবহিনী অফিসার ৩ দেশে ইবলা মোকাবেলা করার অভিজ্ঞতা নিয়েছে তাদেরকে কাজে লাগানো বাঞ্ছনীয়, (৮) কাজের বুয়াকে ছুটি দেওয়া আবশ্যক, (৯) টেস্ট বাড়াতে হবে, বিশেষায়িত হাসপাতাল, যেমন সংক্রামক রোগের হাসপাতালের মতো করে ছোট ছোট ইউনিট স্থাপন, (১০) আমাদের ইউনিয়ন পর্যায়ে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা আছে, তা কাজে লাগাতে হবে পূর্ণমাত্রায়, (১১) ২০ লিটার পানিতে ২/৩ টেবলেট দিয়ে জীবাণুমুক্ত করে পানি পান করা যেতে পারে, (১২) বাজার, হাসপাতাল, সংবাদকর্মী ইত্যাদির মাধ্যমে ভাইরাস ছড়াবার ফাঁক বন্ধ করতে হবে, (১৩) আবার, ডাক্তার, নার্স ও সাংবাদিকদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তাও গুরুত্বপূর্ণ, (১৪)

কেবল যুবক কয়েকজন জামাত কায়েম করবেন, তবে না যাওয়াই ঝুঁকিমুক্ত। আলাদা জায়নামায ব্যবহার করা উচিত, সেজদায় বেশি সময় রাখলে নিঃশ্বাস বন্ধ রাখা যায় না, (১৫) অন্যকে আক্রান্ত করার অধিকার কারো নেই, এ ব্যাপারে খামখেয়ালী করলে তাকে সবাই মিলে বুঝাতে হবে।

এ লেখার উদ্দেশ্য–ইসলামী নির্দেশনা ও স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি উভয়টিই প্রয়োজন

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন : "হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে বাঁচাও এবং আগুন থেকে নিজেদের পরিবারকে বাঁচাও।"[৩৪] হাদীসে আছে– "নিজের ক্ষতি নয়, অন্যের ক্ষতিও করা যাবে না।"[৩৫]

যে ব্যক্তি বিদেশ থেকে ফিরে নিজের টেস্ট করালো না ফলে অসুস্থতা বাড়ছে। সে নিজের ক্ষতি করছে, সে আশেপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে– সে অন্যের ক্ষতি করছে। সে যেন নিজেকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করছে এবং তার পরিবারকেও। ইসলামে তা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। কাজেই ইসলামী নির্দেশনা মেনে চলতে হবে। স্বাস্থ্য বিধি মানাও ইসলাম।

এখন আমাদের করণীয়

সাধারণভাবে সকলের জন্য বিশ্বমানবতা আজ মহা দুর্যোগের মধ্যে পড়ে গেছে। এখন পৃথিবীর সকল মানুষ একে অন্যের ভাইবোন। পরম মমতায় একে অন্যের প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবে। আফ্রিকায় ৩টি দেশে ইবোলা ভাইরাস আক্রান্তদের যেভাবে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী সাহায্য করেছিল, যেভাবে চীনারা এখন ঘর শামলিয়ে মৃত্যুপুরী ইতালিতে গিয়ে সেবা করছে। তেমনি যার যেখানে, যেভাবে মানবতার সেবা করার সুযোগ আছে তা করতে কার্পণ্য করবে না। টেলিভিশনে দুর্দশার খবর দেখেই সময় পার করা সমীচীন নয়। ধর্ম, বর্ণ, জাতি ও দেশ নির্বিশেষে সকলকেই সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে নিজ নিজ দায় দায়িত্ব পালন করতে হবে। যার আলাদা থাকার কথা তার কষ্ট করে আলাদা থাকাই একটি সহযোগিতা। যে তার সেবা করছে সে দূরত্ব ও সুরক্ষা ব্যবস্থা মেনে চলাই তার পক্ষ থেকে সবাইকে সহযোগিতা। মহান আল্লাহ বলেন : "যে ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে বাঁচাবে সে যেন বিশ্বের সকল মানুষকে বাঁচালো।"[৩৬]

ডাক্তার, নার্স, পরিবহন শ্রমিক, ড্রাইভার, ওষুধ বিক্রেতা, সরবরাহকারী, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উৎপাদক, সরবরাহকারী, পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা, সংবাদকর্মী, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী, শিল্প কারখানার শ্রমিক, মালিক, ইমাম, মুয়াজ্জিন, মুসল্লী, এক কথায় জরুরী সেবাদানকারী সরকারী, বেসরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং সচেতন জনগণ, পরস্পরকে সহযোগিতা করতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন : "আর তোমরা কল্যাণকর কাজ ও সংযমী কাজে

পরস্পরকে সহযোগিতা করবে, তবে পাপ ও সীম লঙ্ঘনমূলক কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করবে না।"[৩৭] মহানবী (সা) বলেছেন : "মানুষের মধ্যে সে-ই উত্তম যে মানুষের কল্যাণ করে।"- (তাবরানী, আওসাত)

এছাড়া ধৈর্য এখন সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন, মহান আল্লাহ বলেছেন :

"নিশ্চয়ই আল্লাহ

ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন।"[৩৮]

"ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দিন।"[৩৯] আল্লাহ তা'আলা সম্মিলিতভাবে ধৈর্যধারণ ও সংহতির নির্দেশনা দিয়েছেন:

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা ধৈর্যধারণ কর। সমিল্লিতভাবে ধৈর্যধারণ কর এবং সদা সুসংহত থাক আর আল্লাহকে ভয় কর যাতে তোমরা সফল হতে পার।"[৪০]

ব্যক্তিগতভাবে করণীয়

ব্যক্তিগতভাবে করণীয় হচ্ছে – ইস্তিগফার বা ক্ষমা প্রার্থনা করা। আল্লাহ বলেন : "আপনি তাদের মধ্যে আছেন এ অবস্থায় আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দেবার নন। আর তারা ক্ষমা প্রার্থনা করছে এ অবস্থায়ও আল্লাহ্ তাদেরকে শাস্তি দেবার নন।"[৪১] কেবল মুখে আস্তাগফিরুল্লাহ পড়লেই হবে না। আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়ে মহান প্রভুর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করতে হবে, তাওবা করতে হবে।

মহান আল্লাহ বলেন : "তোমাদের মধ্যে কেউ অজ্ঞতাবশত যদি মন্দ কার্য করে তারপর তাওবা করে এবং সংশোধন করে সে ক্ষেত্রে আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"[৪২] অপর এক আয়াতে ইস্তেগফার এর সাথে তাওবাকে উল্লেখ করে বলেছেন : "আর তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং তার দিকে তাওবা প্রত্যাবর্তন কর তাহলে তিনি তোমাদেরকে এক নির্দিষ্ট কালের জন্য উত্তম জীবন উপভোগ করতে দেবেন এবং তিনি প্রত্যেক গুণীজনকে তার প্রাপ্য মর্যাদা দান করবেন।"[৪৩] (বুখারী, মুসলিম)

সাদাকাহ

মহানবী (সা) বলেছেন : নফল দান বালা-মুসিবতকে প্রতিহত করে। এ সময় ব্যক্তিগতভাবে যার যা তাওফিকে কুলায় দান-সাদাকাহ করা সময় সঙ্গত হবে।

দয়া করা

কেউ দয়াপরবশ হয়ে যদি কাউকে খাবারের যোগান দেয়, রুগ্ন ব্যক্তিকে চিকিৎসা সহায়তা দেয়, হতাশ ব্যক্তিকে মনোবল যোগায়, অসহায়কে সাহায্য করে এবং অন্যের দুঃখে দরদী হয় তাহলে আল্লাহ তাকে দয়া ও সাহায্য করবেন। মহানবী (সা) বলেন : "নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তার বান্দার সাহায্যে থাকেন, যতক্ষণ ওই বান্দাহ তার আরেক ভাইয়ের সাহায্যে ব্যাপৃত থাকে।"[৪৪]

আল্লাহ্ তো তাঁর দয়ালু বান্দাহদেরকেই দয়া করেন।" (বুখারী, মুসলিম)

বিপদে তাওবাহ করা স্রষ্টার কাছে আনত, বিনীত ও বিগলিত হয়ে দু'আ করার পর আবার বিপদ কেটে গেলে যেন আমরা মুখ ফিরিয়ে না নেই। এই খাসলত তো আমাদের আছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

"সমুদ্রে যখন তোমাদেরকে বিপদ স্পর্শ করে তখন শুধু আল্লাহ ব্যতীত যাদেরকে তোমরা আহ্বান করে থাক তাদেরকে তোমরা বিস্মৃত হয়ে যাও। তারপর তিনি যখন তোমাদেরকে উদ্ধার করে স্থলে আনেন তখন তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও। আর মানুষ তো অতিশয় অকৃতজ্ঞ।"[৪৫]

আল্লাহ তা'আলা আবার বলেছেন : "আমি যখন মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করি তখন যে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং দূরে সরে যায় আবার যখন তাকে অনিষ্ট স্পর্শ করলে সে একেবারে হতাশ হয়ে পড়ে।"[৪৬]

কাজেই এস্তেগফার ও তাওবা এর পর তা ভুলে না গিয়ে সদা ক্ষমা চেয়ে যেতে হবে। এস্তেসফারের সেরা দু'আ হচ্ছে :[৪৭]

কাজেই বিপদ বিপর্যয়ে মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে হবে, বিপদ চলে গেলে আল্লাহকে স্মরণ রাখতে হবে।

সরকারের করণীয়

সরকারের দায়িত্ব হলো জনগণকে প্রয়োজনীয় সুরক্ষা ও চিকিৎসা দেওয়া। Prevention & Protection দেওয়া এবং জনগণকে সচেতন করা। প্রয়োজনীয় সুবিধাদি (Provision) নিশ্চিত করা। সরকার সবই করছেন। কেউ কেউ বলে থাকেন সরকারের উচিত ছিল এটা করা, ওটা করা। আসলে আগে থেকে সব জানা যায় না। তবে সরকারকে বিশেষজ্ঞদের পরার্মশ নিয়ে Proactive কাজ করতে হবে। সরকার সুযোগসন্ধানী ব্যবসায়ীদেরকে নিয়ন্ত্রণ করছেন। আমাদের সদাশয় সরকার সবই করছেন। ড. মীরজাদী মনে হয় বাড়িতেও যায় না। তাজা খবর দিয়ে যাচ্ছেন। ডা. আব্দুল্লাহ মূল্যবান পরামর্শ ও সাহস দিয়ে যাচ্ছেন। কেবল জনপ্রতিনিধিদের তেমন দেখা যাচ্ছে না। সমাজে কিছু নন্দলালও আছেন। এখন পর্যন্ত আমার মনে হয়, সরকার সঠিক পথে এগুচ্ছে। ইন্টারনেট ও টিভি চ্যানেলের কল্যাণে পৃথিবীর কোথায় কী হচ্ছে আমরা তাৎক্ষণিকভাবে জানতে পারি। তাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ সহজ হয়। আন্তর্জাতিক সহযোগিতাও চলছে। সশস্ত্রবাহিনী নেমে গেছে। সরকার প্রধান ৭২৭৫০ হাজার কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেছে। সতের লক্ষ টন খাদ্যশস্য মওজুদ আছে। আলু-পেয়াজের বাম্পার ফলন হয়েছে। এক কথায় শেখ হাসিনার সরকার সম্ভাব্য সর্বোত্তম কাজটি করে যাবেন। এ সময় এটা আমাদের বিশ্বাস আছে।

কেউ বলছে করোনায় মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেবে, কেউ বলে তায়াম্মুম করাবে। এখানে কেন্দ্রীয় কোন সিদ্ধান্তের ফোরাম নেই। অথচ OIC ফিকহ একাডেমিকে এ ব্যাপারে আমরা একটি Reference হিসেবে নিতে পারি।

আমি মনে করি যথাযথ সুরক্ষা গ্রহণ করে গোসল দেওয়া বাঞ্ছনীয়। রোগীর চিকিৎসা ও সেবা করা গেলে মৃত রোগীকে গোসল করানো যাবে না কেন? পদ্ধতি ভিন্ন হতে পারে। মৃতেরও অধিকার আছে, সম্মান আছে।

দেশের প্রখ্যাত আলেমদের পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন। আশা করি, এই বইটির মাধ্যমে ধর্মীয় দিক নির্দেশনার প্রয়োজনীয়তা প্রতিভাত হবে।

বিপদ-আপদ, জান-মালের ক্ষতি যে একটি পরীক্ষা, এটি মুসলমানদের পক্ষপাতমূলক, আত্মশ্লাঘা নয়।

আল্লাহ বলেছেন : "আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করি কিছু ভয়, ক্ষুধা এবং ধন-সম্পদ, জীবন ও ফল-ফসলের ক্ষয়-ক্ষতি দ্বারা। তবে ধৈর্যশীলদের আপনি সুসংবাদ দিন। যারা তাদের ওপর বিপদ আপতিত হলে বলে আমরা তো আল্লাহরই জন্য এবং নিশ্চিতভাবেই তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী।"[৪৮]

"এরাই তারা যাদের প্রতি তাদের প্রতিপালকের নিকট হতে বিশেষ অনুগ্রহ ও রহমত বর্ষিত হয়। আর এরাই সৎপথে পরিচালিত।"[৪৯]

এ আয়াতগুলো ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। পরীক্ষায় পাশ করলেই মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। মু'মিন যদি বিপদে ধৈর্যধারণ করে মরেও যায় তাহলেও সে মর্যাদা পায়। নিশ্চেষ্ট বসে থাকা ধৈর্য নয়; বরং মহান লক্ষ্য অর্জনে অবিচল থাকাই হচ্ছে সবর। নিজ নিজ অবস্থান থেকে সবাই ঈমানী ও নাগরিক এবং মানবিক দায়িত্ব পালন করব। তাহলে আমরা লাভ করব মহান আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমত।

মহান আল্লাহর নিকট সেই দু'আটি করছি– যা ইতিহাসের এক সন্ধিক্ষণে তালুত বাহিনী জালুত বাহিনীর সম্মুখীন হয়ে যুদ্ধ শুরুর আগে করেছিল:

"হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ধৈর্য দান করুন, আমাদের পদসমূহ অবিচলিত রাখুন এবং কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য দান করুন।"[৫০]

করোনা ভাইরাস থেকে সুরক্ষার জন্য

* ২০ সেকেন্ড ধরে সাবান দিয়ে হাত ধুবেন। (যখনি বাইরের কিছু স্পর্শ করবেন)
* হাঁচি/কাশি আসলে টিসু পেপার দিয়ে তা নিয়ন্ত্রণ করবেন। নির্দিষ্ট স্থানে ফেলবেন।
* সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে চলবেন। কারো ৬ ফুটের কাছে আসবেন না।
* টাকা-পয়সা বা অন্য কিছু ধরলে সাথে সাথে জীবাণুনাশক/সাবান-পানি ধুয়ে ফেলবেন।

* প্রবাসীরা ১৪ দিন নিজেই আলাদা কক্ষে নিঃসঙ্গভাবে থাকবেন। ৬ ফুট দূরে থেকে খাদ্য-পানাহার সরবরাহ করা যাবে।
* সন্দেহ হলে দেরি না করে পরীক্ষা করাবেন।
* সাহায্য দেওয়ার সময় ভীড় করতে দেবেন না।
* আক্রান্ত হলে লুকাবেন না।
* অন্যের সমালোচনা না করে নিজে কার জন্য কী করেছেন, তা ভাবুন।
* ধৈর্য ও সাহসের সাথে বিপদে কাজ করবেন।
* WHO-এর নির্দেশনা ও সরকারী মুখপাত্রের কথা মেনে চলবেন।
* আল্লাহ্‌র নিকট দু'আ করবেন; সূরা ফালাক ও সূরা নাস পড়বেন।
* আল্লাহ্‌র নিকট তাওবাহ ও এস্তেগফার করতে থাকবেন।
* অর্থের দিকে খেয়াল করে বিভিন্ন দু'আ পড়বেন।
* কেউ গুজবে কান দেবেন না।
* যার-তার ধর্মীয় ব্যাখ্যায় কান দেবেন না।♦

তথ্যসূত্র :

১. সহীহ আল-বুখারী, হাদীস নং ৩৪৭৪; নাসাঈ, আস-সুনানুল কুবরা, হাদীস নং ৭৫২৭; মুসনাদ আহ্‌মাদ, হাদীস নং ৩৬১৩৯। ভাষ্যের শব্দ বিন্যাস তার।
২. সূরা আর-রূম : ৩০
৩. সূরা আল-বুরূজ : ১৬
৪. সূরা আনফাল : ২৫
৫. সূরা তালাক : ৩
৬. সূরা-আলে ইমরান : ১০৯
৭. *সহীহ আল-বুখারী*, হাদীস নং ৫২২৮; *মুসনাদে আহমদ*, হাদীস নং ২১৮১১
৮. *সহীহ মুসলিম*, হাদীস নং ২২২১; *মুসনাদে আহমদ*, হাদীস নং ৯২৬৩
৯. *মুসনাদ আহ্‌মাদ* হাদীস নং ৩০৩১
১০. *সহীহ আল-বুখারী*, হাদীস নং ৫৭১৭; *সহীহ মুসলিম*, হাদীস নং ২২২০; *আবু দাঊদ*, হাদীস নং ৩৯১১; *মুসনাদে আহমদ*, হাদীস নং ৩০৩১
১১. সূরা বাকারা : ১৯৫
১২. *আবু দাঊদ*, হাদীস নং ৩৮৫০; *তিরমিযী*, হাদীস নং ৩৪৫৭
১৩. সূরা সাফফাত : ৯৬
১৪. *মুসনাদে আহমদ*, হাদীস নং ৩০৩১
১৫. সূরা তালাক : ৩
১৬. সূরা বাকারা : ১৮৬
১৭. সূরা শু'আরা : ৮০
১৮. সূরা ইউনুস : ১০৭
১৯. সূরা ফাতিহা : ৪

২০. *মুসলিম, আবু দাউদ, মুসনাদে আহমদ*
২১. সূরা নাজম : ৩৯
২২. সূরা তালাক : ২-৩
২৩. সূরা আনকাবূত : ৬৯
২৪. সূরা নাহল : ৪২
২৫. সূরা বাকারা : ৩
২৬. *সহীহ মুসলিম*, হাদীস নং ৫
২৭. সূরা ইসরা : ৮২
২৮. সূরা ইউনুস : ৫৮
২৯. আবু দাঊদ, আবওয়াবুল বিতর, হাদীস নং ১৫৫৪; নাসাঈ, কিতাবুল ইসতিআযাহ, হাদীস নং ৫৪৯৩; তায়ালিসী, পৃ. ২৬৮; মুসনাদে আহমদ, খ. ২০, পৃ. ৩০৯, হাদীস নং ১৩০০৪; ইবনে হিব্বান, খ. ৩, পৃ. ২৯৫, হাদীস নং ১০১৭; হাকেম, খ. ১, পৃ. ৭১২; আদ-দিয়াউ ফিল মুখতাররাহ, খ. ৬, পৃ. ৩৪০; আবু ইয়ালা, খ. ৫, পৃ. ২৭৭, হাদীস নং ২৮৯৭; তাবারানী, আস-সাগীর, খ. ১, পৃ. ১৯৮
৩০. সহীহ মুসলিম; মুসনাদে আহমদ; তাবারানী; আস-সাগীর, খ. ১, পৃ. ১৯৮
৩১. আবু দাঊদ, হাদীস নং ৩৮৮৩; ইবনে মাজা, হাদীস নং ৩৫৩০; মুসনাদে আহমদ, খ. ১, পৃ. ৩৮১, হাদীস নং ৩৬১৫; হাকেম, খ. ৪, পৃ. ৪৬৩; তাবারানী, খ. ১০, পৃ. ২১৩
৩২. আবু দাউদ, হাদীস নং ৫০৮৮; সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং ৩৩৮৮
৩৩. *সহীহ আল-বুখারী*, হাদীস নং ১৬২; *সহীহ মুসলিম*, হাদীস নং ২৭৮
৩৪. সূরা তাহরীম : ৬
৩৫. ইবনে মাজা; দারা কুতনী; মুওয়াত্তা মালেক
৩৬. সূরা মায়িদা : ৩২
৩৭. সূরা মায়িদা : ২
৩৮. সূরা বাকারা : ১৫৩
৩৯. সূরা বাকারা : ১৫৫
৪০. সূরা আলে ইমরান : ২০০
৪১. সূরা আনফাল : ৩৩
৪২. সূরা আনআম : ৫৪
৪৩. সূরা হূদ : ৩
৪৪. *সহীহ মুসলিম*
৪৫. সূরা ইসরা : ৬৭
৪৬. সূরা ইসরা : ৮৩
৪৭. *সহীহ বুখারী*
৪৮. সূরা বাকারা : ১৫৫-১৫৬
৪৯. সূরা বাকারা : ১৫৭
৫০. সূরা বাকারা : ২৫০।

লেখক : অধ্যাপক, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মুসলিম বিশ্বের টুকরো খবর

শামস্ নূর

মাহে রমযানের শুভেচ্ছা জানালেন জো বাইডেন

পবিত্র রমযান মাস উপলক্ষে মুসলমানদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ও ফার্স্ট লেডি জিল বাইডেন। শুভেচ্ছা বার্তায় তিনি বলেন, জিল এবং আমি যুক্তরাষ্ট্র এবং বিশ্বজুড়ে মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং শুভকামনা জানাচ্ছি। রামাদান কারিম। মাসটি শুরুর প্রাক্কালে দেওয়া এক বার্তায় তিনি এ শুভেচ্ছা জানান। এক বিবৃতিতে জো বাইডেন বলেন, বহু আমেরিকান আগামীকাল থেকে রোজা শুরু করছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আমরা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, এই বছরটি কতটা কঠিন ছিল। এই মহামারীতে বন্ধুবান্ধব এবং প্রিয়জনরা এখনও একত্রিত হতে পারেননি এবং

অনেক পরিবার প্রিয়জনদের ছাড়াই ইফতার করবেন। তিনি বলেন, আমাদের মুসলিম সম্প্রদায় নতুন প্রত্যাশায় সংযম শুরু করবেন। অনেকেই সৃষ্টিকর্তার নৈকট্য লাভের জন্য আরও সচেতন হবেন, একে অন্যের প্রতি সেবার ব্রত নিয়ে, তাদের বিশ্বাসের প্রতি অবিচল থেকে সৃষ্টিকর্তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সকলের সুস্বাস্থ্য মঙ্গল এবং সুন্দর জীবন কামনা করবেন।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, প্রতিষ্ঠার পর থেকে মুসলিম আমেরিকানরা এই দেশটিকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাদের বৈচিত্র্য ও প্রাণশক্তি দিয়ে তারা যুক্তরাষ্ট্রকে প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করেছেন। আজ মুসলমানরা কোভিড-১৯ মহামারির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন। এই মহামারিতে তারা টিকা উন্নয়ন এবং সামনের কাতারের স্বাস্থ্যসেবা কর্মী হিসাবেও অগ্রণী ভূমিকা পালন করছেন। তারা উদ্যোক্তা এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিক হিসাবে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করছেন, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সামনের কাতারের কর্মী হিসাবে কাজ করছেন, আমাদের স্কুলে শিক্ষাদান করছেন, দেশজুড়ে নিবেদিতপ্রাণ সরকারী কর্মচারী হিসাবে কাজ করছেন এবং জাতিগত সমতা ও সামাজিক ন্যায় বিচারের জন্য আমাদের চলমান সংগ্রামে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছেন। কিন্তু তবুও, মুসলিম আমেরিকানরা ভীতি প্রদর্শন, ধর্মান্ধতা এবং বর্ণবাদি অপরাধের লক্ষ্যবস্তু হচ্ছেন। তাদের প্রতি এই কুসংস্কার এবং আক্রমণ ভুল। এগুলো অগ্রহণযোগ্য এবং তা অবশ্যই থামানো উচিত। আমেরিকাতে নিজের বিশ্বাস প্রকাশে কারো ভীত হওয়া উচিত নয়। আমার প্রশাসন সকল মানুষের অধিকার এবং সুরক্ষায় অক্লান্ত পরিশ্রম করবে।

প্রেসিডেন্ট হিসাবে আমার প্রথম দিনেই আমি লজ্জাজনক মুসলিম ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞার অবসান ঘটাতে পেরে গর্বিত হয়েছিলাম এবং চীনের উইঘুর, বার্মার রোহিঙ্গা এবং বিশ্বের সর্বত্র মুসলিম জনগোষ্ঠীর মানবাধিকারের পক্ষে দাঁড়াবো।

গত রমযানের পর থেকে আমরা যাদেরকে হারিয়েছি তাদের আমরা স্মরণ করি, আমরা উজ্জ্বল আগামীর জন্য আশাবাদী। পবিত্র কোরআন আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে 'ঈশ্বর বেহেশত এবং পৃথিবীর আলো' (God is the light of the heavens and earth), যিনি আমাদের অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে যান। তিনি বলেন, এবারের রমযানে হোয়াইট হাউস ভার্চুয়াল অনুষ্ঠান করলেও জিল এবং আমি আশাবাদী যে পরের বছর হোয়াইট হাউসের ঐতিহ্যবাহী ঈদ উদযাপন সকলের উপস্থিতিতেই হবে, ইনশাআল্লাহ। আমরা কামনা করি রমযান মাসটি আপনাদের এবং আপনাদের পরিবারের জন্যে একটি অনুপ্রেরণামূলক এবং ফলপ্রসূ মাস হবে।

রমযানে ট্রুডোর শুভেচ্ছাবার্তায় শুরুতে 'সালাম'

বিশ্বের সব মুসলিম জনগোষ্ঠীকে রমযানের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো। এক মিনিট ২৬ সেকেন্ডের এক ভিডিওবার্তায় ট্রুডো সবাইকে রমযানের শুভেচ্ছা জানান। কানাডায় ১৩ এপ্রিল থেকে শুরু হয়েছে মুসলিম সম্প্রদায়ের পবিত্র রমযান।

ভিডিওবার্তায় শুভেচ্ছার শুরুতেই 'আসসালামু ওয়ালাইকুম' দিয়ে শুরু করেন এবং তা শেষ করেন 'রমযান মুবারক' বলে। শুভেচ্ছাবার্তায় তিনি বলেন, করোনা মহামারিতে আমাদের দেশে মুসলিম সম্প্রদায়ের যে অবদান রয়েছে, তা অবশ্যই অনস্বীকার্য।

এসময় তিনি জনস্বাস্থ্যের নির্দেশিকা অনুসরণ করে সেহেরি-ইফতার করার আহ্বান জানান এবং এই আনন্দ উপভোগ করার ভার্চুয়াল পদ্ধতির কথা স্মরণ করিয়ে দেন। যাতে সবার জন্য নিরাপদ, স্বাস্থ্যরক্ষা ও সুস্থতা বজায় থাকে।

মসজিদ-গির্জা-সিনাগগ একই ছাদের নিচে!

ইউরোপের অন্যতম প্রধান শিল্পোন্নত জার্মানিতে একই ছাদের নিচে মসজিদ-গির্জা-সিনাগগ। ইউরোপীয় ইউনিয়নের সবচেয়ে জনবহুল দেশ জার্মানি। ইউরোপের অন্যতম প্রধান শিল্পোন্নত জার্মানি ১৬টি রাজ্য নিয়ে গঠিত একটি সংযুক্ত ইউনিয়ন। এর আয়তন ৩,৫৭,০২১ বর্গকিলোমিটার এবং আয়তনের দিক থেকে দেশটি ইউরোপের ৭ম বৃহত্তম রাষ্ট্র। পরিবেশ সচেতনতায় জার্মানিদের সুনাম বিশ্ববিখ্যাত। সাম্প্রতিক সময়ে ইউরোপজুড়ে শরণার্থী সংকটের মুহূর্তে জার্মানি শরণার্থীদের গ্রহণে উদারতা দেখিয়ে বিশ্বব্যাপী আলোচিত হয়েছে। সেই জার্মানে বিশ্বব্যাপী চলমান ধর্মীয় সংঘাত ও গোষ্ঠীগত দাঙ্গা নিরসনে এক ছাদের নিচে বিশ্বের প্রধান তিন ধর্মের উপাসনালয়।

বিশ্বব্যাপী যখন ধর্মীয় দ্বন্দ্ব-বিবাদ চলছে, তখন মুসলিম, খ্রিস্টান ও ইহুদিদের মধ্যে দূরত্ব কমানোর উদ্দেশ্যে অভিনব এ ধারণাটি প্রস্তাব করেন রেভারেন্ড গ্রেগর হোবার্গ (৪৭)। জার্মানির বার্লিন শহরে পেত্রিপালটজে নির্মিত হচ্ছে হাউজ অব ওয়ান নামের এমন অভিনব একটি উপাসনালয়। এতে থাকবে পাশাপাশি তিনটি ভবন। হাউজ অব ওয়ানের নকশা এমনভাবে করা হয়েছে যেন মসজিদ-গির্জা-সিনাগগ প্রতিটি ধর্মানুসারীরা পৃথক কক্ষে উপাসনা করতে পারেন। মাঝখানেরটি মুসলমানদের ইবাদতগৃহ মসজিদ। বামেরটি খ্রিস্টানদের উপাসনালয় গির্জা। ডানেরটি ইহুদিদের উপাসনালয় সিনাগগ। নিজ নিজ প্রার্থনা

সেরে এই তিন ধর্মের লোক বের হবেন যে ফটক দিয়ে, সেটা অভিন্ন। ফটকে এসে মিলবেন তিন ধর্মের মানুষ।

প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মযাজক গ্রেগর এ পরিকল্পনার অন্যতম উদ্যোক্তা। তার বিশ্বাস এ পদক্ষেপটি প্রতিধ্বনিত হবে বার্লিনের সীমান্ত পেরিয়ে বিশ্বের নানা প্রান্তে। মার্টিন লুথার কিং জুনিয়রের শিক্ষা থেকে এ ধারণাটি নিয়েছেন গ্রেগর। যে স্থানটিতে নতুন এ উপাসনালয় নির্মিত হচ্ছে সেখানে প্রতীকী ইট হাতে নিয়ে একসঙ্গে দেখা যায় রেভারেন্ড গ্রেগর হোবার্গ, রাবাই তোভিয়া বেন-চোরিন ও ইমাম কাদির সানচিকে। কমপ্লেক্সটি নির্মিত হলে এটিই হবে বিশ্বের প্রথম ত্রি-ধর্মের অভিন্ন উপাসনালয়। মসজিদ-গির্জা-সিনাগগ এ পরিকল্পনা এমন একটি উদ্যোগের অংশ, যার উদ্দেশ্য অভিনব ধর্মীয় যোগসূত্র স্থাপন। এই ভবন নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় অনুমোদনের এর নির্মাণকাজ শুরু হয়েছে ২০১৪ সালে। আয়োজকদের প্রত্যাশা আগামী দুই বছরের মাধ্যে ভবনটি ব্যবহারের উপযোগী হয়ে যাবে।

অনেকের কাছে এ অভিনব প্রকল্পটি মানবিক সমর্থন পেলেও সমালোচনা হচ্ছে প্রচুর। বিশেষ করে রক্ষণশীল মুসলিম সম্প্রদায় এর বিরোধিতা করছেন। স্থপতি উইলফ্রিড কুয়েনের নকশায় উপাসনালয়টি নির্মাণে প্রয়োজন ৫ কোটি ৫০ লাখ ডলার। প্রকল্পের আয়োজকরা আশাবাদী, তাদের এ প্রকল্পটি আর্থিক ও আধ্যাত্মিক যাবতীয় প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে উৎরে যাবে। নকশায় মুসলমান, খ্রিস্টান ও ইহুদিদের ঐক্যের প্রতীক হিসেবে এক পাশে বর্গাকৃতির একটি সুউচ্চ টাওয়ার রাখা হয়েছে। এই তিন ভবনের জায়গার পরিমাণ একই রাখা হয়েছে। তবে প্রার্থনার ধরন ভিন্ন হওয়ার কারণে ভেতরে আকৃতি ও অবকাঠামোর প্রকৌশলগত ভিন্নতা রাখা হয়েছে।

মসজিদ ও সিনাগগ হবে দোতলা। তবে সমান উচ্চতার ভবন হলেও গির্জা হবে একতলা। ভবন তিনটিতে মিনার কিংবা গম্বুজ থাকবে না। মসজিদের ভেতরে ওজু করার বিশেষ ব্যবস্থা থাকবে। স্থপতি উইলফ্রিড কুয়েন এ প্রসঙ্গে বলেন, আলাদা আলাদা ধর্মের প্রার্থনার কায়দা-কানুনের কথা মাথায় রেখে ভবন তিনটি ভেতরের আসবাব ও অন্যান্য অবকাঠামোর ডিজাইন করা হয়েছে।

কুয়েন বলেন, তিনি এই নকশা করতে গিয়ে তিন ধর্মের উপাসনালয় নিয়ে বিস্তর গবেষণা করেছেন। গবেষণা করতে গিয়ে দেখেছেন– মসজিদে মিনার থাকা বাধ্যতামূলক নয়। গির্জা বা সিনাগগের ক্ষেত্রেও তা-ই। এ কারণে তিনি প্রাচীনকালের ডিজাইন অনুসরণ করেছেন। এর মাধ্যমে এই তিন ধর্মের সাজুয্য যথাসম্ভব উপস্থাপনের চেষ্টা করেছেন।

বার্লিনের মুসলমান সম্প্রদায়ের ধর্মীয় নেতা ও স্থানীয় একটি মসজিদের ইমাম কাদির সানচি বলেছেন, হাউস অব ওয়ান তার কাছে ধর্মীয় মেলবন্ধনের মতো মনে হচ্ছে। এর মাধ্যমে বিশ্বকে দেখানো যাবে ইসলাম ধর্ম মোটেও অসহিষ্ণু নয়। এর মাধ্যমে এক ধর্মের মানুষ অন্য ধর্মের মানুষের সঙ্গে অভিজ্ঞতা বিনিময় করতে পারবে। জার্মানি এমন উদ্যোগ দেখে যুক্তরাষ্ট্রের উমাহাতেও 'ট্রাই ফেইথ ইনিশিয়েটিভ' নামে তিন ধর্মের এ উদ্যোগের সম্প্রতি নির্মিত একটি সিনেগগের পাশাপাশি একটি চার্চ ও একটি মসজিদ নির্মাণের প্রচেষ্টা চলছে।

আদালতে মুসলিম বিচারকের হিজাব পরিধান

আদালতে নতুন ডিজাইন করা হিজাব পরিধান করে সবাইকে চমকে দিয়েছেন দু'জন ব্যারিস্টার। লন্ডনের ডায়টি স্ট্রিটের হিউম্যান রাইটস চেম্বারসের দুজন জুনিয়র ব্যারিস্টার আদালতে নতুন ডিজাইনের মানসম্মত হিজাব চালু করেছেন। ৩১ মার্চ সাদা ও কালো রঙের নতুন ডিজাইন করা হিজাব চালু হয়।

মানবাধিকার চেম্বার ডুটি স্ট্রিট থেকে দুজন জুনিয়র ব্যারিস্টার একসাথে আদালতের জন্য হিজাব ডিজাইন করেছেন ও নিজেরা তা পরেছেন। নিয়ন্ত্রণ ও অপরাধ বিষয়ক আইনজীবী কারলিয়া লিকারগো ও ফোজদারি আইনজীবী মারয়াম মির যৌথভাবে এবার আদালতের মুসলিম নারীদের হিজাব পরিধানের উদ্যোগ নেন। এর আগে মুসলিম নারী বিচারকরা আদালতে 'বিধিসম্মত' হিজাব পরিধানে নানা ধরনের বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হতো। হিজাব পরিধানের অভ্যস্ত বিচারকরা প্রচলিত হিজাব আদালতের ভেতর পরতে পারেন না। আর হিজাবের ধরন কেমন হবে এ ব্যাপারেও কোনো নির্দেশনা নেই।

অবশেষে আদালতে নারী বিচারকদের পোশাক আইভি অ্যান্ড নরম্যান্টন প্রতিষ্ঠানে প্রস্তুত করা হয়। ২০২০ সালে প্রতিষ্ঠানটি ব্যারিস্টার লিকারগো আদালতের একমাত্র নারীদের পোশাক সেলাই প্রতিষ্ঠান হিসেবে চালু করেন। ২০০৬ সালে যুক্তরাজ্যের লিডস বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন পড়াকালে মারয়াম মির ও কারলিয়া লিগারগোর মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি হয়। পরবর্তীতে মারয়াম হিজাব নিয়ে আদালতে সমস্যায় পড়ার কথা কারলিয়ার কাছে তুলে ধরেন। কারণ আদালতে পরার জন্য উপযুক্ত কোনো হিজাব তিনি খুঁজে পাচ্ছিলেন না।

লিগ্যাল চেক-কে এক সাক্ষাতকারে মারয়াম জানান, আমার হিজাব পরিধান অনেক বেশি কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। কারণ কোর্টের হিজাবগুলো আরামদায়ক ছিল না। ফলে তা পরে থাকা স্বস্তিদায়ক ছিল না। কারলিয়া বলেন, 'আদালতে হিজাব নিয়ে মারয়ামের সমস্যার কথা শুনে আমার কাছে তা সামান্য বিষয় বলে মনে হয়। কারণ সে একজন বুদ্ধিমতী ও কর্মতৎপর বিচারক। এখন হয়ত আকার-আকৃতি, রঙ ও নকশায় আদালতের উপযুক্ত কোনো হিজাব খুঁজে পেতে ব্যর্থ হবে।' কারলিয়া আরো বলেন, 'তাই আমি নতুন ডিজাইনের হিজাব পরিধানের সিদ্ধান্ত নেই। যা হিজাবি বিচারকদের জন্য পরার উপযুক্ত হবে। পাশাপাশি পোশাকের সাজসজ্জার সঙ্গেও পুরোপুরি মানানসই হবে। অবশেষে বাঁশের সিল্ক দিয়ে নতুন হিজাব তৈরি করা হয়। শীতকালে তা দেহকে উষ্ণ রাখবে এবং গ্রীষ্মকালে ঠাণ্ডা রাখবে।' কারলিয়া জানান, 'যুক্তরাজ্যের আদালতে খুব বেশি হিজাবি বিচারক নেই। তবে ক্রাউন কোর্টে সাদা রঙের হিজাব দেখেছি এবং ম্যাজিস্ট্রেটদের মধ্যে কালো রঙের হিজাব পরিধান করতে দেখেছি। তাই আমি উভয় রং একসঙ্গে করে একটি হিজাব তৈরির প্রস্তুতি নেই।'

হিজাবি বিচারক হিসেবে নতুন ডিজাইনের হিজাব পরে নিজের অনুভূতিক জানান ব্যারিস্টার মারয়াম মির। তিনি বলেন, পুরো বিশ্বের কাছে আমার বার্তা হলো, 'বর্তমান সময়ে পেশাদার পৃথিবীকে সব শ্রেণির মানুষকে নিয়ে উদযাপন করতে হবে। সাফল্যের জন্য আপনাকে আপোষ করতে হবে না। আপনাকে দেখতে বা শুনতে কেমন লাগে তা নির্ধারণে অন্যের শরণাপন্ন হবেন না। নিজের কাছে সত্যবাদী হোন এবং নিজের পরিচয়ে আত্মবিশ্বাসী হোন। সাফল্য আপনার কাছে এসে যাবে।'

২০২০ সালে মে মাসে যুক্তরাজ্যের প্রথম ডেপুটি ডিস্ট্রিক জজ হিসেবে রাফিয়া আরশাদ দায়িত্ব পালন শুরু করেন। *সূত্র : স্কাই নিউজ*

মার্কিন ফেডারেল আদালতে প্রথম মুসলিম বিচারক

যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো ফেডারেল বিচারক হিসেবে একজন মুসলিমকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে। জাহিদ কোরাইশি (৪৫) নামের পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত ওই ব্যক্তি বর্তমানে নিউ জার্সিতে ম্যাজিস্ট্রেট বিচারক হিসেবে কর্মরত রয়েছেন। গত ৩০ মার্চ এই মনোনয়ন দেন বাইডেন। এদিন ফেডারেল বিচারক পদে কয়েকজন কৃষ্ণাঙ্গ নারীকেও মনোনয়ন দেন বাইডেন। তাদের সবার মনোনয়ন এখন সিনেটের চূড়ান্ত অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে।

এক বিবৃতিতে জো বাইডেন বলেছেন, এই মনোনয়ন সামগ্রিকভাবে অভিজ্ঞতা ও দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপক বৈচিত্র্যকে প্রতিনিধিত্ব করছে, যা আমাদের জাতিকে আরও শক্তিশালী করে তুলবে। মনোনয়নপ্রাপ্তদের প্রত্যেকেই আমাদের সংবিধানের অধীনে নিরপেক্ষভাবে যুক্তরাষ্ট্রের জনগণকে ন্যায়বিচার প্রদানের জন্য খুবই দক্ষ এবং এজন্য তারা প্রস্তুত রয়েছে।

২০১৯ সাল থেকে নিউ জার্সির ম্যাজিস্ট্রেট বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন জাহিদ কোরাইশি। সিনেটের অনুমোদন পেলে নতুন পদে যোগ দেবেন তিনি। নিউ ইয়র্কে জন্মগ্রহণকারী জাহিদ কোরাইশি বেড়ে উঠেন নিউ জার্সিতে। ১৯৯৭ সালে গ্রাজুয়েশন সম্পন্ন করার পর রাটজারস ল স্কুল থেকে উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করেন। তার মনোনয়নের মধ্য দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের নতুন প্রশাসনের জাতিগত বৈচিত্র্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের বিষয়টি ফের সামনে এলো।

বাইডেনের পূর্বসূরি সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প শ্বেতাঙ্গ আধিপত্যবাদী প্রচারণা চালিয়েই গতবার যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতায় আসীন হন। 'মেক আমেরিকা গ্রেট এগেইন' আর 'আমেরিকা ফার্স্ট' নামের দুই ধারণাকে উপজীব্য করেই নির্বাচনি প্রচারণা চালান তিনি। তার আমলে যুক্তরাষ্ট্রে নব্য নাৎসিবাদের ব্যাপক উত্থানেরও অভিযোগ রয়েছে। তবে হোয়াইট হাউসে পালাবদলের পর শ্বেতাঙ্গ আধিপত্যবাদী নীতিরও পরিবর্তন ঘটে। বহুত্ববাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের কথা জানায় বাইডেন শিবির। নিজের মেয়াদে বরাবরই রক্ষণশীল শেতাঙ্গ পুরুষদের ফেডারেল আদালতগুলোতে নিয়োগের উদ্যোগ নিয়েছিলেন ট্রাম্প। তবে বাইডেন জামানায় এ পর্যন্ত আদালত অঙ্গনে মনোনয়ন পাওয়া ১১ জনের মধ্যে মাত্র দুই জন পুরুষ। ওই ১১ জনের মধ্যে নারী, কৃষ্ণাঙ্গ, মুসলিম, এশিয়ান আমেরিকান থাকলেও কোনও শ্বেতাঙ্গ নেই। যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান অনুযায়ী, সুপ্রিম ও ফেডারেল আদালতে প্রেসিডেন্টের মনোনীত বিচারকদের নিয়োগের বিষয়টির চূড়ান্ত অনুমোদন দেয় দেশটির সিনেট। সিনেটের অনুমোদন লাভের পর তারা আজীবন এই দায়িত্ব পালন করে যেতে পারবেন। *সূত্র: আনাদোলু এজেন্সি*

ইসরাইলের যে ইসলামপন্থী দলের হাতে নেতানিয়াহুর ভাগ্য ঝুলছে

ইসরাইলে– নির্বাচনের পর সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েও ক্ষমতায় থাকার জন্য প্রয়োজনীয় আসনের জন্য সংকটে পড়েছেন ইহুদীবাদি দেশটির প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু। গত দু বছরের মধ্যে চতুর্থবারের মতো একই সমস্যা হচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী বা তার প্রতিপক্ষ– কেউই আসলে ক্ষমতায় যাবার মতো নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাননি। আর এর মধ্যেই কিংমেকার হয়ে উঠেছে রাম (Raam)

নামে একটি ইসলামপন্থী আরব দল (ইউনাইটেড আরব লিস্ট হিসেবেও দলটি পরিচিত)। এবারের নির্বাচনে পাঁচটি আসনে জয় পেয়েছে এ দলটি– যা নেতানিয়াহুকে ক্ষমতায় রাখা বা ক্ষমতা থেকে বিদায় করে দিতে ভূমিকা রাখার সুযোগ করে দিয়েছে। রক্ষণশীল মুসলিম মানসুর আব্বাসের নেতৃত্বে রাম দলটি মূলত ফিলিস্তিনের গাজা শাসন করা হামাসের ধর্মীয় ভাবধারায় গড়ে ওঠা একটি ইসলামপন্থী দল।

১৯৯৬ সালে প্রতিষ্ঠিত এই দলটি শুরু থেকে ইসরাইলের পার্লামেন্ট আসন পেয়ে আসছে। যদিও ২০০৯ সালের নির্বাচনে অংশ নেয়ার ক্ষেত্রে তাদের ওপর নিষেধাজ্ঞা দিয়েছিল দেশটির নির্বাচনী কর্তৃপক্ষ। পরে সুপ্রিম কোর্ট ওই নিষেধাজ্ঞা বাতিল করে দেয়। ২০২০ সালে ইসরাইলের আরব রাজনৈতিক দলগুলোর জোট– জয়েন্ট আরব লিস্টের অংশ ছিল যারা নজিরবিহীনভাবে ১৫টি আসন পেয়েছে পার্লামেন্টে। তবে একাই নির্বাচনে লড়ার জন্য চলতি বছরের ২৮ জানুয়ারি ওই জোট ছেড়ে আসে রাম। আরব সম্প্রদায়ের সামগ্রিক দরকষাকষির ক্ষমতাকে হুমকির মুখে ফেললেও এ সিদ্ধান্ত দলটির 'কিংমেকার' হয়ে ওঠার পথও তৈরি করে দিয়েছে। যার নেতৃত্বে শক্তিশালী হয়ে উঠছে সেই দল ৪৬ বছর বয়সী মানসুর আব্বাস হলেন দলটির মূল ব্যক্তি। ইসরাইলের রাজনৈতিক ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ সময়টিতে তিনি এখন রাজনীতির কেন্দ্রে রয়েছেন। জেরুজালেমের হিব্রু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করা দন্ত চিকিৎসক তিনি। যদিও পরে হাইফা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে মাস্টার্স ডিগ্রি লাভ করেন। ২০১৯ সালে তিনি ইউনাইটেড আরব লিস্টের নেতা মনোনীত হন এবং ওই জোটের অংশ হিসেবে পার্লামেন্টেও নির্বাচিত হন। অবশ্য বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু ও তার লিকুদ পার্টির সাথে যোগাযোগ বাড়ানোর চেষ্টা করতে গিয়ে তিনি দলের মধ্যে বিভক্তিও তৈরি করেন। ইসরাইলের প্রায় নব্বই লাখ মানুষের মধ্যে উনিশ লাখের মতো আরব আছেন যারা ১৯৪৮ সালে ইসরাইলের সীমানায় থেকে গিয়েছিলেন। ওই প্রায় সাড়ে সাত লাখ ফিলিস্তিনি তাদের বাড়িঘর ছেড়ে পালিয়েছিলো অথবা তাদের বহিষ্কার করা হয়েছিলো। যদিও ইসরাইলের নাগরিক এমন অনেক আরব নিজেদের ফিলিস্তিনি বা ইসরাইলি ফিলিস্তিনি হিসেবে পরিচিত হতে পছন্দ করেন আর অন্যরা নিজেদের ইসরাইলি আরব হিসেবে উল্লেখ করে থাকে।

ইসরাইলের আরবদের বেশিরভাগই সুন্নি মতাদর্শে বিশ্বাসী আর দ্বিতীয় বড় অংশটি খ্রিস্টান। ইসরাইলের দশ শতাংশ মুসলিম আরব বেদুইন গোত্র থেকে আসা। ১৯৪৯ সালের নির্বাচনে তারা অংশ নিয়েছিলো। আরব রাজনৈতিক দলগুলো দেশটিতে আরবদের সমান অধিকারের পক্ষে সোচ্চার ভূমিকা পালন

করে এবং একই সাথে ফিলিস্তিনের প্রতিও তাদের সমর্থন আছে। গত বছর নেতানিয়াহুর প্রতিপক্ষ বেনি গান্টজ আরব দলগুলোর সাথে জোট করে সরকার গঠনের বিষয়টি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। এর আগে নেতানিয়াহু নিজেও রামের সাথে জোটের সম্ভাবনা উড়িয়ে দিয়েছিলেন। যদিও প্রচারণায় তার সুর ছিলো নরম। এখন যদি তারা একটি জোট করতে পারেন তাহলে নেতানিয়াহু ও আব্বাস– দুজনেই লাভবান হবেন। যদিও সংবাদদাতারা বলছেন, নেতানিয়াহুর অন্য শরীকদের সাথে তারা কিভাবে একযোগে কাজ করবেন তা এখনো পরিষ্কার নয়।

জেরুজালেমে বিবিসি সংবাদদাতা অবশ্য বলছেন, কোয়ালিশনে না থেকেও নেতানিয়াহুকে সমর্থন দেয়ার চুক্তি করতে পারে রাম। কিন্তু চুক্তি বা সমঝোতা যাই হোক– আব্বাস এখন নিশ্চিত যে দরকষাকষির সুযোগ তার হাতে।

তিনি বলেছেন ইসরাইলের আরব জনগোষ্ঠীর জন্য সেরা সিদ্ধান্তটিই তিনি নেবেন। যদিও অনেকেই এখনো এ নিয়ে নিশ্চিত নন। জেরুজালেম অধিকার কর্মী ইতাফ আওয়াদ বলছেন, লিকুদ ও রাম দলের জোট ফিলিস্তিনিদের জন্য ভালো হবে না। *সূত্র: বিবিসি*

বিশ্বের অন্যতম স্বাস্থ্যসম্মত শহরের স্বীকৃতি পেল মদিনা

সৌদি আরবের পবিত্র মদিনা মুনাওয়ারা নবীর শহর। বিশ্ব মুসলিমের ভালোবাসার সর্বোচ্চ স্পন্দন এ শহর। বিশ্বের অনন্য সুন্দর শহরের মধ্যে অন্যতম শহর মদিনা। পবিত্র এই নগরীকে বিশ্বের অন্যতম স্বাস্থ্যসম্মত শহর হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও)। সংস্থাটির প্রতিনিধি দল মদিনা শহর পরিদর্শন করে জানায়, স্বাস্থ্যকর শহরের বৈশ্বিক মানদণ্ডের সবই বাস্তবায়ন আছে এই মদিনা মনোয়ারায়।

পবিত্র এই নগরীতে বাস করেন ২০ লাখ মানুষ। রাতে আলোকসজ্জা ছাড়াই মদিনাকে সাধারণ আলোয় এক অনন্য আলোকসজ্জার শহর মনে হয়। মদিনা শহরের সৌন্দর্যকে অলংকৃত করেছে মসজিদে নববী। এ ছাড়া মদিনার সুপরিকল্পিত রাস্তাঘাট ও যোগাযোগ ব্যবস্থা এতটাই উন্নত যে, মনে হবে ছবির মতো সাজানো। মসজিদে নববী ছাড়াও এ শহরে রয়েছে মদিনার প্রথম মসজিদ– মসজিদে কুবা এবং কিবলা পরিবর্তনের মসজিদ– মসজিদে কিবলাতাইন। এই মদিনা নগরী এবার বিশ্বের সবচেয়ে স্বাস্থ্যকর নগরীর মর্যাদা পেয়েছে।

মদিনাই প্রথম ঘনবসতিপূর্ণ নগরী, যা বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে স্বাস্থ্যকর শহরের মর্যাদা লাভ করলো। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার কর্মীরা আন্তর্জাতিক মাপকাঠিতে নগরীটিকে জরিপ করে এ স্বীকৃতি দিয়েছেন। ২২টিরও বেশি সরকারি, বেসরকারি ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এ জরিপ কাজে সহায়তা করেছে। এসব সংস্থাকে প্রযুক্তিগত সহায়তা করে স্থানীয় তায়্যিবা বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ড. আবদুল আজিজ আসারানি ২২টি সরকারি সংস্থা, সামাজিক সংগঠন, দাতব্য সংস্থা ও স্বেচ্ছাসেবক দলের একশ' প্রতিনিধি দলের প্রধান হিসেবে কাজ করেন। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার স্বাস্থ্যকর শহরের তালিকায় থাকা এটিই প্রথম জনবহুল শহর।

প্রসঙ্গত, ইসলামের শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাতৃভূমি মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করেন। নবী করিম (সা)-এর আগমনে আনন্দে উদ্বেলিত জনতা নিজ শহরের নাম বদলে ফেলে রাখলেন মদিনাতুন নবী অর্থাৎ নবীর শহর। এই নগরীতেই মহানবী তাঁর জীবনের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ শেষ ১০ বছর কাটিয়েছেন।

কুরআনের আয়াত বাতিলে রিট, আবেদনকারীকে জরিমানা আদালতের

মুসলমানদের পবিত্র ধর্মীয় গ্রন্থ আল-কুরআনের কিছু আয়াত সহিংসতায় উস্কানি দিচ্ছে দাবি করে সেগুলো বাতিল করতে আদালতে রিট করেছিলেন ভারতের এক ব্যক্তি। সেই আবেদনকে 'পুরোপুরি ফালতু' মন্তব্য করে রিটটি খারিজ করে দিয়েছেন ভারতীয় সুপ্রিম কোর্ট। পাশাপাশি, রিটকারীকে ৫০ হাজার রুপি জরিমানাও করা হয়েছে।

জানা যায়, গত মার্চে পবিত্র কোরআনের ২৬টি আয়াত বাতিলের আবেদন জানিয়ে দেশটির সুপ্রিম কোর্টে রিট দায়ের করেছিলেন উত্তর প্রদেশের শিয়া কেন্দ্রীয় ওয়াকফ বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান ওয়াসিম রিজভী। রিটে তিনি বলেন, কুরআনের ২৬টি আয়াত তিন খলিফা আবু বকর (রা), উমর (রা) এবং উসমান

(রা) সংযোজন করেছিলেন। তার দাবি, এই আয়াতগুলো সহিংসতা উস্কে দিচ্ছে এবং মানুষকে জিহাদে উদ্বুদ্ধ করছে। তাই এই আয়াতগুলো বাতিল করার দাবি জানান রিজভী। সেই রিটের শুনানি করতে গিয়ে গত ১২ এপ্রিল রীতিমতো ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন ভারতীয় বিচারপতি আর এফ নারিমান। শুনানি শুরুর আগেই তিনি আবেদনকারীর আইনজীবীকে জিজ্ঞেস করেন, পিটিশনটি সত্যিই গুরুতর কোনও বিষয় কি না। বিচারপতি তাকে বলেন, আপনি কি পিটিশনের জন্য চাপ দিচ্ছেন? আপনি কি সত্যিই এই পিটিশনের জন্য চাপ দিচ্ছেন? পরে বিষয়টিকে 'পুরোপুরি ফালতু' মন্তব্য করে রিটটি খারিজ করে দেন তিনি। পাশাপাশি রিটের আবদেনকারী ওয়াসিম রিজভীকে ৫০ হাজার রুপি জরিমানার নির্দেশ দেন। অবশ্য আদালত জরিমানা করার আগে থেকেই ব্যাপক সমালোচনার মুখে ছিলেন এই রিট আবেদনকারী। ওয়াসিম রিজভির ওই আবেদনের নিন্দা জানিয়েছে অল ইন্ডিয়া শিয়া পার্সোনাল ল' বোর্ড এবং অন্য মুসলিম সংগঠনগুলো। পাশাপাশি তাকে গেফতারের দাবি জানিয়েছেন ভারতের শীর্ষ শিয়া এবং সুন্নি নেতারা।

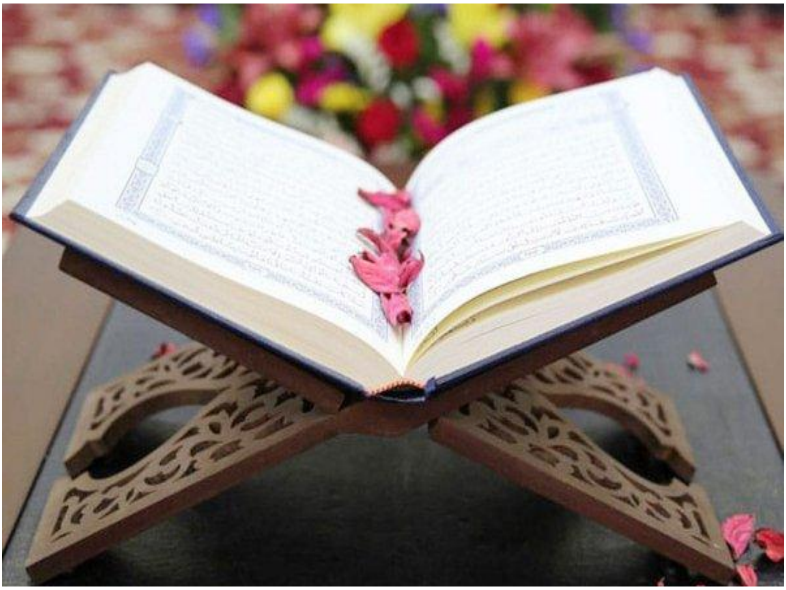

পবিত্র কোরআন আল্লাহর বাণী। এ নিয়ে কেউ কোনও দ্বিমত বা এর সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারেনি। এখন পর্যন্ত আর কোনো শিয়ার পক্ষ থেকেও কুরআন নিয়ে এ ধরনের কোনো মন্তব্য আসেনি। ভারতের মজলিস-এ-উলেমা-এ-হিন্দের সাধারণ সম্পাদক মাওলানা কালবে জাওয়াদ বলেন, রিজভী

মুসলিমবিরোধী এজেন্টের সদস্য। তাকে গ্রেফতার করা উচিত। রিজভী না শিয়া না মুসলিম। তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া উচিত।

প্রথম বারের মতো হিজাবি মুসলিম নির্বাচিত নেদারল্যান্ড পার্লামেন্টে

নেদারল্যান্ড পার্লামেন্টের সদস্য হিসেবে প্রথম বারের মতো একজন হিজাবি মুসলিম নির্বাচিত হয়েছেন। গত ২১ মার্চ নেদারল্যান্ডের আবহাওয়া কর্মী কৌথার বাউচলখাটকে পার্লামেন্টের সদস্য হিসেবে ঘোষণা দেয়া হয়। টুইটারের এক পোস্টে বাউচলখাট জানান, সব বাধার পর আমরা বিজয়ী। সবার প্রতি ধন্যবাদ। সবার সঙ্গে মিলে ঘৃণাকে জয় করে সাম্য ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার আশা করি। ২৭ বছর বয়সী বাউচলখাট মরাক্কো বংশোদ্ভূত একজন আবহাওয়া কর্মী। নেদারল্যান্ডের গ্রোয়িন লিংকস পার্টি থেকে তিনি পার্লামেন্টে প্রতিনিধিত্ব করবেন। বাউচলখাটের বিরুদ্ধে ডানপন্থী দলের সদস্যরা দীর্ঘ দিন যাবত ঘৃণা ও বৈষম্যমূলক প্রচারণা চালিয়ে আসছে। তদুপরি তীব্র প্রচারণা ও নির্বাচনে নিজ দলের পরাজয়ের পরও নির্বাচনে তার বিজয়ে অনেকের নজরে আসেন তিনি। প্রসঙ্গত, গত ডিসেম্বরে এক খোলা চিঠিতে স্বাক্ষর করে যুক্তরাজ্যের শতাধিক রাজনীতিবিদ, সমাজকর্মী, শিক্ষাবিদসহ বিভিন্ন পেশার ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান বাউচলখাটের প্রতি সংহতি প্রকাশ করেন এবং বর্ণবাদ ও ইসলাম বিদ্বেষের বিরুদ্ধে নিন্দা জানান। স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমের সূত্রে জানা যায়, কৌথার বাউচলখাট নির্বাচনে ১৯ হাজারের বেশি ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন। ডাচ সংবাদ মাধ্যম গ্লামাউর-কে প্রদত্ত এক সাক্ষাতকারে বাউচলখাট জানান, নেদারল্যান্ডের অনেকে আমার ধর্মকে সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে নেতিবাচকভাবে সম্পৃক্ত

করতে চান। তাছাড়া আমার মতো মুসলিমকে জলবায়ু বিষয়ক কর্মসূচিতে সম্পৃক্ত দেখে বেশ অবাক হোন। মহান আল্লাহ আমাদেরকে পৃথিবী দান করেছেন। পৃথিবীকে বসবাসযোগ্য রাখা আমাদের সবার কর্তব্য। *গন্ডামাউর, এবাউট ইসলাম*

যুক্তরাষ্ট্রের কনিষ্ঠতম মুসলিম কর্মকর্তা বুশরা

যুক্তরাষ্ট্রের কনিষ্ঠতম মুসলিম কর্মকর্তা হিসেবে নির্বাচিত হয়ে সবার নজর কাড়েন শিকাগোর বাসিন্দা বুশরা অ্যামিওয়ালা। মাত্র ২১ বছর বয়সে স্কোক স্কুল বোর্ডের সদস্য হিসেবে নিজের নাম লিখিয়েছেন তিনি। সম্প্রতি 'আওয়ার আমেরিকা : উইম্যান ফরওয়ার্ড' নামের হুলু ডকুমেন্টারিতে তাঁর কৃতিত্ব তুলে ধরা হয়। কয়েক দশক আগে বুশরার বাবা-মা পাকিস্তানের করাচি থেকে যুক্তরাষ্ট্রের নিজেদের অভিবাসন গড়ে তোলেন। প্রথম দিকে আমেরিকায় এসে বুশরার বাবা কাপড়ের দোকানসহ বিভিন্ন পেশায় কাজ করেন। বুশরা যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরে জন্মগ্রহণ করেন। ওই সময় বাবা-মায়ের স্বপ্ন ছিল তাদের মেয়ে একদিন আমেরিকার সরকারি কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করবে। তাঁদের ভাবনা ছিল, একদিন ছোট্ট মেয়েটি মুসলিম তরুণী ও নারী সমাজের কাছে আদর্শ হয়ে উঠবে। বুশরা ১০ বছর বয়স থেকে সপরিবারে ইলিনয়সের স্কোক কুক কাউন্টিতে বসবাস শুরু করেন। এখানের নাইলস নর্থ হাই স্কুল থেকে উচ্চমাধ্যমিক পড়াশোনা সম্পন্ন করেন। এরপর যুক্তরাষ্ট্রের ডেপাউল বিশ্ববিদ্যালয়ে তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বিষয়ে স্নাতক পর্যায়ে পড়াশোনা করেন। তা ছাড়া সমাজসেবা ও সরকারি নীতি বিষয়েও পড়াশোনা করেন। ২০১৮ সালে বুশরা স্কোকি ইলিনয় শহরের প্রাথমিক নির্বাচনে কাউন্টি বোর্ড অব কমিশনার্সের কনিষ্ঠতম ডেমোক্র্যাট প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে অংশ নেন এবং দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ভোট লাভ করেন। এ নির্বাচনে তিনি ল্যারি

সাফরেডিনের কাছে হেরে যান। এরপর সাফরেডিনের পরামর্শে ইলিনয়ের শিক্ষা অফিসের সরকারি কর্মকর্তা হিসেবে নির্বাচন করে জয়ী হোন। ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারিতে সমাজসেবা ও শ্রেষ্ঠ তরুণ হিসেবে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন সম্মাননা পুরস্কার এশিয়ান আমেরিকান কোয়ালিশন অব শিকাগো (এএসিসি) লাভ করেন।

হোয়াইট হাউসে হিজাব পরে প্রেস ব্রিফিং, ইতিহাস গড়লেন সামিরা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হোয়াইট হাউজে ইতিহাস গড়লেন কাশ্মিরি কন্যা সামিরা ফাজিলি। প্রথম হিজাবধারী হিসেবে হোয়াইট হাউজের প্রেস ব্রিফিংয়ে কথা বলেছেন তিনি। গত মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে নিয়মিত সাংবাদিক সম্মেলনে ব্রিফ করেন সামিরা। তিনি প্রশ্নোত্তর পর্বেও অংশগ্রহণ করেন। তিনি বাইডেন প্রশাসনের ন্যাশনাল ইকোনমিক কাউন্সিলের ডেপুটি ডিরেক্টর হিসেবে কর্মরত আছেন। হোয়াইট হাউসের অন্যান্য কর্মকর্তার চেয়ে তার পোশাক ছিল একেবারেই আলাদা। প্রথম হিজাবধারী হিসেবে হোয়াইট হাউসের প্রেস ব্রিফিংয়ে অংশ নিয়ে গড়েন নতুন এক ইতিহাস।

হোয়াইট হাউসের ব্রিফিংয়ের সেই ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এখন ভাইরাল। টুইটারসহ বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এখন ভাসছে যুক্তরাষ্ট্রের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিষয়ে বাইডেনের উদারনীতির প্রশংসায়। গত জানুয়ারিতে হোয়াইট হাউসে জাতীয় অর্থনৈতিক কাউন্সিল বা 'ন্যাশনাল ইকোনমিক কাউন্সিল'-এর উপপরিচালক হিসেবে নিয়োগ পান কাশ্মীরি বংশোদ্ভূত সামিরা। এদিন করোনাভাইরাসের আঘাতে বিপর্যস্ত মার্কিন অর্থনীতির পুনরুজ্জীবন বিষয়ক দিকনির্দেশনা দেন তিনি। এর আগে সামিরা ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক অব আটলান্টার সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিভাগের পরিচালক ছিলেন। এ ছাড়া

বারাক ওবামার আমলে হোয়াইট হাউসের আর্থিক নীতিনির্ধারক পরিষদের পরামর্শদাতা হিসেবেও কাজ করেছেন তিনি। সেই সময় এনইসি ও ট্রেজারি বিভাগের সিনিয়র উপদেষ্টা পদেও কাজ করেছেন সামিরা। যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক বিষয়ক আন্ডার সেক্রেটারির দাফতরিক নীতিনির্ধারক দলে কাজ করার অভিজ্ঞতাও রয়েছে তার।

সামিরা ক্ষুদ্র ঋণ, আবাসন ঋণ এবং গ্রাহক সম্পর্কিত বিষয়ের বিশেষজ্ঞ। তার জন্ম নিউইয়র্কের উইলিয়ামস ভিলে। তিন সন্তানের জননী সামিরা এখন বসবাস করেন জর্জিয়াতে। পড়াশোনা করেছেন ইয়েল ল' স্কুলে। স্নাতক সম্পন্ন *করেছেন হার্ভার্ড কলেজ থেকে। পরবর্তীতে ইয়েল ল'স্কুলে শিক্ষক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। সূত্র : সিএএন, রয়টার্স*

আরব পুরুষদের বিয়ে করে ইসলাম গ্রহণ করছেন ইসরাইলের নারীরা

ইসরাইল ও ফিলিস্তিনের মধ্যে কয়েক যুগ ধরে চলছে রক্তক্ষয়ী সংঘাত ও বিপর্যয়। এমন পরিবেশে ইহুদি ও আরবদের মধ্যে আন্তঃবিবাহের প্রতিবাদ করে আসছে মূলধারার ইহুদি ধর্মাবলম্বীরা। কারণ আরবদের সঙ্গে সম্পর্ক করে বেশির ভাগ ইহুদি ইসলামের প্রতি ঝুঁকে পড়েন। ফলে ইহুদি ও আরবদের মধ্যে আন্তঃবিবাহের বিরোধিতায় তৈরি হয়েছে বহু ইসরাইলি সংগঠন। ইহুদি ও অইহুদিদের মধ্যে যারা আরব পুরুষদের বিয়ে করে ইসলাম গ্রহণ করে, এমন নারীদের পুনরায় ফিরিয়ে আনতে সহায়তা প্রদান করে লেহাভা নামের সংগঠনটি। সংগঠনটি ইহুদি জাতিকে সুরক্ষিত রাখার কাজ করছে। অবশ্য অনেকে ইহুদি সংগঠনটির বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদ ও চরমপন্থার অভিযোগ তুলেছে। *খবর স্পুটনিক নিউজের*। ২০০৭ সালে ইহুদি ধর্মাবলম্বী তরুণ নেয়া শিটরিত ইসলাম গ্রহণ

করলে ইসরাইলে বেশ তোলপাড় শুরু হয়েছিল। কিন্তু সংগঠক আনাত পোপেস্টাইনের স্বামীর ভূমিকায় নোয় ওই সম্পর্ক থেকে ফিরে আসেন। ২০০৫ সালে আনাত পোপস্টাইন নিজের স্বামীর সঙ্গে মিলে লেভাকা সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। তার কাছে প্রতিদিন অনেকে সাহায্য চেয়ে আবেদন করে বলে তিনি দাবি করেন। বহু নও-মুসলিম নারী নিজ ধর্মে ফেরার সমাধান চেয়েছেন বলে জানান তিনি। অনেকে পরিবার ও পরিচিতজনদের মাধ্যমে আপত্তিকর সম্পর্কের কথা জানিয়েছেন। এ ছাড়া সংগঠনটি নানা জটিলতায় আক্রান্ত দুর্বল নারীদের সহায়তা করে সমাজে প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করছে। পোপস্টাইন বলেন, ইসরাইলে ইসলাম গ্রহণের সুনির্দিষ্ট সংখ্যা বলা কঠিন হবে। তবে আমরা জানি যে, ইহুদি থেকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের হার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর বাস্তব কারণ হলো, নারীরা মুসলিম পুরুষদের বিয়ে করে। পরবর্তী সময়ে মুসলিম পুরুষরা ইহুদি নারীদের তাঁদের ধর্মে নিয়ে যায়। ইহুদি ধর্মানুসারে মিশ্র পরিবারের শিশুরা মায়ের কাছ থেকে ইহুদি ধর্মের উত্তরাধিকার লাভ করে। গোপস্টাইনের বর্ণনামতে, এখানেই বিষয়টি অত্যন্ত জটিল আকার ধারণ করে। কারণ শিশুরা আরব পিতার সঙ্গে থেকে যান। পরবর্তী সময়ে বড় হয়ে তারা আরবদের বিয়ে করে। এর মাধ্যমে তারা ইহুদি ধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ইহুদি ধর্মাবলম্বীদের ইসলাম গ্রহণের বর্তমান পরিসংখ্যান সুনিশ্চিতভাবে বলা না গেলেও তা ক্রমাগত বাড়ছে।

উদাহরণত, ২০০৩ সালে সরকারি পরিসংখ্যান মতে, মাত্র ৪০ জন ইসলাম গ্রহণ করেছেন। কিন্তু ২০০৬ সালের প্রতিবেদনে ৭০ জন অর্থাৎ ইহুদি ধর্ম থেকে ইসলাম গ্রহণের সংখ্যা গত তিন বছরের চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। এরপর থেকে ধর্মান্তরের হার ক্রমাগত বাড়ছে। *সূত্র : স্পুটনিক নিউজ*

নামাজরত মুসলিম কৃষকদের পাহারা দিলেন শিখরা

কৃষি আইন বাতিলের দাবিতে ভারতজুড়ে তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলেছেন দেশটির কৃষকরা। তাদের আন্দোলনে সমর্থন জানিয়ে কিছু মুসলিম সংগঠনও যোগ দিয়েছে। কৃষকদের চলমান এই বিক্ষোভের মধ্যেই রাস্তায় একদল মুসলিমকে নামাজ আদায় করতে দেখা গেছে, আর তাতে সংহতি প্রকাশ করেছে শিখ সম্প্রদায়ের লোকজন। তাদের সংহতির একটি ভিডিও এরই মধ্যে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। ‘দ্য লজিক্যাল ইন্ডিয়ান’ নামের একটি ইউটিউব চ্যানেল থেকে সোমবার এই ভিডিওটি আপলোড করা হয়। ভিডিওর ক্যাপশনে তারা লিখেছেন, এটাই হলো প্রকৃত ইন্ডিয়া। চলমান কৃষক বিক্ষোভের মধ্যে মুসলিমদের নামাজ আদায়ের সময় শিখরা দাঁড়িয়ে সংহতি প্রকাশ করছেন। ওই ভিডিওতে দেখা গেছে, কৃষকদের আন্দোলনে যোগ দেয়া মুসলিমরা সড়কে

নামাজ আদায় করছেন। ভিড়ের মধ্যে তাদের নামাজে যাতে কোনো ব্যাঘাত না ঘটে সেজন্য শিখ সম্প্রদায়ের লোকজন চারদিকে দাঁড়িয়ে বেষ্টনী তৈরি করে রেখেছেন। খবরে বলা হয়, যতই সাম্প্রদায়িকতার চেষ্টা হোক না কেন, হিন্দু-মুসলিম যেন একে অপরের পরিপূরক হয়ে উঠল কৃষক আন্দোলনে।

কৃষকদের সমর্থনে বিরোধী দলগুলোও এগিয়ে আসছে। একই সঙ্গে ভারতের কিছু মুসলিম সংগঠনও পাঞ্জাব ও হরিয়ানার কৃষকদের সমর্থনে যোগ দিয়েছে। এর মধ্যেই সামাজিক মাধ্যমে একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। তা দেখেই মন ভালো হয়ে গেছে অনেকের। ওই ভিডিওতে দেখা গেছে, কৃষকদের আন্দোলনে যোগ দেওয়া বেশ কয়েকজন মুসলিম ব্যক্তি নামাজে দাঁড়িয়েছেন। আর তাদের সুরক্ষার ব্যবস্থায় রয়েছেন শিখ সম্প্রদায়ের লোকেরা। আজকের ভারতে রাজধানী দিল্লির বুকে এই ছবিতে গেল শীতের মধ্যেও যেন বসন্ত এসেছে। ভারতে সাম্প্রতিক সময়ে ধর্ম নিয়ে যারা বিবাদ করছেন তাদের জন্য এই ছবি একটি আদর্শ হয়ে উঠবে। ভিডিওতে স্পষ্ট দেখা গেছে, শিখ সম্প্রদায়ের মানুষরা নামাজ পড়া মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষদের আশেপাশে দাঁড়িয়ে আছেন। যেন তাদের নামাজ পড়তে কোনো ধরনের সমস্যা না হয়। রানা আয়ুব নামে এক ব্যক্তি সামাজিক মাধ্যমে ওই ভিডিও পোস্ট করার পর পরই তা ভাইরাল হয়ে গেছে। প্রচুর মানুষ ভিডিওটি শেয়ার করেছেন। অনেকের বক্তব্য, ভিডিওটি আরও একবার ভারতের ঐক্যের ছবি তুলে ধরেছে। সাধারণ মানুষ এই ভিডিওতে প্রচুর কমেন্টও করেছেন। কেউ বলছেন, ‘এটাই ভারতের আসল চিত্র, কোনও ধর্ম, বর্ণ আমাদের আলাদা করতে পারে না। আমাদের সকলকে প্রতিটি কঠিন সময়ে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। প্রতিটি কঠিন সময়ে আমাদের একে অপরের হাত ধরে থাকতে হবে।’ গত ২৭ নভেম্বর থেকে কৃষকরা দিল্লি-হরিয়ানা সীমান্তে অবস্থান করছেন। কৃষি আইন বাতিল করার জন্য সরকারকে চাপ দিচ্ছেন কৃষকরা। এই

আন্দোলনে পুরো দেশ উত্তাল হয়ে উঠেছে। এমনকি আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও এই আন্দোলনের রেশ ছড়িয়ে পড়েছে। *সূত্র : দ্য লজিক্যাল ইন্ডিয়ান*

বিশ্বে দ্রুততম হারে বাড়ছে ধর্মান্তরিত মুসলিমদের সংখ্যা

খ্রিস্টান ধর্মের পরেই বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম ধর্ম হচ্ছে ইসলাম। বিভিন্ন অনলাইন গবেষণা অনুসারে বর্তমানে ইসলাম বিশ্বের দ্রুততম বর্ধনশীল ধর্ম। সাম্প্রতিক জরিপগুলি বলছে, বিশ্বের জনসংখ্যার প্রায় ১.৯ বিলিয়ন বা ২৪.৫ শতাংশ মুসলমান এবং প্রতি বছর ৫ হাজারেও বেশি ব্রিটিশ ইসলামে ধর্মান্তরিত হচ্ছেন যাদের বেশিরভাগই মহিলা।

জরিপের গবেষণা অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রে বছরে প্রায় ৩০ হাজার লোক ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। প্রতি বছর ইসলামে ধর্মান্তরিতদের সংখ্যা নরওয়েতে ৩ হাজার। ধর্মান্তরিতরা বলছেন যে, তাদের কাছে ইসলাম ধর্মকে অপেক্ষাকৃত যুক্তিযুক্ত এবং সত্য মনে হয়েছে এবং তাদের ঈশ্বরই ইসলামের পথে তাদেরকে চালিত করেছেন। সিএনএন'র একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'সর্বস্তরের লোক ইসলামে ধর্মান্তরিত হচ্ছে, বিশেষত হিস্পানিক এবং আফ্রিকান-আমেরিকানরা।'

মার্কিন পিউ রিসার্চ সেন্টারের গবেষণা অনুসারে, ২০৫০ সালের মধ্যে বিশ্বব্যাপি মুসলিম জনসংখ্যা ৩০ শতাংশ বা ২.৮ বিলিয়ন এবং খ্রিস্টান জনসংখ্যা ৩১ শতাংশ বা ২.৯ বিলিয়ন বৃদ্ধি পাবে যা ইতিহাসে প্রথমবারের মতো সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের এরিক কাউফম্যান বলেছেন যে, মুসলিমরা ইউরোপের সংখ্যাগরিষ্ঠের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংখ্যালঘু হবে এবং ২০৫০ সালে পশ্চিম ইউরোপের জার্মানি, ফ্রান্স এবং যুক্তরাজ্যের মতো উচ্চ অভিবাসনপ্রাপ্ত দেশে ১০-১৫ শতাংশ মুসলিম জনসংখ্যা থাকবে। ব্রিটিশ এবং কানাডিয়ান সাংবাদিক এবং লেখক ডগ স্যান্ডার্স বলেছেন যে, ২০৩০ সালের

মধ্যে জার্মানি, গ্রীস, স্পেন এবং ডেনমার্কে মুসলিম ও অমুসলিমদের জন্মের হার সমান হবে। পিউ রিসার্চের এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, ২০১০ থেকে ২০৫০ সালের মধ্যে বিশ্বের সব অঞ্চলে মুসলিম জনসংখ্যা বাপক হারে বৃদ্ধি পাবে। এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে মুসলিম জনসংখ্যা ২০১০ সালের ১ বিলিয়ন থেকে বেড়ে ২০৫০ সালের মধ্যে প্রায় ১.২ বিলিয়ন পৌঁছবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। মধ্যপ্রাচ্য-উত্তর আফ্রিকা অঞ্চলেও মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি ২০১০ সালের প্রায় ৩ শ' মিলিয়ন থেকে বেড়ে ২০৫০ সালে ৫ শ' ৫০ মিলিয়নেরও পৌঁছবে বলে মনে করা হচ্ছে। আফ্রিকার সাহারা অঞ্চলে মুসলিম জনসংখ্যা ২০১০ সালের প্রায় ২৫০ মিলিয়ন থেকে ২০৫০ সালে প্রায় ৬ শ' ৭০ মিলিয়নে উন্নীত হওয়ার পূর্বাভাস রয়েছে যা দ্বিগুণেরও বেশি। ইউরোপ এবং উত্তর আমেরিকার মতো ছোট মুসলিম জনসংখ্যার অঞ্চলগুলিতেও মুসলমানদের সংখ্যা ২০৫০ সালে প্রায় ৩০ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

ইউরোপে মুসলিম জনসংখ্যা ১৬ শতাংশ থেকে প্রায় দ্বিগুণ ৩০ শতাংশ হবে। উত্তর আমেরিকায় মুসলিম জনসংখ্যা ১০ শতাংশ থেকে ২০ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি পাবে। এশিয়া অঞ্চলে মুসলিমরা ২০৫০ সালের মধ্যে সময়ের মধ্যে হিন্দুদের ছাড়িয়ে যাবে। ২০১০ সালে ইন্দোনেশিয়া, ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ এবং নাইজেরিয়ায় বিশ্বের ৪৮ শতাংশ মুসলিম ছিল। ২০৫০ সালের মধ্যে বিশ্বের বৃহত্তম মুসলিম জনসংখ্যার দেশ ভারতের পর ইন্দোনেশিয়া, নাইজেরিয়া বাংলাদেশ এবং পাকিস্তান বিশ্বের ৪৫ শতাংশ মুসলমানের বাসস্থান হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

সূত্র : পিউ রিসার্চ স্টোর, উইকিপিডিয়া, ইন্টারনেট। ♦

বঙ্গবন্ধু ঠিকই বুঝতে পেরেছিলেন

‘হা বৃক্ষ চিরসখা মানবের’

মাহবুব রেজা

মানব মনের বিচিত্র অনুভূতির প্রকাশ সে নানাভাবে ঘটিয়ে থাকে। অনুভূতি মানুষকে নিয়ে যায় তার লক্ষ্যে। সৃষ্টির ঊষালগ্ন থেকে মানুষ তার প্রয়োজনে নানা উদ্ভাবন ও সৃষ্টিতে আত্মমগ্ন থেকেছে।

মানুষকে প্রকৃতির সন্তান বলা হয়। প্রকৃতি নানাভাবে মানুষকে তার সঙ্গী করেছে। করেছে বান্ধব। প্রকৃতি যেমন নিষ্ঠুর হতে পারে আবার এই প্রকৃতিই

মানুষকে পরমাত্মীয়ের বন্ধনে আবদ্ধও করেছে। প্রকৃতি ও মানুষ এ যেন একে অপরের সমার্থক। প্রকৃতি ছাড়া যেমন মানুষের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না তেমনি মানুষ ছাড়াও প্রকৃতির সৌন্দর্য থাকে না। প্রকৃতি নানাভাবে মানুষের পাশে ছায়ার মতো অবস্থান নিয়ে প্রমাণ করেছে সে মানুষের খুব কাছের কেউ। খুব আপনজনও। কিন্তু প্রতিদানে মানুষ কী প্রকৃতির প্রতি বৈরী হয়ে ওঠে না? কখনো কখনো মানুষ প্রকৃতির প্রতি নির্দয় হয়ে ওঠে প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে। প্রকৃতির প্রতি মানুষের এই বৈরী হয়ে ওঠায় প্রকৃতিও কখনো কখনো তাঁর অস্তিত্ব প্রমাণে সোচ্চার হয়ে ওঠে। প্রকৃতির এই প্রতিশোধ স্পৃহায় হাজার হাজার প্রাণহানি, গবাদিপশু বিনাশসহ বহুমাত্রিক প্রকৃতিতে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে পৃথিবী। প্রকৃতির বৈরী হয়ে ওঠার বিরূপ প্রতিক্রিয়া দীর্ঘকাল বহন করতে হয়েছে মানুষকে। মানুষে, প্রকৃতিতে বন্ধন সুদৃঢ় হলে তার দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব পড়ে পরিপার্শ্বে।

বৃক্ষ প্রকৃতিতে তার বিশাল ভূমিকা মেলে ধরেছে প্রথম থেকে। ইতিহাস প্রমাণ দেয়, বৃক্ষ মানুষকে নানাভাবে সমৃদ্ধ ও ঋদ্ধ করেছে। বৃক্ষসম্পদে ভরপুর একটি দেশ তার শক্তিশালী অর্থনীতিরই সাক্ষ্য রেখেছে। প্রাচীনকাল থেকে এর কোনো ব্যতিক্রম ঘটেনি।

স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশ স্বাধীনের পর সর্বপ্রথম অনুভব করতে পেরেছিলেন বৃক্ষ ও বৃক্ষসম্পদ একটি দেশের জন্য সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে। আর সেই কারণে বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সালে 'সকলের জন্য বন' স্লোগানকে সামনে রেখে একটি নতুন বন নীতির সূচনা করেন। ব্যক্তিগতভাবে বঙ্গবন্ধু নিজেও বৃক্ষরোপণ, বৃক্ষ পরিচর্যা করতে ভালোবাসতেন। বাড়ির বেঁচে যাওয়া খালি জায়গায় সাধারণ মানুষকে ফলমূল ও বনজ বৃক্ষ রোপণ করার ব্যাপারে তিনি উৎসাহিত করতেন। একটি ফলবান বৃক্ষ মানুষের উপকারে আসে, একটি দীর্ঘ সবল কাঠসমৃদ্ধ বৃক্ষ সাধারণ মানুষের অর্থের উৎস হতে পারে– এই চিন্তাভাবনায় তাড়িত হয়ে বঙ্গবন্ধু সাধারণ মানুষকে বৃক্ষরোপণের ব্যাপারে আগ্রহী করে তুলতে চেয়েছিলেন।

প্রাচীন বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, তখনকার মানুষ নানাভাবে বৃক্ষের ওপর নির্ভরশীল ছিল। শত শত বছর আগে থেকে প্রচলিত খনার বচন। জীবনের নানা সঙ্গতি অসঙ্গতি, বাস্তবতা ও নির্মম সত্যকে উপজীব্য করে রচিত হয়েছিল এইসব বচন। খনার বচর মানে শ্বাশত বাঙালির জীবনদর্শন। বাঙালি জীবনের সত্যাসত্য সব কিছুর বর্হিঃপ্রকাশ ঘটেছে খনার বচনে। 'কলা রুয়ে না কেটো পাত, তাতেই কাপড় তাতেই ভাত' এই বচনটির ভেতর দিয়ে উঠে এসেছে শাশ্বত বৃক্ষবন্দনার কথা।

বস্তুত সৃষ্টির শুরু থেকে বৃক্ষ ও বৃক্ষসম্পদ নানাভাবে মানুষের ওপর প্রত্যক্ষ প্রভাব রেখেছে। প্রাচীনকাল থেকে বাংলাদেশ বৃক্ষ ও বৃক্ষসম্পদে ছিল ঐশ্বর্যমণ্ডিত।

প্রাচীনকাল থেকে মানুষকে তার জীবনধারণের নিমিত্তে প্রচুর কাঠ ব্যবহার করত। সে সময়কার বাংলাদেশের বনসম্পদ সম্পর্কিত কোন তথ্য পাওয়া যায় না। প্রায় ২০০০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দে দ্রাবিড় সভ্যতার বিকাশ ঘটে। এই সভ্যতার বিকাশে গাছপালা পর্যন্ত অরণ্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে বলে ইতিহাসবিদরা ধারণা করছেন। অরণ্যকে নির্ভর করে প্রাচীনকালে সভ্যতা ও কৃষির উন্মেষ ঘটেছিল। জানা যায়, গোড়ার দিকে আর্যরা পশুপালন করত। পরবর্তীতে তারা ধীরে ধীরে কৃষিকাজে মনোনিবেশ করে। পালন ও কৃষি আর্যদের জীবনব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন এনে দিয়েছিল। আর্যরা বসতি নির্মাণের জন্য নির্দিষ্ট এলাকার বনজঙ্গল পরিষ্কার করত এবং অরণ্য ঘেরা পরিবেশে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলত। বৈদিক যুগের সাহিত্যকর্মেও গাছপালা ও অরণ্য নানাভাবে উদ্ভাসিত হয়েছে। হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের রামায়ণ ও মহাভারতে বনের অবস্থান ও গঠন সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়। বেদ, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, পুরাণসমূহে এই উপমহাদেশের বৃক্ষসম্পদের নয়নাভিরাম চিত্র উঠে এসেছে। রামায়ণ ও মহাভারতে আরও উল্লেখ রয়েছে যে, গঙ্গা নদীর তীরে ছিল গভীর বন।

বৈদিক যুগের পর বাংলাদেশের বৃক্ষ ও বৃক্ষসম্পদ সম্পর্কে জানতে গ্রিকদের আবাসন ও মৌর্যশাসন আমলের সময় বেশ গুরুত্বপূর্ণ। ঐতিহাসিক মেগাস্থিনিস সে সময়ে বিবরণ দিতে গিয়ে লিখেছেন, সম্রাট অশোক বৃক্ষরাজি অসম্ভব পছন্দ করতেন যে কারণে তিনি বন সংরক্ষণের কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করেন। বিখ্যাত পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ (Hinen Tasang) ৬২৯-৬৪৫ খ্রিস্টাব্দে ভারত ভ্রমণ করেন। তিনি তাঁর স্মৃতিকথায় তৎকালীন বৃক্ষ ও বৃক্ষ সম্পদের পুংখানুপুঙ্খ বিবরণ দিয়েছেন। শুধু তাই নয় তখনকার বনসমূহের অবস্থান সম্পর্কেও বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি তাঁর স্মৃতিকথায় শ্রাবন্তী, কপিলাবস্তু ও রামগ্রামসহ নিকটবর্তী অঞ্চলে গভীর বনের কথা উল্লেখ করেছেন। হিউয়েন সাঙ রামগ্রাম থেকে উত্তর-পূর্ব দিকে অগ্রসর হন বিখ্যাত এক অরণ্য পথে যা ছিল অপ্রশস্ত ও অত্যন্ত বিপদসঙ্কুল। অরণ্য থেকে বেরিয়ে হিউয়ের সাঙ কৃষ্ণগড় নামক দেশে পৌঁছান। এই বিখ্যাত পর্যটক সেসময় যে এলাকার বর্ণনা দিয়েছেন পরবর্তীতে তাতে বঙ্গদেশের প্রমাণ মেলে। হিউয়েন সাঙ তার লেখায় উল্লেখ করেছেন, পুন্ড্রবর্ধন ছিল একটি নিম্নাঞ্চলীয় দেশ। সেখানকার ভূমি ছিল আর্দ্র, উর্বর ও সমৃদ্ধ। এই অঞ্চলের ছিল প্রচুর কাঁঠাল গাছ। এরপর হিউয়ের সাং

সমতটে অর্থাৎ বর্তমান বৃহত্তর যশোর, ঢাকা ও ফরিদপুর অঞ্চলে পৌঁছান। এবং এখানকার ভূমি নিম্ন, আর্দ্র জলবায়ু এবং প্রচুর গাছপালা ও হিংস্র জীবজন্তুর কথা উল্লেখ করেন।

ঐতিহাসিকদের দেয়া তথ্যানুযায়ী প্রাচীনকাল থেকে এই বৃক্ষ সম্পদে সমৃদ্ধ ছিল। বিস্তৃত বন, অরণ্য, বৃক্ষরাজি সব মিলিয়ে বাংলাদেশ এই উপমহাদেশে ছিল উল্লেখ করার মতো। মোঘল আমলের পূর্ব পর্যন্ত বাংলার বিশাল বনসম্পদের সংরক্ষণ ছিল চোখে পড়ার মতো। মোগল শাসকরা বন ও এর প্রসার সর্বোপরি সংরক্ষণে বিশেষ করে কোন ভূমিকা গ্রহণ করেননি। তারা বনকে প্রধানত সংরক্ষিত ভূমি হিসেবে ব্যবহার করত। উদ্যান ও ছায়া নিবিড় রাজপথ নির্মাণে বৃক্ষকে ব্যবহার করত।

এই উপমহাদেশে প্রথম বনরক্ষার উদ্যোগ নেয়া হয় দক্ষিণ ভারতে। ভারতের তৎকালীন বড়লাট অর্ড ডালহৌসি ১৮৫৫ সালে ৩ আগস্ট এক বিবৃতি প্রকাশ করেন যাতে প্রথমবারের মতো সমগ্র ভারতবর্ষে বন সংরক্ষণের একটি রূপরেখা প্রকাশ পায়। স্ট্যাবিং (Stabbing) এই রূপরেখাকে 'ভারতীয় বনসম্পদের সনদ' হিসেবে অভিহিত করে। ব্রানভিস ১৮৫৬ সালে মহাবন পরিদর্শক নিযুক্ত হন। ১৮৬৪ সালের ১ নভেম্বরে ব্রিটিশ ভারতে সর্বপ্রথম বনবিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৮৬৫ সালে ভারতীয় বন পাশ এবং ১৮৬৯ সালে ফরেস্ট সার্ভিস গঠিত হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে বনাঞ্চলের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। বঙ্গভঙ্গ, দেশভাগ, মহান স্বাধীনতা যুদ্ধ নানাভাবে বৃক্ষ ও

বৃক্ষসম্পদের ওপর প্রভাব ফেলে। বহু গাছ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বন ব্যবস্থাপনা, সংরক্ষণ পদ্ধতি ভেঙ্গে পড়ে।

যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে নতুন করে বৃক্ষ সম্পদকে কীভাবে আরও সমৃদ্ধ করে তোলা যায় সে ব্যাপারে উদ্যোগ নিয়ে বঙ্গবন্ধু সুদূরপ্রসারী কার্যক্রম গ্রহণ করেন। বঙ্গবন্ধু বুঝতে পেরেছিলেন একটি বৃক্ষ যথার্থভাবে একজন মানুষের পাশে এসে দাঁড়াতে পারেন। শ্রমজীবী মানুষ, খেটে খাওয়া মানুষ তাদের আয় সীমিত। সম্পদের ওপর নির্ভর না করে তারা যদি পতিত জমিতে মূল্যবান ভেষজ, ফলজ ও বনজ বৃক্ষরোপণ করে তাহলে একটি নির্দিষ্ট সময়ের পর সেই বৃক্ষ তার পাশে এসে দাঁড়াবে ফল ও কাঠ নিয়ে। এসব দিক বিবেচনা করে বঙ্গবন্ধু স্বাধীন দেশে 'সকলের জন্য বন' নীতি গ্রহণ মানুষকে বৃক্ষরোপণ ও এর সংরক্ষণে আগ্রহী করে তোলেন। শুধু তাই নয়, বঙ্গবন্ধু সংরক্ষিত বনের বাইরে বৃক্ষসম্পদ বৃদ্ধির ওপর অধিক গুরুত্ব প্রদান করে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণে যুগোপযোগী সিদ্ধান্ত সুরক্ষায় বঙ্গবন্ধু উপকূলবর্তী এলাকায় লবণাক্ত পানি সহনশীল বৃক্ষরোপণের ব্যাপারে বিশেষ জোর দিয়েছিলেন।

১৯৭২ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু সর্বপ্রথম বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির সূচনা করেন। বঙ্গবন্ধুর অনুসৃত পথ ধরে দেশে আজও বৃক্ষরোপণ, বৃক্ষসংক্ষণে নানা ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ অব্যাহত রয়েছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বন্যা, সাইক্লোনসহ অন্যান্য কারণে দেশের বৃক্ষ সম্পদ আশংকাজনকহারে হ্রাস পাচ্ছে। আধুনিক বন ব্যবস্থাপনার কাঠামো তৈরি হলে দেশের বৃক্ষসম্পদ অযাচিত ধ্বংস থেকে রক্ষা পাবে বলে বন বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন। তারা বলছেন বন ব্যবস্থাপনা উন্নত না হলে বৃক্ষ ও বৃক্ষ সম্পদও পরিপূর্ণতা পাবে না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর বহুবিচিত্র রচনা সম্ভারে বারবার প্রকৃতির জয়গান গেয়েছেন। বৃক্ষের প্রতি তিনি তাঁর চিরায়ত ভালোবাসার কথা উচ্চারণ করেছেন। তিনি যখন বলেন, 'হা বৃক্ষ চিরসখা মানবের' তখন আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না এর মর্মার্থ। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকৃতির কথা বারবার উল্লেখ করেছেন তাঁর সাহিত্যে।

বৃক্ষরোপণ দারিদ্র্য বিমোচন ও পরিবেশ উন্নয়নের পূর্বশর্ত। পরিবেশের ভারসাম্যের জন্য বৃক্ষরোপণকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। স্বাধীনতার পর থেকে দেশে বন ও বনসম্পদের উন্নয়নকল্পে যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে তা যথার্থ কী না সে বিষয়ে বিতর্ক চলতে পারে কিন্তু সাধারণ মানুষরা রাষ্ট্রের গৃহীত বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির সঙ্গে নিজেদের ভাগ্য বিপর্যয়কে সোপর্দ করে গাছ লাগানোর প্রতি যত্নবান থেকেছেন। 'গাছ লাগান পরিবেশ বাঁচান', 'গাছ লাগান, গাছই

জীবন', ' সবুজ নগর সবুজ দেশ, বদলে দেবে বাংলাদেশ', 'ভেষজ, বনজ, ফলজ গাছ নিজের ধন, আসবে টাকা, ঘুচবে অভাব, ভরবে মন', 'ফলবৃক্ষে ভরবো দেশ, বদলে যাবে বাংলাদেশ' এ ধরনের নানা স্লোগানকে সামনে রেখে নানা সময় সাড়ম্বরে পালিত হয়েছে জাতীয় বৃক্ষরোপণ ও বৃক্ষমেলা। সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায়ে থেকে সাধারণ মানুষকে এ ব্যাপারে উৎসাহিত করা হয়েছে। রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে বৃক্ষরোপণ ও এর সংরক্ষণে এখন আহ্বান জানানো হয় তখন বুঝতে অসুবিধা হয় না এর গুরুত্ব ও অপরিহার্যতা।

বর্তমান সরকার প্রধান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতীয় বৃক্ষরোপণ আন্দোলন ও বৃক্ষমেলার গুরুত্বকে দেশের সর্বত্র পৌঁছে দেয়ার জন্য নানাবিধ কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন। এই মেলায় ঢাকায় কেন্দ্রীয়ভাবে এবং বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। এই উদ্যোগকে সফল করতে সরকার দায়িত্বপ্রাপ্ত সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগকে মাঠ পর্যায়ে কাজ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও এসে পড়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবিলায় সবার আগে নিবন্ধন ও পরিবেশকে বিপদমুক্ত রাখতে হবে।

'যারা গাছের শত্রু তারা মানুষের শত্রু' পরিবেশবিদদের এই কথা এখন সাধারণ মানুষের মুখে মুখে। বিখ্যাত মনীষীরা তাদের লেখায় যখন লেখেন, বৃক্ষের ছায়া মাতৃক্রোড়ের মতোই শীতল ও নিরাপদ তখন আর বুঝতে অসুবিধা হয় না এই কথার নিগুঢ় অর্থ। বৃক্ষবিহীন পরিবেশ বিরান, ঊষর। বৃক্ষ মানুষকে অক্সিজেন দেয়, কাঠ দেয়, ফল দেয়। মানুষকে নিজের সর্বস্ব দিয়ে বৃক্ষ প্রমাণ করেছে তার উদারতা। পরিবেশ বিশেষজ্ঞরা বলছেন, একটি দেশের মোট ভূ-খণ্ডের শতকরা ২৫ শতাংশ বনভূমি থাকা প্রয়োজন। এক সময়কার 'সুজলা-সুফল-শস্য-শ্যামলা' এখন আর সুজলা-সুফলা নেই। দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি, অপরিকল্পিত নগরায়ণ, বনভূমি উজাড়, খাল-বিল ধ্বংস করে বনাঞ্চলের ব্যাপক ক্ষতি করছে। প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটছে এর কারণে। গত দেড় দুদশকে বনভূমি উজাড় করে একশ্রেণির ভূমিদস্যুর উদ্ভব ঘটেছে যারা প্রকৃতির ব্যাপক ক্ষতিসাধন করছে। ভূমিদস্যু, নদীদস্যু, বনদস্যুদের অবৈধ তৎপরতায় ক্রমশ প্রাকৃতিক ভারসাম্যহীনতা তৈরি হচ্ছে। বনধ্বংস করার ফলে বন সংস্কুচিত হচ্ছে, বনের প্রাণী বৈচিত্র্য তথা জীববৈচিত্র্য ধ্বংসের মুখে পতিত। এক সমীক্ষায় জানা যায় স্বাধীনতার পর দেশের মোট আয়তনের ৩০ শতাংশ ছিল বনাঞ্চল। বনদস্যুদের লোলুপ দৃষ্টি পড়ে তা কমতে কমতে বর্তমানে এসে ঠেকেছে ৭ থেকে ৮ শতাংশের মতো। এক অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে জানা যায়, দেশে প্রতি ঘণ্টায় ৪.২

হেক্টর বনভূমি বিলীন হচ্ছে। এছাড়া আসবাবপত্র, জ্বালানিসহ বিবিধ প্রয়োজনে বৃক্ষসংহার চলছে অবিরাম। এক হিসাবে জানা যায়, প্রতিবছর গড়ে আমাদের দেশে আবাদী জমি হ্রাস পায় ১ লাখ ২৩ হাজার একর। ১৯৮৪ সালে কৃষি শুমারিতে দেখা যায়, আবাদী জমির পরিমাণ ২ কোটি ১ লাখ ৫৭ হাজার ৫৬৪ একর। ১৯৯৬ সালে সে জমি কমে দাঁড়ায় ১ কোটি ৮৮ লাখ ৮২ হাজার একরে। সে হিসেবে বর্তমানে আবাদী জমির পরিমাণ আরও হ্রাস পেয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য রক্ষায় সবসময়ই সোচ্চার। তিনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ সবধরনের উন্মুক্ত স্থানে প্রত্যেককে অন্তত ৩টি গাছের চারা রোপণ করার কথা বলেছেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিজেও বৃক্ষপ্রেমিক। বৃক্ষ পরিচর্যা করতে তিনি ভালোবাসেন। বর্তমান সরকার উপকূলীয় অঞ্চলে প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষার পাশাপাশি জীববৈচিত্র্য ও পরিবেশ রক্ষায় যেখানে সবুজ বেষ্টনী তৈরির লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। দেশের বনাঞ্চল ধ্বংস করলে বন্যপ্রাণীরা বিলুপ্ত হয়ে যায়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের ওপর গুরুত্বারোপ করে ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ) অধ্যাদেশ জারি করেছিলেন।

গবেষকরা তাদের গবেষণায় দেখিয়েছেন। বিগত ১০০ বছরের বিশ্বের গড় তাপমাত্রা ০.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি পেয়েছে। এর প্রতিক্রিয়া সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, উপকূলীয় বিস্তীর্ণ এলাকা সমুদ্রে তলিয়ে যাওয়া, ঝড় ও জলোচ্ছ্বাস বৃদ্ধি, স্থলভাগের অভ্যন্তরে নোনা পানির অনুপ্রবেশ, প্রাণী ও উদ্ভিদকূলের আবাসস্থল ও পরিবেশ পরিবর্তন, ফসল উৎপাদন হ্রাস ও জীববৈচিত্র্যের বিলুপ্তি ইত্যাদি প্রবণতা বেড়েছে। অনুন্নত দেশগুলোকে জলবায়ু পরিবর্তনের ধকল সামাল দিতে বেশি করে বৃক্ষরোপণ ও নতুন নতুন বনাঞ্চল গড়ে তোলার পক্ষে কাজ করতে হবে। বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে সবুজ-শ্যামলিমা গড়ে তুলে জলবায়ু পরিবর্তনের জবাব দিতে হবে। পরিবেশ সংশ্লিষ্টরা বলছেন, গাছপালার আধিক্যে বার্ষিক বৃষ্টিপাত বৃদ্ধি পায় এবং তাতে পরিবেশও নির্মল থাকে।

বর্তমান সরকার বিরল, বিপদাপন্ন ও বিলুপ্তপ্রায় উদ্ভিদ ও বন্যপ্রাণী প্রজাতি সংরক্ষণকে উৎসাহিত করতে চালু করেছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব জাতীয় পুরস্কার। প্রতিবছর সামাজিক বনায়নে অবদানের জন্য এ পদক দেয়া হয়।

বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে বাংলাদেশ একদিন পরিণত হবে সবুজ বাংলায়। সবুজের বাংলায়। মানুষের প্রকৃত বন্ধু গাছ। একথাকে ধারণ করে দেশের মানুষ গাছে গাছে ভরিয়ে তুলবে সোনার বাংলা।♦

কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে শ্রমিকের মর্যাদা

আলম শামস

মহাগ্রন্থ আল কুরআনে আল্লাহ তায়ালা প্রিয় বান্দাদের উদ্দেশ্যে সূরা জুমার ১০নং আয়াতে বলেন, "অতঃপর যখন নামাজ শেষ হবে তখন তোমরা জমিনের বুকে ছড়িয়ে পড় এবং রিযিক অন্বেষণ কর।"

নবীকুলের শিরোমণি বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা) বৈধ শ্রম প্রসঙ্গে বলেছেন, "ফরয ইবাদতের পর হালাল রুজি অর্জন করা একটি ফরয ইবাদত," (বায়হাকি)।

ইসলামে শ্রম ও শ্রমিকের মর্যাদা, সম্মান ও অধিকার অত্যধিক। বৈধ শ্রম দ্বারা অর্জিত খাদ্যকে ইসলাম সর্বোৎকৃষ্ট খাদ্য হিসেবে আখ্যা দিয়েছে এবং জীবিকা অন্বেষণকে উত্তম ইবাদত হিসেবে ঘোষণা দিয়েছে।

মানুষ অর্থ উপার্জনের জন্য যে শারীরিক, মানুষিক, বুদ্ধিবৃত্তির প্ররিশ্রম করেন তাই শ্রম। মানুষ বেঁচে থাকার, পরিবারের ভরণ-পোষণের, অপরের কল্যাণে এবং

সৃষ্টি জীবের উপকারে যে কাজ করে তাও শ্রম। ধনি-দরিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, নর-নারী, নির্বিশেষে সব মানুষই কোনো না কোনো শ্রমে নিয়োজিত। আর যে কোনো কাজ করতে গেলেই প্রয়োজন হয় শ্রমের। এ হিসেবে পৃথিবীর প্রায় সব মানুষকেই শ্রমিক হিসেবে অভিহিত।

অর্থনীতির পরিভাষায় যারা সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং শিল্প-কারখানায় কর্মকর্তার অধীনে শ্রমিক-কর্মচারী হিসেবে যারা কাজ করেন তারাই শ্রমিক, শ্রমজীবী মানুষ। আর যারা শ্রমিকদের কাজে নিয়োগ করেন, তাদের নিকট থেকে যথাযথভাবে কাজ আদায় করেন এবং শ্রমের বিনিময়ে মজুরি বা বেতন-ভাতা প্রদান করেন তারাই মালিক।

যে কোন উন্নতি ও অগ্রগতির চাবিকাঠি হলো পরিশ্রম। যে জাতি যত বেশি পরিশ্রমী, সে জাতি তত বেশি উন্নত। সব ধরনের শ্রমিককেই মর্যাদা দিতে হবে। উন্নত দেশগুলোতে যেভাবে শ্রমের মর্যাদা দেয়া হয় আমাদের দেশে সেভাবে শ্রমের মর্যাদা দেয়া হয় না। একজন দিনমজুরের শ্রম, কৃষকের শ্রম, শিক্ষকের শ্রম, অফিসারের শ্রম, ব্যবসায়ীর শ্রম-সবই সমান মর্যাদার অধিকারী। শ্রমের মর্যাদা সমাজের অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করে। শ্রমের ব্যাপারে মানুষের প্রয়োজনীয় কোনো কাজই তুচ্ছ নয়। মুচি জুতা সেলাই করেন, নাপিত চুল কাটেন, দর্জি কাপড় সেলাই করেন, ধোপা কাপড় পরিষ্কার করেন, জেলে মাছ ধরেন, ফেরিওয়ালা ফেরিকরে মালামাল বিক্রি করেন, তাঁতি কাপড় বুনেন, কুমার মাটির আসবাবপত্র তৈরী করেন, মাঝি নৌ পথে মানুষ পারাপার করেন। এসব কাজ এতই জরুরি যে, কাউকে না কাউকে অবশ্যই এ কাজগুলো করতেই হবে। কেউ যদি এসব কাজ করতে এগিয়ে না আসেন তা হলে মানবজীবন অচল হয়ে পড়বে। তাই কোনো কাজই নগণ্য নয়। যারা এসব কাজে নিয়োজিত তারা ছোট বা ঘৃণ্য নন।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন, "তিনি তোমাদের জন্য ভূমি সুগম করে দিয়েছেন। কাজেই তোমরা এর দিক-দিগন্তে বিচরণ কর এবং তার দেওয়া রিযিক থেকে আহার কর।" (সূরা : মুলক, আয়াত-১৫)

আমাদের প্রিয় নবী (সা) শ্রমকে ভালোবাসতেন। তিনি নিজ হাতে জুতা মেরামত করেছেন, কাপড়ে তালি দিয়েছেন, মাঠে মেষ চড়াতেন। নবীজি ব্যবসা পরিচালনাও করেছেন। খন্দকের যুদ্ধে নিজ হাতে পরিখা খনন করেছেন। বাড়িতে আগত মুসাফির কর্তৃক বিছানায় পায়খানা করে রেখে যাওয়া কাপড় ধৌত করে

মানবতা ও শ্রমের মর্যাদা সর্বোচ্চ স্থানে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। শ্রমিকের মর্যাদা সম্পর্কে মহানবী (সা) বলেন, "শ্রমজীবী আল্লাহর বন্ধু।" (বায়হাকি)।

নবী মুহাম্মদ (সা) এ ব্যাপারে আরো বলেন, "নিজ হাতে উপার্জিত খাদ্যের চেয়ে উত্তম খাদ্য আর নেই। আল্লাহর নবী দাউদ (আ) নিজের হাতে কাজ করে খেতেন।" (বুখারী)

কুরআন-হাদিস ও ইসলামের ইতিহাস থেকে জানা যায়, নবী-রাসূলগণ শ্রমিকদের কত মর্যাদা দিয়েছেন। মালিক হযরত শোয়াইব (আ) তার মেয়ের বিয়ে দিয়ে শ্রমিক নবী মূসা (আ)-কে জামাই বানিয়েছেন। হযরত মুহাম্মদ (সা) শ্রমিক যায়েদ (রা)-এর কাছে আপন ফুফাত বোন জয়নবকে বিয়ে দিয়েছিলেন। বিশ্বনবী (সা) যায়েদ (রা)-কে মুতারের যুদ্ধে প্রধান সেনাপতি হিসেবে নিয়োগ দিয়েছিলেন। ইসলামের প্রথম মোয়াজ্জিন বানানো হয়েছিল শ্রমিক হযরত বিলাল (রা)-কে। মক্কা বিজয় করে কাবাঘরে প্রথম প্রবেশের সময় মহানবী (সা) শ্রমিক বেলাল (রা) ও শ্রমিক খাব্বাব (রা)-কে সাথে রেখেছিলেন। নবীজি কখনো নিজ খাদেম আনাস (রা)-কে ধমক দেননি এবং কখনো কোনো প্রকার কটুবাক্য ও কৈফিয়ত তলব করেননি।

নবী করীম (সা)-এর কন্যা বিবি ফাতিমা (রা) নিজ হাতে যাঁতা ঘোরাতেন। আর এজন্য তার হাতে যাঁতা ঘোরানোর দাগ পড়েছিল। তিনি নিজেই পানির মশ্‌ক বয়ে আনতেন, এতে তার বুকে দড়ির দাগ পড়েছিল।

কোদাল চালাতে চালাতে একজন সাহাবির হাতে কালো দাগ পড়ে যায়। রাসূলুল্লাহ (সা) তার হাত দেখে বললেন, "তোমার হাতের মধ্যে কি কিছু লিখে রেখেছ? সাহাবি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (সা) এগুলো কালো দাগ ছাড়া আর

কিছুই নয়। আমি আমার পরিবার-পরিজনের ভরণ-পোষণের জন্য পাথুরে জমিতে কোদাল চালাতে গিয়ে হাতে এ কালো দাগগুলো পড়েছে। নবীজি (সা) এ কথা শুনে ওই সাহাবির হাতের মধ্যে আলতো করে গভীর মমতা ও মর্যাদার সাথে চুমু খেলেন। এভাবে অসংখ্য কর্ম ও ঘটনার মাধ্যমে হযরত মুহাম্মদ (সা) পৃথিবীতে শ্রমের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন।

ইসলামী আদর্শের কাছে মনিব-গোলাম, বড়-ছোট, আমীর-গরিব সবাই সমান। ইসলামী সমাজে রাষ্ট্রপ্রতি, প্রধানমন্ত্রী, সমাজপতি, শিল্পপতি, রাজনীতিবিদদের আলাদাভাবে মর্যাদার একক অধিকারী হওয়ার সুযোগ নেই। অধীনস্থরাও ইনসাফের দাবি করার অধিকার রাখেন।

একমাত্র ইসলামই শ্রমিকদের সর্বাধিক অধিকার ও সুযোগ-সুবিধার কথা স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছে। পৃথিবীর অন্য কোনো ধর্ম, মানব রচিত অন্য কোনো মতবাদ বা আদর্শ ইসলামের মতো শ্রমিকদের অধিকার দিতে পারে না। ইসলামের দাবি অনুযায়ী, গোলামের সাথে ভালো আচরণ করতে হবে এবং তাদের কোনো প্রকার কষ্ট দেয়া যাবে না।

রাসূল (সা) বলেছেন, "তোমাদের অধীন ব্যক্তিরা তোমাদের ভাই। আল্লাহ তাআলা যে ভাইকে তোমার অধীন করে দিয়েছেন তাকে তাই খেতে দাও, যা তুমি নিজে খাও, তাকে তাই পরিধান করতে দাও, যা তুমি নিজে পরিধান কর।" (বুখারী)

হযরত আবুবকর (রা) বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, 'ক্ষমতার বলে অধীন চাকর-চাকরানী বা দাস-দাসীর প্রতি মন্দ আচরণকারী বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না।" (ইবনে মাজাহ্) তিনি আরো বলেন, "কেউ তার অধীন ব্যক্তিকে

অন্যায়ভাবে এক দোররা মারলেও কিয়ামতের দিন তার থেকে এর বদলা নেয়া হবে।”

ইসলাম শ্রমিকদের অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে। শ্রমিককে কষ্ট দেয়াকে জাহেলিয়াতের যুগের মানসিকতা মনে করে। এ ব্যাপারে হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, নবী করিম (সা) বলেছেন, “তোমাদের কেউ যেন আমার দাস, আমার দাসী না বলে, কেননা আমরা সবাই আল্লাহর দাস-দাসী।” ওমর ইবনে হুরাইস (রা) হতে বর্ণিত, নবী করিম (সা) বলেছেন, “তোমরা তোমাদের কর্মচারীদের থেকে যতটা হালকা কাজ নেবে তোমাদের আমলনামায় ততটা পুরস্কার ও নেকি লেখা হবে।

শ্রমিকদের শ্রমের বিনিময়ে তিল তিল করে গড়ে ওঠে শিল্প প্রতিষ্ঠান। একটি শিল্পের মালিক শ্রমিকদের শ্রম শোষণ করে অল্পসময়েই পাহাড় পরিমাণ অর্থ-বিত্তের মালিক হয়। শ্রমিকদের কম মজুরি দিয়ে, তাদের ঠকিয়ে গড়ে তোলে একাধিক শিল্প-ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। কারখানায় তাদের কোন অংশীদারিত্ব থাকে না। এ ব্যাপারে মহানবী (সা) বলেছেন, “মজুরকে তার কাজ হতে অংশ দান কর, কারণ আল্লাহর মজুরকে বঞ্চিত করা যায় না।” (মুসনাদে আহমাদ)

আমাদের দেশে দেখা যায়, মাসের পর মাস চলে যায় শ্রমিকরা বেতন পান না। বেতনের দাবিতে শ্রমিকদেরকে মালিকের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে হয়। শ্রমজীবী মানুষ বা কোনো শ্রমিক অবসর নেবার পর তার বাকি জীবন চলার জন্য অর্থনৈতিক সুবিধা বা পেনশনের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। এ ব্যাপারেও ইসলাম নীরব নয়। হযরত ওমর (রা) বলেছেন, “যৌবনকালে যে ব্যক্তি শ্রম দিয়ে রাষ্ট্র ও জনগণের খেদমত করেছেন বৃদ্ধকালে সরকার তার হাতে ভিক্ষার ঝুলি তুলে দিতে পারে না।”

১৮৮৬ সালের ১ মে আমেরিকার শিকাগো শহরের হে মার্কেটে অধিকার বঞ্চিত শ্রমিকরা ৮ ঘণ্টা কাজসহ বিভিন্ন দাবিতে সংগঠিত হয়ে আন্দোলন শুরু করে। বিক্ষোভ সমাবেশে নিরীহ শ্রমিকদের ওপর গুলি চালায় পুলিশ। নিহত হয় অনেক শ্রমিক। শ্রমজীবী মানুষের আপসহীন মনোভাব ও আত্মত্যাগের ফলে মালিক পক্ষ শ্রমিকদের দাবি অনুযায়ী ৮ ঘণ্টা কাজের স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হন। আর তাই ১ মে শ্রমিক আন্দোলনের প্রতীকে পরিণত হয়।

বিশ্বনবীর অমিয় বাণী, “শ্রমিকের ঘাম শুকানোর আগেই তাদের প্রাপ্য মজুরি পরিশোধ কর।”

বাংলাদেশসহ বিশ্বেবাসী শ্রমিকের প্রাপ্য ও ইসলামের দেয়া শ্রমের মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসবেন এটাই প্রত্যাশা।♦

১৫ মে বিশ্ব পরিবার দিবস

পরিবারের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

শামস সাইদ

সভ্যতার ইতিহাসে পরিবার একটি প্রাচীন প্রতিষ্ঠান। এ কথাও বলা যায় মানুষের সভ্যতা গড়ে উঠেছে পরিবারের ওপর ভিত্তি করে। এজন্য পরিবারকে বলা হয় কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান। মানুষের সাথে অন্যান্য প্রাণীর পার্থক্য এখানেই যে, মানুষ পরিবার প্রথা লালন করে, অন্যান্য প্রাণী তা করে না। মানুষ ছাড়া অন্যান্য প্রাণীর মধ্যে স্বামী-স্ত্রী-পিতা-কন্যা-ভাই-বোন ইত্যাদি পরিচয় নেই। কিন্তু মানুষের আছে। ফলে যে মানুষ একসময় অন্যান্য প্রাণীর সাথে বনজঙ্গলে বাস করতো বলে জানা যায় সেই মানুষ পরিবার প্রথা অবলম্বনের মাধ্যমে ধীরে ধীরে বনজঙ্গল ছেড়ে সভ্যতা ও সংস্কৃতি নির্মাণ করেছে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিপুল আয়োজনে পৃথিবীকে সুন্দর করে তুলেছে। একটু চিন্তা করলেই একথার সত্যতা বোঝা যায়। মানুষ যখন পরিবার প্রথা চালু করে তখন প্রয়োজন হয় ব্যক্তিগত গোপনীয়তার। আত্মরক্ষার প্রয়োজন ছাড়াও ব্যক্তিগত পরিবেশ গড়ে তোলার

জন্য দরকার হয় একান্ত গৃহকোণ, নিজস্ব ঘর। তারপর প্রশ্ন আসে এটা 'আমার ঘর', ওটা 'তোমার ঘর'। এভাবে 'আমার ঘর', 'তোমার ঘর', আরও দশজনের ঘর মিলে তৈরি হয় একটা পাড়া। প্রত্যেকের ঘরের অধিকার রক্ষার জন্য প্রয়োজন হয় কিছু সামাজিক নিয়ম কানুনের যা সকলেই মেনে চলার অঙ্গীকার করে। 'আমি তোমার ঘরে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করব না, তুমি আমার ঘরে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করবে না।'- এভাবে তৈরি হয় সমাজ, রাষ্ট্র ও সভ্যতার আইন। ঘরোয়া জীবনকে আর একটু সুন্দর, মোহনীয় এবং সহজ করার জন্য শুরু হয় শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির চর্চা।

পরিবার হয়ে উঠে মানুষের কাছে আকর্ষণীয় একটি বিষয়। পরিবার গঠনের মাধ্যমেই মানুষ প্রথমবারের মতো বুঝতে পারে যে তার সামনে রয়েছে সভ্যতা নির্মাণের মতো এক মহৎ লক্ষ্য। পরিবার মানুষকে প্রদান করল সমষ্টিগত ভবিষ্যৎ নির্মাণের মহান লক্ষ্য আর এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে মানুষ হয়ে উঠল এক মহান প্রাণী যাঁরা অন্যান্য পশু-প্রাণী থেকে স্পষ্টভাবে আলাদা হয়ে পড়ল। বনজঙ্গল ছেড়ে সভ্যতার অধিকারী হয়েছে মানুষ। কারণ মানুষের আছে পরিবার কিন্তু পশুর তা নেই। তাই পরিবারকে বলা হয় সভ্যতার একক। সময়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এক প্রতিষ্ঠান। পরিবার প্রথা মানুষকে সৃষ্টির সেরা প্রাণী হিসেবে জগতের বুকে স্থান করে দিয়েছে। যুগে যুগে মানুষের কল্যাণ সাধন করে এসেছে। এর গুরুত্ব ও কাজের ক্ষেত্র আরও বেড়ে চলেছে। বর্তমান যুগে শিশুদেরকে সামাজিকভাবে বড় করে তোলার জন্য এবং বয়স্কদের মানসিক প্রশান্তির জন্য পরিবারের বিকল্প নেই। পরিবার একটি শিশুকে সামাজিক পরিচয় প্রদান করে। যে শিশুর বাবা-মা'র পরিচয় পাওয়া যায় না তার পক্ষে সমাজে প্রতিষ্ঠা পাওয়া কিংবা একটা ভালো অবস্থানে পৌঁছা আদৌ সম্ভব নয় তা সে যত মেধাবী আর পরিশ্রমীই হোক না কেন। তাই একটি নিষ্পাপ শিশুকে আত্মপরিচয়ের এই সংকট থেকে মুক্তি দিতে প্রয়োজন পারিবারিক পরিমন্ডল। আবার বৃদ্ধকালে একজন মানুষ যখন শারীরিকভাবে এবং আবেগগতভাবে অন্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে তখন তার শরীর-মনের খোরাক কেবলমাত্র পারিবারিক পরিমন্ডলেই খুঁজে পেতে পারেন। কোনো বয়স্ক ব্যক্তির যদি প্রচুর টাকাপয়সা থাকে তবে তিনি চাইলে অর্থের বিনিময়ে সেবা-যত্ন পেতে পারবেন কিন্তু সেই সেবা-যত্ন দ্বারা তার শরীরের ক্লান্তি দূর হলেও মনের ক্লান্তি বাড়বে ছাড়া কমবে না। কারণ কেনা সেবা-যত্নের সাথে আবেগ কিংবা ভালোবাসার সম্পর্ক থাকে না। পক্ষান্তরে তার যদি পরিবার থাকে সেখানে পুত্র-কন্যা-পুত্রবধূ এবং নাতি-নাতনীদের একটু সংস্পর্শ, একটু মিষ্টি কথা তার মনকে ভরিয়ে দিতে পারে।

পরিবার প্রথার মৌলিক রূপটি এক থাকলেও যুগে যুগে তার চেহারা বিভিন্ন দিকে গতিপ্রাপ্ত হয়েছে। বিভিন্ন সামাজিক-অর্থনৈতিক কাঠামোর সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে চলছে। যেমন বর্তমান যুগের ধারায় দেখা যাচ্ছে বড় পরিবারগুলি ভেঙে ছোট ছোট একক পরিবার তৈরি হচ্ছে আর নারীরা পূর্বের তুলনায় বর্তমানে বিপুল সংখ্যায় বাড়ির বাইরের কর্মজগতের সঙ্গে যুক্ত হতে পারছে। পরিবার গঠনের মাধ্যমে একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রী প্রকাশ্য ঘোষণার মাধ্যমে ও সামাজিক স্বীকৃতির মাধ্যমে পরস্পরের প্রতি বিশ্বস্ত থাকার ও কিছু নিয়ন্ত্রিত আচরণ মেনে চলার অঙ্গীকার করে। এটা হচ্ছে পরিবারের মৌলিক রূপ। কিন্তু পরিবারে স্বামী-স্ত্রী হিসেবে বসবাসরত দুজন নারী-পুরুষের দায়দায়িত্ব ও অধিকারের ক্ষেত্রটি বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক-অর্থনৈতিক টানাপড়েনের দ্বারা বিভিন্ন রূপ ধারণ করেছে। যেমন সামন্ত যুগে বা জমিদারী যুগে স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীরাও বাড়ীর বাইরে কৃষি জমিতে কাজ করতে অভ্যস্ত ছিল। কারণ, জমিদারী যুগে সাধারণ মানুষ কোনো জমির মালিক হতে পারত না। একজন সাধারণ মানুষের যত অর্থ সম্পদই থাকুক না কেন তিনি কোনো ভূমির মালিক হতে পারতেন না। কারণ তখন জমি বিক্রয়ের বা ব্যক্তি মালিকানায় ভূমি প্রদানের কোনো নিয়ম ছিল না। লোকেরা বার্ষিক খাজনার ভিত্তিতে ভূস্বামী বা জমিদারের নিকট থেকে জমি ভোগের অধিকার পেত কিন্তু জমির মালিক হতে পারত না। তা ছাড়া সে সময়ে টাকার প্রচলন এখনকার মতো এত বেশি ছিল না। সাধারণ জনগণের হাতে নগদ টাকা খুব কমই থাকত। লোকেরা জমিতে উৎপাদিত ফসলের দ্বারা জমিদারের খাজনা পরিশোধ করত। ফলে জমিতে যাঁরা যত বেশি ফসল উৎপাদন করতে পারত তারা জমিদারকে তত বেশি খাজনা দিতে পারত আর পরবর্তীতে তারা তত বেশি জমি ভোগের অধিকার পেত। এভাবে সে যুগে মানুষের প্রধান লক্ষ্যই ছিল জমিতে বেশি বেশি ফসল উৎপাদন করা। আর সেই ফসল উৎপাদনে প্রযুক্তিগত সুবিধার চেয়ে শারীরিক শ্রমই ছিল প্রধান। তাই বেশি বেশি ফসল উৎপাদনের লক্ষ্যে প্রত্যেক পরিবারের সদস্যরা সকলে মিলে অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রী-সন্তানাদি মিলে মাঠের কাজে লেগে পড়ত। এভাবে সামন্ত যুগে বা জমিদারী যুগে স্বামীদের সাথে স্ত্রীরাও বাড়ির বাইরে মাঠের কাজে কঠোর পরিশ্রম করত।

তারপর এলো শিল্পযুগ। এ সময়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির কল্যাণে হঠাৎ করেই কলকারখানার ব্যাপক বিস্তার ঘটল। শারীরিক শ্রমের বদলে পাওয়ার-ইঞ্জিন দ্বারা কলকারখানার চাকা ঘুরতে লাগলো। উৎপাদনের গতি বাড়ল। কারখানা মালিকের লাভ বাড়ল। অপরদিকে লাখ লাখ মানুষ কাজ হারিয়ে বেকার হয়ে পড়ল। আগে

যেখানে ১০০ টা তাঁতের কলে ১০০ জন তাঁতী শারীরিক শ্রম ব্যবহার করে কাপড় উৎপাদন করত। শিল্পযুগে এসে সেখানে ১ টা মেশিনেই ১০০ টা তাঁতের কাজ হতে লাগল। ১০০ জন তাঁতী বেকার হয়ে পড়ল। আর তাদের মধ্যে ১ জন হয়তো শিল্প কারখানার বেতনভোগী শ্রমিক হিসেবে চাকরি পেল। পক্ষান্তরে শতকরা ৯৯ জন লোক হয়ে পড়ল বেকার। যেখানে শতকরা ৯৯ জন লোক উৎপাদনমুখী কাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বেকার হয়ে পড়ল সেখানে নারীদের বাড়ির বাইরের উৎপাদনমূলক কাজে জড়িত হওয়ার মোটেই কোনো সুযোগ থাকলো না। ফলে শিল্পযুগে নারীরা পুনরায় ঘরের কাজে আবদ্ধ হয়ে পড়ল। এ অবস্থা চলতে লাগলো বিশ্বযুদ্ধ শুরুর পূর্ব পর্যন্ত। অতঃপর অল্প সময়ের ব্যবধানে দু'টি বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হলো। বিশ্বের প্রধান দেশগুলি দুই শিবিরে ভাগ হয়ে যুদ্ধে উন্মত্ত হয়ে উঠল। ছোট ছোট দেশগুলি কোনো না কোনোভাবে এই দুই দলের এক দলে যোগ দিতে বাধ্য হলো। কেউ কেউ নামে মাত্র নিরপেক্ষ থাকতে চেষ্টা করলেও প্রকৃতপক্ষে সমস্ত বিশ্বই যেন দুভাগ হয়ে যুদ্ধে মেতে উঠেছিল। যদিও সভ্যতার ইতিহাসে দুটি বিশ্বযুদ্ধের স্থিতিকাল অল্পই ছিল কিন্তু ঘটনা হিসেবে তা ছিল যুগান্তকারী। যুদ্ধ-পূর্ববর্তী যুগ থেকে যুদ্ধ-পরবর্তী যুগের মানুষের ধ্যান-ধারণা, চিন্তাচেতনা, মূল্যবোধ ও আচার আচরণ সম্পূর্ণ বদলে গেল। কোনো কোনো ক্ষেত্রে হয়ে গেল সম্পূর্ণ বিপরীত। বিশ্বযুদ্ধের মতো জঘন্য ঘটনাটির মাধ্যমে প্রমাণ হয়ে গেল যে, ক্ষমতা ও স্বার্থের লোভে মানুষ কতটা নিষ্ঠুর ও অবিবেচক হতে পারে। কতটা অবলীলায় বিপুল ধ্বংসযজ্ঞ চালাতে পারে। কতটা নিপুণ-নিষ্কম্প হাতে মানববিধ্বংসী অস্ত্র নিক্ষেপ করতে পারে। যুদ্ধপূর্ব যুগে সদ্‌গুণ সম্পন্ন প্রাণী হিসেবে মানুষের যে পরিচয় ছিল বিশ্বযুদ্ধের মাধ্যমে সে পরিচয় ধূলিসাৎ হয়ে গেল। মানুষে মানুষে ভালোবাসা এবং মানব মনের কোমল দিক সম্পর্কে যে আস্থা ছিল তা ভেঙে গেল। যুদ্ধ-পরবর্তী যুগে মানুষে মানুষে সন্দেহ আর অবিশ্বাসই যেন সত্য হয়ে দেখা দিল। আর দশটা প্রাণীর মতো মানুষের মধ্যেও হিংসা, ঘৃণা, লোভ, ক্রোধ আছে তা স্পষ্টভাবে স্বীকার করে নেয়া হল। সাহিত্যের ভাষায় এ ঘটনাকে বলা হয় Disillusionment বা 'মোহভঙ্গ'। মানুষের ভালো গুণাবলী সম্পর্কে যে অবাস্তব কল্পনা বা 'মোহ' ছিল তা যেন ভেঙে গেল। পুরাতন আদর্শবাদী মূল্যবোধগুলি ভেঙে নতুন আধুনিক বাস্তববাদী মূল্যবোধ গঠিত হতে লাগলো। নতুন এই মূল্যবোধ ছিল মধ্যপন্থী এবং জীবনঘনিষ্ঠ। নতুন এই মূল্যবোধের বিচারে দেখা গেল মানুষ যেমন সর্বগুণের আঁধার কোনো স্বর্গীয় প্রাণী নয়, তেমনি মানুষ আবার পশুও নয়। মানুষ যদি সর্বগুণের আঁধার স্বর্গীয় প্রাণী হতো তবে পরপর দুটি মানবধ্বংসী বিশ্বযুদ্ধ

সংঘটিত হতো না। আবার সে যদি আর দশটা পশুর মতো একটা পশু হতো তবে সভ্যতার ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত সেই ভয়ংকর বিশ্বযুদ্ধ থামত না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মানুষের বিবেক জাগ্রত হয়েছে। যুদ্ধাক্রান্ত মানুষের কান্না, আহাজারি আর সভ্যতার অনিশ্চিত ভাবিষ্যত ভেবে মানুষ যুদ্ধ ছেড়ে আবার শান্তির পক্ষে অবস্থান নিয়েছে। বিশ্বে শান্তি পুনঃস্থাপিত হয়েছে। গঠিত হয়েছে বিশ্বের রাষ্ট্রগুলির সম্মেলন কেন্দ্র জাতিসংঘ। গৃহীত হয়েছে আলোচনার মাধ্যমে সজ্ঘাত নিরসনের নীতি। তাই যুদ্ধ পরবর্তী যুগে এসে বলা হল মানুষ স্বর্গীয় প্রাণীও নয় আবার সে একেবারে পশুও নয়। মানুষ মানুষই। এভাবে শুধু জগতে মানুষের অবস্থান সম্পর্কেই নয়, নারীর অধিকার সম্পর্কে, নারী-পুরুষ বৈষম্য সম্পর্কে, পরিবারে উভয়ের দায়দায়িত্ব সম্পর্কে পুরাতন মূল্যবোধ ভেঙে নতুন আধুনিক জীবনঘনিষ্ঠ মূল্যবোধ গঠিত হতে লাগলো। সেই নতুন মূল্যবোধের নিরীখেই প্রশ্ন দেখা দিল নারীরা কেন অফিস আদলত-কলকারখানা-ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি ক্ষেত্রে পুরুষের সমান অধিকার পাবে না। এ প্রশ্নের জবাবে সকলেই যেন একটা উদার দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করল। ফল হিসেবে যুদ্ধপরবর্তী যুগে অফিস-আদলত-ব্যবসা-বাণিজ্যসহ বাইরের কর্মজগতের সর্বত্র পুরুষের পাশাপাশি নারীর সদর্প উপস্থিতিকে মেনে নেওয়া হল। এভাবে যুদ্ধপরবর্তী যুগে নারীরা বাইরের কর্মগজতে তাদের মেধা ও যোগ্যতার সাক্ষর রাখতে লাগলো। কর্মজীবী নারীরা তাদের অর্থনৈতিক ক্ষমতার প্রভাবে পরিবারে আরও জোরালো ভূমিকা রাখতে লাগলো। পুরুষের পাশাপাশি সকল কর্মে নারীর যোগ্যতাও প্রমাণ হলো। ফলে ‘পুরুষের কাজ’ আর ‘স্ত্রীলোকের কাজ’ বলে কোনো ভেদাভেদ থাকলো না। পরিবারে ‘স্বামীর কাজ’ আর ‘স্ত্রীর কাজ’ বলে দু’ধরনের কাজের সীমারেখা থাকলো না। সময়, সুযোগ, সুবিধা সর্বোপরি পরিবারের কল্যাণের প্রয়োজনে সংসারের সব ধরনের কাজ উভয়ে মিলেই করতে লাগল। আধুনিক যুগে পরিবর্তনশীল পারিবারিক গতিধারার আর একটি লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য হল বড় পরিবার ভেঙে যাওয়া। শিল্পায়ন ও নগরায়নের ফলে এটা হচ্ছে বলে মনে হয়। কোনো একটি স্থানে একটি নতুন শিল্প কারখানা স্থাপন হলে সেই কারখানায় দূর-দূরান্ত থেকে শ্রমিক-কর্মচারীরা কাজ করতে আসবে। একসময় তারা চাইবে তাদের দূরবর্তী যৌথ পরিবার ছেড়ে কারখানার নিকটস্থ এলাকায় এসে শুধু নিজের স্ত্রী-সন্তান নিয়ে একক পরিবার গড়তে। আবার নগরায়নের ফলে একটি পশ্চাদপদ জায়গায় নতুন নতুন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। ঐসব ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিক ও কর্মচারীরা সকলেই একইভাবে যৌথ পরিবার ভেঙে একক পরিবার গড়ে তুলবে।

এ ছাড়াও পারিবারিক জীবনে ধস নেমে আসে খ্রিস্ট ধর্মের প্রভাবে। খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতাব্দী ছিল ধর্মের ইতিহাসে এক যুগসন্ধিক্ষণ। চতুর্থ শতাব্দীর শেষ ভাগে খ্রিস্ট ধর্মে বৈরাগ্যবাদ ব্যাপক আকার ধারণ করে। সেই যুগে বৈরাগ্যবাদ হয়ে দাঁড়ায় এক সাধারণ ব্যাপার। তখন বহু বিজ্ঞজনও সমাজকে বিদায় জানিয়ে সংসার ত্যাগী সাজে। মায়া-মমতার বন্ধন ছিন্ন করাই ছিল বৈরাগ্যবাদের মূল কথা। অসংখ্য সংসারত্যাগী মানুষ তাদের বাবা-মা, স্ত্রী এবং ছেলে মেয়েদেরকে অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলে দেয়। তারা মনে করত পরিবারের প্রতি কর্তব্য পালন করতে গেলে তাদের মনের একাগ্রতা নষ্ট হবে। কিন্তু ইসলাম পরিবার বিচ্ছিন্ন বৈরাগ্য জীবনের অনুমতি দেয় না। কুরআন-হাদিস এমন জীবনকে গর্হিত মনে করে। কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে, ‘আর যে রাহবানিয়াতকে (খ্রিস্টানরা) তাদের দীনের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছে, তাকে আমি তাদের ওপর ফরজ করিনি’ (হাদিস)। রাসূল (সা) বলেন, ‘ইসলামে বৈরাগ্যবাদ নেই’। নবী করীম (সা) পারিবারিক জীবনের উপরে ভীষণ গুরুত্ব প্রদান করেছেন, যা আমাদের অনুসরণযোগ্য। রাসূল (সা) একবার তার মেয়ে ফাতেমা (রা), তার স্বামী হযরত আলী (রা) ও হাসান হোসাইনকে এক চাদরের নিচে রেখে আল্লাহর নিকট দোয়া করলেন যে, হে আল্লাহ! এরা তো আমার আহলে বাইত (অর্থাৎ পরিবারভুক্ত সদস্য)।

রাসূল (সা) বিয়েকে ঈমানের অর্ধেক গণ্য করে বলেন, ‘যখন কোনো বান্দা বিয়ে করে তখন সে অর্ধেক দ্বীন পূর্ণ করে। কাজেই অবশিষ্ট অর্ধেকের ব্যাপারে

সে আল্লাহকে ভয় করুক।' তিনি আরো বলেন, 'বিয়ে করা আমার সুন্নাত। সুতরাং যে আমার সুন্নাত বর্জন করবে সে আমার দলভুক্ত নয়।' এ থেকে বুঝা যায়, পরিবার গঠনে ইসলামের গুরুত্ব কতটুকু। বিয়ের মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য লাভ ও আর্থিক সচ্ছলতা বৃদ্ধি পায়। রাসূল (সা) বলেছেন, 'তিন ব্যক্তির সাহায্য করা আল্লাহর কর্তব্য হয়ে পড়ে। তার মধ্যে একজন হলো– 'যে লোক বিয়ে করে চারিত্রিক নিষ্কলুষতা রক্ষা করতে চায়।'

অভিজাত এলাকাগুলোর কোনো কোনো পিতা-মাতা যুবক-যুবতী সন্তানদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ, তারা যেন সন্তানের নিকট এক ধরনের জিম্মি হয়ে আছেন। ঘরে ঘরে অশান্তির আগুন জ্বলছে। প্রকৃতপক্ষে, আমরা প্রত্যেকেই কারো না কারো ওপর দায়িত্বশীল। স্ব-স্ব দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করলে সমাজে এত সমস্যা হওয়ার কথা নয়। রাসূল (সা) বলেছেন, 'সাবধান! তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যেকেই যার যার অধীনস্থ লোকজন সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে'। তাই স্বামী-স্ত্রী পারস্পরিক পরামর্শ করে কুরআন-হাদিসের আলোকে সন্তানদের গাইড করা উচিত। আল্লাহভীতি, পরকালীন জবাবদিহিতা মুসলমানদের দায়িত্ব-কর্তব্য, আল্লাহর হক, বান্দার হক, পারস্পরিক সহমর্মিতা শিখানোর পাশাপাশি সন্তানদের পর্যাপ্ত সময় দেয়া দরকার। সন্তানের সাথে গ্যাপ সৃষ্টি করা ঠিক নয়। অতিরিক্ত স্নেহ, মাত্রাতিরিক্ত বকাঝকা, মান-অভিমান না করে সন্তান কোথায় যায়, কাদের সাথে মেলামেশা করে অর্থাৎ বন্ধু সার্কেল কেমন তার খোঁজখবর রাখা। ইদানীং বন্ধুরাই বেশি ক্ষতি করে থাকে, এর ভূরি ভূরি নজির রয়েছে। পোশাক-আশাক, চিন্তা-চেতনায় যেন ইসলামী সংস্কৃতি-ঐতিহ্যের ধারক বাহক হয় সে বিষয়ে সবিশেষ লক্ষ্য রাখা প্রত্যেক মুসলিম পিতা-মাতার অবশ্য কর্তব্য। সন্তানের জীবন গঠনের কোনো পর্যায়ে বাবা-মায়ের দায়িত্বে অবহেলার কারণে যদি সে পথচ্যুত হয়ে যায় তা হলে দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতেই মা-বাবাকে তার দায়িত্ব বহন করতে হবে।

উন্নয়নশীল দেশগুলির আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে যৌথ পরিবার ভেঙে যাচ্ছে। আত্মীয়তার বন্ধন কমে যাচ্ছে। উন্নত বিশ্বে বিবাহ বিচ্ছেদের হার বাড়ছে। অবশ্য বিবাহ বিচ্ছেদের হার বাড়ার অর্থ পরিবার প্রথা উঠে যাচ্ছে তা নয়। এর অর্থ পরিবারের স্থিতিশীলতা কমে যাচ্ছে। বিবাহ বন্ধন দীর্ঘস্থায়ী হচ্ছে না। এক পরিবারের বিচ্ছেদ ঘটিয়ে স্বামী/স্ত্রী পুনরায় অন্যত্র বিবাহের মাধ্যমে নতুন পরিবার গঠন করছে। বলা যায় বর্তমানে উন্নত বিশ্বে পরিবার প্রথা একটি অস্থিতিশীল অবস্থার মধ্য দিয়ে চলছে। অন্যদিকে ইউরোপ আমেরিকার মতো অতি উন্নত পশ্চিমা দেশগুলিতে বিবাহ প্রায়ই ভেঙে যায়। সেসব দেশে নারী এবং পুরুষ উভয়ের সমান অর্থনৈতিক ক্ষমতা, উভয়ের স্বাধীনচেতা মনোভাব এবং ব্যক্তিত্বের সংঘাতকেই এর কারণ হিসেবে মনে করা হয়। সেসব দেশে এমন ঘটনার কথাও শোনা যায় যে, বিছানার চাদরের রঙ কেমন হবে তা নিয়ে উভয়ে একমত না হতে পারায় বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে যায়। শিক্ষাদীক্ষায়, অর্থনৈতিক ক্ষমতায় সমান স্বামী এবং স্ত্রীর মাঝে সামান্য বিষয়ে পছন্দ ও রুচিবোধের অমিল হলেই ব্যক্তিত্বের সঙ্ঘাত বেঁধে যায়। পশ্চিমা দেশের এসব ভাঙ্গনমুখর পরিবারের সন্তানেরা প্রচণ্ড মানসিক সমস্যার মধ্যে পড়ে।

বাবা-মা'কে সন্তানের সঙ্গে বন্ধুত্বসুলভ আচরণ করতে হবে। তাহলে সন্তান সবকিছুই বাবা-মা'র সঙ্গে শেয়ার করবে। যে সন্তান শেয়ার করতে শিখবে সে কখনও আদর্শহীন হবে না। ঘরের পরিবেশ ভালো বলেই যে সন্তান সভ্য-ভদ্র ও আদর্শবান হবে তা ঠিক নয়। সন্তান কাদের সঙ্গে মেশে, বন্ধুত্ব করে সেদিকেও দৃষ্টি রাখতে হবে। শিক্ষিত হওয়ার জন্য যেমন একাডেমিক শিক্ষার প্রয়োজন, তেমনি সন্তানকে সুস্থ মানসিকতার ধারক-বাহক করার জন্য সভ্যতা-ভদ্রতা-নৈতিকতা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার মতো মননের অধিকারী করে গড়ে তুলতে হবে। মোদ্দাকথা, বিচক্ষণ বাবা-মা বা অভিভাবকদের সন্তানরাই সমাজে আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠে।♦

১১৮৫ সালের দিকে আঁকা সালাহউদ্দিনের ছবি Ismail al-Jazari

সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবী ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে ইসলামের মহাবীর

আব্দুল্লাহ ইবনে মাহমুদ

মিসর আর সিরিয়ার প্রথম সুলতান সালাহউদ্দিনকে পশ্চিমা বিশ্ব চেনে সালাদিন (Saladin) নামে। আইয়ুবী রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা সালাহউদ্দিন ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে চালিয়েছিলেন নানা সেনা অভিযান। তার সালতানাতের অধীনে ছিল মিসর, সিরিয়া, উত্তর ইরাক, হেজাজ, ইয়েমেন ও উত্তর আফ্রিকার কিছু অংশ– এতই বিশাল ছিল তার প্রতিপত্তি। শুধু মুসলিম ইতিহাস নয়, শত্রুর কাছেও তিনি ছিলেন সম্মানিত এক বীর। যারা বীর সালাদিন সম্পর্কে নামটি

কেবল শুনেছেন, কিংবা কিংডম অফ হেভেন দেখা পর্যন্তই যাদের জ্ঞানসীমা, তাদের জন্যই আজকের এ লেখা; চলুন জেনে নেয়া যাক সুলতান সালাহউদ্দিনের জীবনের নানা দিক।

১১৩৭ সালে ইরাকের বর্তমান তিকরিত এলাকায় তার জন্ম, নাম ছিল আসলে ইউসুফ। তার সম্মানসূচক উপাধি ছিল সালাহ-আদ-দ্বীন যার মানে 'ধর্মের ন্যায়তা/পুণ্য (Righteousness)'। কুর্দি পরিবার থেকে তিনি এসেছিলেন, আদি নিবাস মধ্যযুগীয় আর্মেনিয়ার প্রাচীন দ্বীন (Dvin) শহরে। যে রাওয়াদিয়া (Rawadiya) গোত্র থেকে তিনি এসেছিলেন সেটা ততদিনে আরবিভাষীদের সাথে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে।

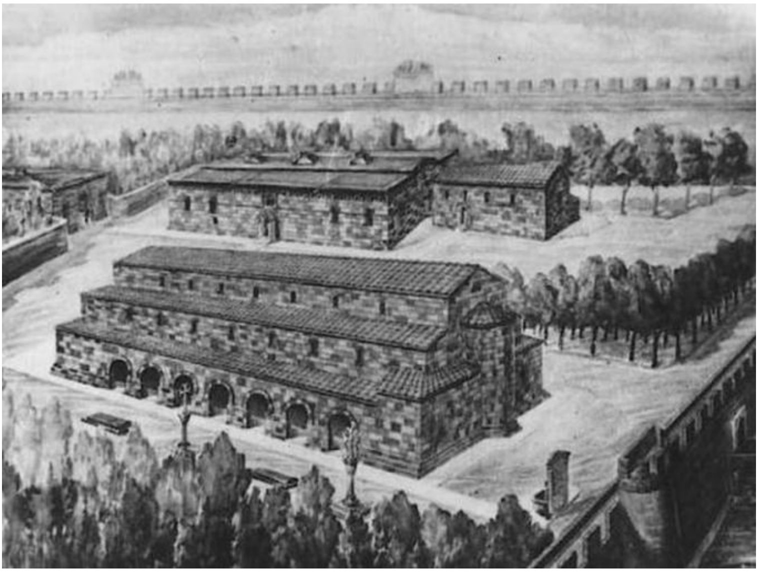

প্রাচীন দ্বীন শহর

তার জন্মের পাঁচ বছর আগে, মসুলের শাসক ইমাদুদ্দিন জাঙ্কি এক যুদ্ধে পালিয়ে যাবার সময় টাইগ্রিস নদীর দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হন, তখন নদীর উল্টো পাশে তিকরিত দুর্গের রক্ষক ছিলেন সালাহউদ্দিনের বাবা নাজমুদ্দিন আইয়ুব। আইয়ুব তখন ইমাদুদ্দিনের জন্য ফেরির ব্যবস্থা করেন ও তাকে তিকরিতে আশ্রয় দেন।

তাকে আশ্রয় দেবার অপরাধে ১১৩৭ সালে (যে বছর সালাদিনের জন্ম) আইয়ুব পরিবারকে উত্তর মেসোপটিমিয়ার মিলিটারি গ্রিক গভর্নর বহিষ্কার করেন। যে রাতে তারা তিকরিত ছেড়ে চলে যাচ্ছিলেন সে রাতেই জন্ম হয় আমাদের গল্পের নায়ক ইউসুফের, যাকে বিশ্ব পরে চিনবে সালাহউদ্দিন নামে।

তবে উপকারের প্রতিদান পেলেন আইয়ুব, ইমাদুদ্দিন জাঙ্কি তার পরিবারকে মসুলে জায়গা করে দিলেন, এবং তাকে বালবেক (Baalbek) দুর্গের কমান্ডার বানিয়ে দিলেন। তবে ইমাদুদ্দিন মারা যান ১১৪৬ সালে, তার ছেলে নুরুদ্দীন তার জায়গা নেন এরপর।

ততদিনে সালাহুদ্দিন বাস করতে শুরু করেছেন দামেস্কে। তার ছোটবেলার খুব একটা কথা জানা যায় না, তবে দামেস্ক শহরটাকে বেশ ভালোবাসতেন তিনি। সালাহউদ্দিন ইউক্লিড জ্যামিতি, গণিত থেকে শুরু করে আইনও শিখে ফেলেন। কুরআন শিক্ষাও সেরে ফেলেন তখন, আর সাথে সাথে ধর্মতত্ত্ব। সেনাবাহিনীতে যোগ দেয়ার চাইতে ধর্মকর্ম নিয়ে লেখাপড়া করার ইচ্ছা বেশি ছিল তার। কিন্তু ধর্ম ছাড়াও তিনি ইতিহাসের পণ্ডিতও হয়ে যাচ্ছিলেন। আরব ইতিহাস তো জানতেনই, এমনকি আরবি ঘোড়ার বংশ-ইতিহাসও তিনি বাদ দেননি পড়তে। তিনি কুর্দি ও আরবি ভাষায় পারদর্শী ছিলেন।

আক্রা দুর্গ

নুরুদ্দীনের অধীনের একজন মিলিটারি কমান্ডার ছিলেন আসাদ আল দীন। তিনিই সালাহউদ্দিনের সামরিক ক্যারিয়ার শুরু করিয়ে দেন। তার প্রথম সামরিক অভিযান ছিল ২৬ বছর বয়সে। নুরুদ্দীন আসাদকে পাঠান ফাতিমী খলিফা আল-আদিদ এর উজির শাওয়ারকে সাহায্য করবার জন্য যিনি ছিলেন মিসর থেকে বিতাড়িত। সে অভিযানে সঙ্গে করে নিয়ে যান আসাদ সালাহউদ্দিনকে। মিশনটি সার্থক হয়েছিল।

ঠিক এরপরই যুদ্ধ লেগে যায় ক্রুসেডার-মিসরীয় যুক্তবাহিনীর সাথে। যুদ্ধের জায়গাটা ছিল গিজার পশ্চিমে, নীল নদের পাড়ে। সে যুদ্ধে সালাহউদ্দিন নুরুদ্দীনের বাহিনীর ডান পাশের নেতৃত্ব দেন। বলা হয়, সালাহউদ্দিনের বুদ্ধিতে প্রথমে বাহিনী হেরে যাবার ভান করে প্রস্থান করে এবং এরপর অতর্কিতে আক্রমণ করে বিজয় ছিনিয়ে আনে। এ বিজয়কে ইবনে আল-আছিরের মতে 'ইতিহাসের অন্যতম সেরা বিজয়' বলা হয়। এরপর সালাহউদ্দিন তার বাহিনীর অংশ নিয়ে আলেক্সান্দ্রিয়া শহরে চলে যান, এবং সে শহরের পাহারা দিতে থাকেন।

একটু আগে বলা ফাতিমী খলিফা আল-আদিদের উজির শাওয়ারের সাথে ক্ষমতা নিয়ে দ্বন্দ্ব চলছিল আসাদের, ওদিকে জেরুজালেম রাজ্যের অ্যামালরিক দ্য ফাস্ট্রের সাথেও। শাওয়ার সাহায্য চাইলেন অ্যামালরিকের। কিন্তু **১১৬৯** সালে শাওয়ার নিহত হন গুপ্তঘাতকের হাতে, বলা হয় সেটি সালাহউদ্দিনের কাজই ছিল। সে বছর আসাদও মারা যান। তখন নুরুদ্দীন আসাদের একজন স্থলাভিষিক্তকে বাছাই করলেও, উজির হিসেবে খলিফা আল-আদিদ সালাহউদ্দিনকেই নিয়োগ দিলেন ২৬ মার্চ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আল আদিদ একজন শিয়া খলিফা ছিলেন, তাই উজির হিসেবে সুন্নি সালাহউদ্দিনকে বাছাই করাটা অবাক করা ছিল।

তবে আনুগত্য খলিফা আল-আদিদের দিকে দেবেন বেশি নাকি নুরুদ্দীনের দিকে, সেটা নিয়ে মনঃদ্বন্দ্বে ছিলেন তিনি। সে বছর, একদল মিসরীয় সেনা আর আমিরের ষড়যন্ত্রে গুপ্তহত্যার মুখে পড়েন সালাহউদ্দিন, কিন্তু গোপন সূত্রে তিনি আগেই খবর পেয়ে গিয়েছিলেন। হোতা ছিল ফাতিমী প্রাসাদের সিভিলিয়ান কন্ট্রোলার। তাকে গ্রেফতার করে হত্যা করেন সালাহউদ্দিন। পরদিন ফাতিমী বাহিনীর পঞ্চাশ হাজার কৃষ্ণবর্ণী সেনা বিরোধিতা করে সালাহউদ্দিনের। এ বিদ্রোহ দমন করতে করতে ২৩ আগস্ট চলে আসে। এরপর থেকে আর কখনো কায়রোর বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়নি সালাহউদ্দিনকে।

১১৬৯ সালে নুরুদ্দীনের সহায়তায় বিশাল এক ক্রুসেডার আর্মিকে পরাজিত করেন সালাহউদ্দিন। ততদিনে কিন্তু আব্বাসীয় সুন্নি খলিফা আল মুস্তানজিদের সাথে ফাতিমী শিয়া খলিফা আল-আদিদের দ্বৈরথ তুঙ্গে। সালাহউদ্দিন তখন মিসরে নিজের ঘাঁটি শক্ত করছেন। নিজের আত্মীয়দের উচ্চপদ দিলেন তিনি। মালিকি ও নিজের শাফিই মাজহাবের জন্য কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন সালাহউদ্দিন তার শহরে।

মিসরে পাকাপোক্ত হবার পর ১১৭০ সালে দারুম অধিকার করে নিয়ে ক্রুসেডারদের পরাজিত করেন সালাহউদ্দিন সেখানে। গাজা থেকে তখন জেরুজালেমের শাসক অ্যামালরিক নাইটস টেম্পলারদের গ্যারিসন বের করে আনেন ও দারুমের পতন রোধ করতে আসেন। কিন্তু সালাহউদ্দিন তাদের উপেক্ষা করে গাজায় গিয়ে শহরটি অধিকার করে নেন তখন।

সালাহউদ্দিনের ভাস্কর্য
কায়রো যাদুঘর

দামেস্ক শহরে সালাহউদ্দিনের ভাস্কর্য

১১৭১ সালে নুরুদ্দীনের চিঠি পেলেন সালাহউদ্দিন, তিনি যেন মিসরে আব্বাসীয় খেলাফত প্রতিষ্ঠা করেন। শহরের শাফিঈ মাজহাবের আলেম নাজমুদ্দিন আল খাবুশানি প্রচণ্ড শিয়া বিরোধী ছিলেন, তিনিও সায় দিলেন। মিসরের কয়েকজন আমিরকে হত্যা করা হলো, তবে শিয়া খলিফা আল-আদিদকে বলা হয়েছিল যে, তাদের হত্যা করবার কারণ আসলে খলিফার বিরোধিতা করা। এরপর আল-আদিদ অসুস্থ হয়ে পড়েন, তাকে বিষ দেয়া হয়েছিল, কিন্তু কে দিয়েছিল তা জানা যায় না। অসুস্থ আল-আদিদ সালাহউদ্দিনকে অনুরোধ করেন তার শিশুদের যেন দেখে রাখেন। কিন্তু সালাহউদ্দিন না করে দেন, পাছে আব্বাসীয়রা তাকে বিশ্বাসঘাতকতার জন্য দায়ী করে। কিন্তু পরে তিনি তার নিজের এ কথার জন্য অনুতপ্ত হয়েছিলেন। ১৩ সেপ্টেম্বর মারা যান আল-আদিদ, পাঁচ দিন পর আব্বাসীয় খুতবা ঘোষিত হলো কায়রোতে, খলিফা হলেন আল-মুস্তাদি। তিনি ছিলেন সুন্নি আব্বাসীয় খলিফা।

লোহিত সাগরের তীরে আকাবার মন্ট্রিল দুর্গ আর কারাক শহর আক্রমণের জন্য সামরিক অভিযানের উদ্দেশ্যে সে বছরের ২৫ সেপ্টেম্বর মিসর ত্যাগ করলেন; সিরিয়া থেকে যোগ দিলেন নুরুদ্দীন। কিন্তু ফাতিমী ও ক্রুসেডারদের

ষড়যন্ত্র নিয়ে খবর শুনতেই সালাহউদ্দিন ফিরে এলেন কায়রোতে। নুরুদ্দীন একাই গেলেন।

সালাহউদ্দিনের সবগুলো অভিযান বর্ণনা করে শেষ করা সম্ভব না এ সংক্ষিপ্ত লেখায়, তাই মূল ঘটনাগুলোই উল্লেখ করা হবে। ১১৭৪ সালের গ্রীষ্মে, নুরুদ্দীন বিশাল এক বাহিনী যোগাড় করছিলেন। কোনো এক কারণে (হয়ত নুরুদ্দীনের ক্রমঃক্রমঃ অর্থ ও সাপ্লাই চাওয়ার প্রতিউত্তর না দেয়ায়), আইয়ুবীরা ভাবতে লাগলো এ বাহিনী কি তবে কায়রো আক্রমণের জন্য? সালাহউদ্দিনকে কি হুমকি ভাবছেন নুরুদ্দীন? কিন্তু ১৫ মে, নুরুদ্দীন অসুস্থ অবস্থায় মারা যান হঠাৎ। ক্ষমতা চলে যায় তার পুত্র সালিহ ইসমাইল (as-Salih Ismail al-Malik) এর কাছে, বয়স তার মাত্র ১১।

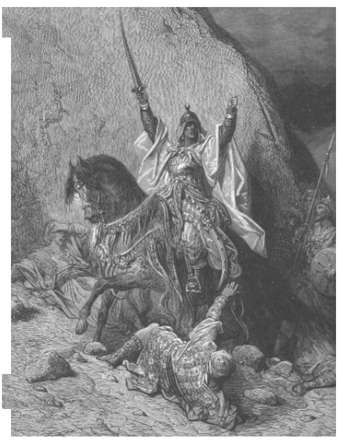

উনবিংশ শতকে আঁকা সালাহউদ্দিন

১১৯০ সালের দিকের সালাদিনের মুদ্রা

সালাহউদ্দিনের সামনে তখন কয়েকটি অপশন। তিনি নিজেই কি ক্রুসেডারদের আক্রমণ করে বসবেন? নাকি ১১ বছরের বালকের কথার আশায় বসে থাকবেন? আচ্ছা, তিনি কি নিজেই সিরিয়া অধিকার করে নিতে পারেন না, এ বালক তো কিছু করবে না, দুনিয়ার হালহাকিকত বুঝে উঠবার বয়সই হয়নি তার এখনো– না এটা করলে মানুষ তাকে মুনাফিক ভাববে, নিজের আগের প্রভুর রাজত্ব আক্রমণ কেউ ভালো চোখে দেখবে না। ক্রুসেডের নেতৃত্ব দেবার অধিকার তখন হারাবেন সালাহউদ্দিন।

আগস্টে সালিহ ইসমাইলের অভিভাবক হিসেবে দায়িত্ব নিলেন আলেপ্পোর আমির ও ক্যাপ্টেন গুমুশ্তিগিন। তিনি তখন প্রতিদ্বন্দ্বীদের সরানোর অঙ্গীকার

নিলেন, শুরুটা হবে দামেস্ক (সিরিয়ার রাজধানী বর্তমানে) দিয়ে। দামেস্কের আমির তখন আলেপ্পোর বিরুদ্ধে সাহায্য চাইলেন মসুলের সাইফ আল-দীনের কাছে, যিনি কিনা গুমুশ্তিগিনের আত্মীয়। কিন্তু সাইফ না করে দিলেন। তখন সিরিয়ানরা সালাহউদ্দিনের সাহায্য চাইলো। ব্যাপক সাহায্য নিয়ে সালাহউদ্দিন হাজির হলেন প্রিয় শহর দামেস্কে। বাবার পুরনো বাড়িতে বিশ্রাম নিলেন। চার দিন বাদে দামেস্কের সিটাডেলের দরজা খুলে দেয়া হলো। সালাহউদ্দিন তখন সিটাডেল অধিকার করে নিলেন এবং বাসিন্দাদের কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করলেন।

এরপর নিজের ভাইকে দামেস্কের শাসক করে আলেপ্পোর দিকে এগিয়ে গেলেন তিনি। সালিহ প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে এসে মানুষকে বললেন যেন তাকে কেউ সালাহউদ্দিনের হাতে তুলে না দেয়, কেউ যেন আত্মসমর্পণ না করে। তার অভিভাবক গুমুশ্তিগিন তখন সাহায্য চাইলেন সালাহউদ্দিনের শত্রু অ্যাসাসিনদের গ্র্যান্ডমাস্টার মাসায়েফের রাশিদ আদ্দিন সিনানের। ১১৭৫ সালের ১১ মে, ১৩ জন গুপ্তঘাতক প্রেরণ করা হলো সালাহউদ্দিনকে মারতে। কিন্তু সকলেই নিহত হয়।

জেরুজালেম জয় করে নিলেন সালাউদ্দিন

আবার ত্রিপলির রেইমন্ডও মুসলিম এলাকায় আক্রমণ শুরু করেন। ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে তখন সালাহউদ্দিন পশ্চিম সিরিয়ার হমসে চলে যান, এবং অধিকার করে নেন সে শহর যুদ্ধ শেষে। এভাবে করে ১১৭৭ সালে সালাহউদ্দিনের বাহিনী এত শক্তিশালী হয়ে গেল যে ক্রুসেডারদের ত্রাস হয়ে

গেলেন তিনি। ১১৮৭ সাল পর্যন্ত তিনি ক্রুসেডারদের পাশাপাশি নিজের সাম্রাজ্যও বিস্তার করতে থাকেন। তার পতাকার নিচে এলো আলেপ্পো, দামেস্ক, মসুল ও আরো নানা শহর। মিসর, সিরিয়া ও ইয়েমেন জুড়ে প্রতিষ্ঠা হলো আইয়ুবী সাম্রাজ্য। সাম্রাজ্য বিস্তার করার সময় তিনি ক্রুসেডারদের সাথে বিভিন্ন চুক্তিতে ছিলেন যেন তার বাহিনী অন্যত্র ব্যস্ত থাকতে পারে। কিন্তু শাতিলনের রেজিনাল্ড এ চুক্তি ভঙ্গ করে বসেন।

অ্যাসাসিনদের হেডকোয়ার্টার সেই মাসায়েফ দুর্গ

ক্রুসেডাররা জেরুজালেম অধিকার করে ছিল বহু বছর। অন্যান্য ক্রুসেডার শহরগুলো অধিকার করার পর নজর দিলেন সালাহউদ্দিন জেরুজালেমের দিকে। তিনি চাইলেন বিনা রক্তপাতে শহরটি অধিকার করবার, কিন্তু ভেতরের বাসিন্দারা জানালো, দরকার হলে এ পবিত্র শহর ধ্বংস করে দেবে তবুও মুসলিমদের কাছে হস্তান্তর করবে না। জেরুজালেমের বালিয়ান অফ ইবেলিন হুমকি দিলেন, যদি জেরুজালেমের খ্রিস্টান অধিবাসীদের মুক্তিপণের বিনিময়ে মুক্তির শর্ত মেনে না নেয়া হয় তবে ভেতরের জিম্মি পাঁচ হাজার মুসলিমদের এক এক করে হত্যা করা হবে, এবং মুসলিমদের পবিত্র মসজিদুল আকসা ও ডোম অফ দ্য রক ধ্বংস করা হবে। সালাহউদ্দিন মেনে নিলেন। খ্রিস্টানদের যে মুক্তিপণ তিনি ধার্য করলেন সেটা আজকের হিসেবে চার হাজার টাকা।

জেরুজালেমের খ্রিস্টান যাজক হেরাক্লিয়াস দান করে দিলেন অর্থ যার দ্বারা আঠারো হাজার গরিব খ্রিস্টানের মুক্তিপণের টাকা উঠল। বাকি রইল পনেরো হাজার, তাদের দাসত্ব বরণ করতে হবে।

১১৮৭ সালের সেপ্টেম্বরের ২০ তারিখ শুরু হওয়া সালাহউদ্দিনের হাত্তিন যুদ্ধফেরত ২০,০০০ সেনা কর্তৃক করা জেরুজালেম অবরোধ শেষ হয় অক্টোবরের ২ তারিখ। সেদিন আত্মসমর্পণ করে জেরুজালেম। শেষ হয়ে গেল কিংডম অফ জেরুজালেম।

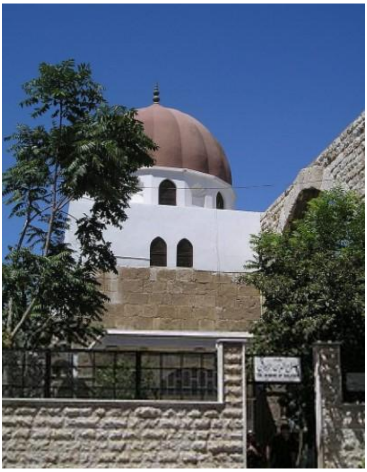

দামেস্কের সেই উমাইয়া মসজিদ, যেখানে সালাহউদ্দিনের কবর

সালাহউদ্দিনের কবর;
Source: Wikimedia Commons

এর আগে যখন মুসলিমদের হারিয়ে ক্রুসেডাররা জেরুজালেম দখল করেছিল সেদিন মুসলিমদের কচুকাটা করে হাঁটু পর্যন্ত রক্তের বন্যা বয়ে দিয়েছিল তারা। তাই তারা আশংকা করছিল সালাহউদ্দিন এমনটা করবেন কিনা চুক্তিভঙ্গ করে। না, তিনি করেননি। তিনি যারা ক্ষতিপূরণ দিয়েছিল তাদের তো যেতে দিলেনই, যারা দিতে পারেনি তাদেরও বিনা মুক্তিপণে চলে যেতে দিলেন।

জেরুজালেম বিজয়ের পর সালাহউদ্দিন প্রাক্তন ইহুদী বাসিন্দাদের বললেন, তারা শহরে ইচ্ছেমত আবার বসবাস করতে পারে।

হয়ত ভাবছেন কাহিনী এখানেই শেষ। কিন্তু না, জেরুজালেম জয় করতে গিয়ে সালাহউদ্দিন একটা বিশাল ভুল করেছিলেন, সেটি হলো, তিনি খ্রিস্টানদের টায়ার (Tyre) শহর জয় না করেই এদিকে এসেছিলেন। ইসলামে বেশি গুরুত্বপূর্ণ জেরুজালেম জয়ের জন্য তার তর সইছিল না।

জেরুজালেমের পতনের পর ইংল্যান্ডের রাজা রিচার্ড দ্য লায়নহার্টের উদ্যোগে ও অর্থায়নে শুরু হয় থার্ড ক্রুসেড (১১৮৯-১১৯১)। টায়ার শহর থেকে খ্রিস্টানরা যোগ দিল তার সাথে। আক্রা (Acre) শহরে মুসলিম বাহিনীকে পরাজিত করে রিচার্ডের বাহিনী। নারী ও শিশুসহ প্রায় তিন হাজার বন্দী মুসলিমকে হত্যা করেন রিচার্ড। এরপর ১১৯১ সালের ৭ সেপ্টেম্বর আরসুফ যুদ্ধে সালাহউদ্দিনের বাহিনীর মুখোমুখি হন রিচার্ড। সে যুদ্ধে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হন সালাহউদ্দিন, যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করতে বাধ্য হন বাহিনীসহ। রিচার্ড জাফফা শহর দখল করে নেন।

ওদিকে সালাহউদ্দিন মিসর ও ফিলিস্তিনের মাঝের আস্কালন শহরের নিরাপত্তা বাড়িয়ে দেন, যেন ক্রুসেডারদের হাতে এর পতন না হয়। তারা দুজন শান্তিচুক্তির পথ খুঁজতে লাগলেন। রিচার্ড প্রস্তাব দিলেন, রিচার্ডের বোন সিসিলির রানী জোয়ানকে সালাহউদ্দিনের ভাই বিয়ে করুক, আর বিয়ের উপহার হিসেবে জেরুজালেম দিয়ে দেয়া হোক। সালাহউদ্দিন এ প্রস্তাব উড়িয়ে দিলে রিচার্ড বললেন সালাহউদ্দিনের ভাই যেন খ্রিস্টান হয়ে যান।

১১৯২ সালে রিচার্ড জেরুজালেম থেকে ১২ মাইল দূরে থেকেও জেরুজালেম আক্রমণ করলেন না, বরং আস্কালনের দিকে গেলেন। ওদিকে সালাহউদ্দিন গেলেন জাফফা পুনরুদ্ধার করতে, প্রায় করেই ফেলেছিলেন, কিন্তু আস্কালান থেকে ছুটে এলেন কিং রিচার্ড এবং সালাহউদ্দিনকে পরাজিত করলেন শহরের বাইরের এক যুদ্ধে। এটাই ছিল থার্ড ক্রুসেডের শেষ যুদ্ধ। সালাহউদ্দিনকে মেনে নিতে হলো রিচার্ডের শর্তগুলো, টায়ার থেকে জাফফা পর্যন্ত ক্রুসেডারদের অধীনেই থাকবে। মেনে নিলেন যে, খ্রিস্টান তীর্থযাত্রীরা বিনা অস্ত্রে জেরুজালেম ভ্রমণ করে আসতে পারবে। তিন বছর পর্যন্ত কেউ কাউকে আক্রমণ করবে না।

কিন্তু তিন বছর আর বাঁচেননি সালাহউদ্দিন। কিং রিচার্ড চলে যাবার পর এক জ্বরে আক্রান্ত হয়ে দামেস্কে মারা গেলেন তিনি, ১১৯৩ সালের ৪ মার্চ। মৃত্যুর আগে তিনি সম্পত্তি দান করে গিয়েছিলেন গরীব দুঃখীদের। মাত্র এক স্বর্ণমুদ্রা আর চল্লিশ রৌপ্যমুদ্রা ছাড়া আর কিছুই ছিল না তার বাকি। তার জানাযা-দাফন-কাফনের টাকাটাও হচ্ছিল না। দামেস্কের উমাইয়া মসজিদের বাহিরের বাগানে তাকে দাফন করা হয়। সাত শতাব্দী পর জার্মানির রাজা দ্বিতীয় উইলহেম সালাদিনের কবরের জন্য একটি মার্বেলের শবাধার দান করেন। এখন আপনি সেখানে জিয়ারত করতে গেলে দেখতে পাবেন কবরের ওপরে দুটো শবাধার, একটি পুরনো ও আসল কাঠের, আর আরেকটি এই মার্বেলের।

তিনি পাঁচ কিংবা বারোজন পুত্র রেখে গিয়েছিলেন। তার অসংখ্য প্রজা হজ্জ করবার সৌভাগ্য ও নিরাপত্তা সালাহউদ্দিনের কল্যাণে পেলেও, সালাহউদ্দিন হজ্জ করবার সৌভাগ্য পাননি, যদিও তার পরিকল্পনা ছিল।

ইউরোপজুড়ে সালাহউদ্দিনের নানা ঘটনা প্রচলিত ছিল, এখনো আছে। চুক্তির পর রিচার্ড আর সালাদিন একে অন্যকে অনেক উপহার দিয়েছিলেন। একবার একটা ঘটনা ঘটেছিল, এক খ্রিস্টান মহিলার তিন মাসের বাচ্চা চুরি হয়ে যায়, এবং সেই বাচ্চাকে বাজারে বিক্রি করে দেয়া হয়। খ্রিস্টানরা তাকে বলল সুলতান সালাহউদ্দিনের কাছে যেতে। মহিলাটির কষ্ট জানবার পর সালাহউদ্দিন নিজের টাকায় বাচ্চাটি কিনে নেন আবার, এবং মহিলাটিকে ফিরিয়ে দেন। সালাহউদ্দিনের দরবারে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে মহিলার চোখ থেকে। সালাহউদ্দিন একটি ঘোড়ায় করে তাকে নিজের ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেন।

মাইকেল হ্যামিল্টনের লস্ট হিস্টোরি বইতে আমরা জানতে পারি, ১১৯২ সালে আক্রা আক্রমণের সময় রিচার্ড অসুস্থ হয়ে পড়েন। তখন সালাহউদ্দিন শত্রু রিচার্ডের চিকিৎসার জন্য নিজের ব্যক্তিগত ডাক্তারদের পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। জ্বর নিয়ন্ত্রণে রাখবার জন্য পাঠান বরফ, তাছাড়া ফলফলাদিও পাঠান। আরেকটি ঘটনা আমরা জানতে পারি, যখন রিচার্ড নিজের ঘোড়া হারিয়ে বিশাল মুসলিম বাহিনীর সামনে একা দাঁড়িয়ে থাকেন ময়দানে, তখন মুসলিমরা তাকে আক্রমণ করেনি। বরং সুলতান সালাহউদ্দিন তার জন্য দুটো ঘোড়া পাঠিয়ে দেন যেন সমানে সমানে যুদ্ধ হতে পারে।

ইতিহাসের পাতা আমাদের বলে না যে, রিচার্ড কোনোদিন সালাহউদ্দিনের সাথে সামনা সামনি দেখা করেছেন, সবই হয়েছিল দূতের মাধ্যমে। কিন্তু তিনি প্রচণ্ড রকমের সম্মান করতেন সালাহউদ্দিনকে, তার সাহস ও বীরত্বের তিনি খুব প্রশংসা করতেন। সালাহউদ্দিনও সম্মান করতেন রিচার্ডকে। সে যুগে একজন মুসলিমের নাম ইউরোপে সম্মানের সাথে নেয়া হচ্ছে সেটাই ছিল অবাক ব্যাপার। সালাদিন নামখানা আজও উজ্জ্বল ইতিহাসের তাম্রলিপিতে।♦

সৌজন্যে : Roar media, ইন্টারনেট পেইজ

শিকড়ের খোঁজে

আজিজুর রহমান আজিজ

যাই, মাটি খুঁড়ে দেখি হাজার হাজার বছর আগে
এখানের মাটির রং কেমন ছিলো
সেই মাটির বুকে মায়ের হাজার হাজার স্বপ্ন
কতরূপে কত ভাবে ছিলো সাজানো
রূপে রসে গন্ধ মাধুর্যে,
সে সব একটু একটু করে নরম হাতের পরশে খুঁজে দেখি,
মায়ের সেই হাজার স্বপ্ন
এখন কতটা হয়েছে হৃষ্টপুষ্ট প্রস্ফুটিত
কতটা হয়েছে সতেজ প্রাণবন্ত মাধুর্য পূর্ণ
কিন্তু আমার আর হয় না যাওয়া খুঁজতে
ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়ি পথের ধারে,
সেই অঘোর ঘুমের মাঝে দেখি
ছয়ফুট এগারো ইঞ্চি উচ্চতার এক সৌম্যকান্তি যুবক
মাথায় ঝাকড়া চুল, ললাট বড় গর্বিত প্রসস্ত জ্বলজ্বল
তাতে লেখা বাঙালি জাতির শিকড়ের ইস্তেহার ঘোষণাপত্র লেখা
ললাটে জুড়ে তাঁর খোঁচিত লালসবুজের পতাকা,
বক্ষে বহমান হাজার নদীর সংগীত বহমান
তেজদীপ্ত স্রোত বেগবান ঢেউ তুলে
পদ্মা মেঘনা যমুনা কর্ণফুলি তিস্তা ধলেশ্বরী
মাথাভাঙ্গা গোড়াই মধুমতি বলেশ্বর গোমতি
আরো কত কি নদীর কলগান
ধীরে ধীরে সেই মানচিত্র পতাকা ঢেকে ফেলে আমাকে
আমি তখন তার সন্মোহনী যাদু বলে
অচেতন ঘুমে হই নিম্‌গ্ন
কিন্তু কোথা দিয়ে কি যাচ্ছে ঘটে বুঝিনি কিছু
অচেতন মনের পর্দা হয়ে যায় উন্মোচিত
অবচেতন মনে দেখি সেই পতাকা

দারুন মমতায় বুকে নিয়ে ছুটছেন
সেই সৌম্যকন্তি যুবকের কাছে
সাথে সমগ্র বাংলাদেশের মানচিত্র
আঁকতে বসেছেন তিনি মধুমতি নদীর তীরে
যুদ্ধ যাত্রার সেনাপতির ভঙ্গিতে
আমি তাঁকে করি প্রশ্ন
কে কে আপনি হে সৌম্যকান্তি উন্নতশীর যুবক
আপনার পরিচয় দিন
হে দেব দূত কোথা থেকে এলেন আপনি
এই সমতটে সবুজে ঘেরা ষড়ঋতুর দেশে
তিনি হেসে বলেন হে বালক সব পারবে জানতে
তোমার ঘুম ভাঙ্গলে
সব কিছু লেখা আছে অই জন্মের ইস্তেহারে ঘোষণাপত্রে
তবে শোন পৃথিবীর বয়স কত
তা আজও হয়নি নির্ণিত
তবে এই উপমহাদেশের জন্ম খ্রিষ্টপূর্ব
সাত আট লক্ষ বছর আগে
এতোসব প্রাচীন কথা তুমি বুঝবেনা জানি
ঠিক তাই তবে এসব শুনেছি ইতিহাস যারা লিখেছেন
সেই ইতিহাসের পাতা থেকে
তা হলে শোনো ভয় পেওনা
আমরা বাঙালি জাতি জন্ম আমাদের এই ভূখণ্ডে
বয়স কম হলেও তার কম করে দুহাজার বছর আগে,
আমি জাগি চোখ মেলে
দেখি যার সাথে হয়েছিলো সংলাপ আমার ঘুম ঘোরে
তিনি কোথায় গেলেন চলে,
আমি প্রতিজ্ঞায় থাকি অটল সাহসে বাঁধি বুক
আমাদের শিকড় সন্ধান করতেই হবে
কিছুটা সূত্রতো পেয়েছি ঘুম ঘোরে
হিমালয় সম উঁচু সেই বঙ্গসন্তানের কাছ থেকে
এবার বেড়িয়ে পড়ি বীরদর্পে
আমার হাতে সেই লাল সবুজের পতাকা
বুকের ভেতর একটি মানচিত্র
যা এঁকে দিয়ে গেছেন সেই সৌম্যকান্তিধর মহাপুরুষ

আমি হাজার নদীর রেখা করি অতিক্রম
পাহাড় জঙ্গল জলাভূমি সমতট করি তছনছ
শক্তিমান পায়ের আঘাতে
দেখি ইবনে বতুতা ফাহিয়েন হিউওয়েন সাং
কতনা ভিনদেশী পর্যটক ইতিহাস লেখক
এসেছিলেন এই দেশে কোনো এক মায়াবি টানে
এসেছিলো মোঘল পাঠান সুলতান শাসকদল
মৌর্যরা অশোক চন্দ্রগুপ্ত সেন পালরাজা
এই দেশ করেছে শাসন
এসেছে এই দেশে ধন রত্নের সন্ধ্যানে লুণ্ঠনে
বাংলা বঙ্গভুমি করেছে শাসন শোষণ
বহু ভিনদেশী রাজা উজির
সকলের শেষে এসেছিলো এক বেনীয়া জাতি
বাণিজ্যের মানদণ্ড হাতে
তারা করেছিল রূপান্তর সেই দণ্ড রাজদণ্ড রূপে
আমি অবাক বিস্ময়ে যখন বাক রুদ্ধ
তিনি বললেন তিনি জন্মেছেন এই মধুমতির তীর ঘেঁষে
শান্তশীতল ছবির মতো পল্লীতে
নাম তার টুঙ্গিপাড়া
যদিও এক দিন তাঁর পূর্বপুরুষেরা
এসেছিলেন সুফিসাধক রূপে ইয়েমেন ইরাক থেকে
ভূভারতের এই নিভৃত পল্লীর কোলে
বেঁধে ছিলেন জীবন সংসার
সেই বহুবহু কাল পূর্বে
আমি অবাক দৃষ্টি মেলে তাঁর কথা শুনতে শুনতে
আবার ঘুমিয়ে পরি
ঘুমের মাঝেই ইতিহাসের পাতা উল্টাতে থাকি
সতেরেশো সাতান্ন থেকে উনিশত সাতচল্লিশ
দেখি কতনা অত্যাচার নির্যাতনের রক্তক্ষরণ
বাংলা তথা ভূভারতের বুকে ঘটেছিলো
বর্গীরা করেছে লুণ্ঠন
নীলকর সাহেবের অত্যাচারে
জমিদারের চোখ রাঙ্গানিতে
কম্পিত ছিলো কত না নরনারী

‘স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে
কে বাঁচিতে চায়
দাসত্ব শৃঙ্খল কে পড়িতে চায় হে
কে পড়িতে চায় পায়’
শ্লোগান ওঠেছিল জেগে চারিদিকে
কতনা পরিকল্পিত দাঙ্গা হাঙ্গামার ইতিহাস
কত না সন্ত্রাস হত্যা যঞ্জ পাওয়া যাবে ইতিহাসের পাতায়
ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেছে গান কত না প্রাণ
খুদিরাম তীতুমির আরো কত নওজোয়ান
কত বাঙালি ঢেলেছে রক্ত স্বাধীনতার জন্য
বাঙালির জন্য একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র
চেয়েছিলেন বাঙালি জাতির নেতাজী সুভাষ বোস শরৎ বোস
তখনকার তরুণ ছাত্রনেতা রাজনৈতিক নেতা
সাতাশ আঠাশ বছরে তরুণ
শেখ মুজিবুর রহমান
তার রাজনীতির শিক্ষা গুরু হোসেন শহিদ সোহরাওয়ার্দ্দী
সেই উনিষ সাতচল্লিশের আগস্টে করেছিলেন ঘোষণা
আমরা তো এই স্বাধীনতা চাইনি
আমরা চেয়েছিলাম সমগ্র বাঙালি জাতির জন্য
একটি স্বাধীন সার্বভৌম জাতি রাষ্ট্র
যে রাষ্ট্রের রাষ্ট্র ভাষা হবে বাংলা
সেই রাষ্ট্র হবে গণতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ
বাঙালি জাতীয়তাবাদ হবে তার দর্শন
এর জন্য একটি যুদ্ধ করতে হবে
সেই থেকে পতাকার ছবি আঁকা
সেই থেকে মানচিত্রের ছবি আঁকা
এঁকেছেন টুঙ্গিপাড়ার এই নিভৃত পল্লীর
সেই হিমালয়সম উঁচু বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
আজ তার জন্মদিনে আমরা আনন্দে অন্তপ্রাণ।।

(১৭ মার্চ ২০২১ জাতির পিতার জন্মদিনে আমার অভিব্যক্তির অংশ বিশেষ)

‘দেশরত্ন’ শেখ হাসিনা

সোহরাব পাশা

তোমার সুখ্যাতি বিশ্বময়
কেনো না তুমি তো মৃত্যুভয় তুচ্ছ করে
অশ্লীল আঁধার ভেঙে ছিনিয়ে এনেছো
নতুন ভোরের আলো
এই মৃত্তিকা, মানুষ, গোলাপ বাগান
আর ভোরের পাখিরা সে কথা জানে,
শুধু বাংলাদেশ আর বাঙালির নয়
সারা পৃথিবীর জন্যে এনেছো সোনালি
দিন, স্বপ্নময় সুবাতাস ;
পিতৃহারা, মাতৃহারা, কতো প্রিয় স্বজন-হারানো
বেদনায় ক্ষত-বিক্ষত, অকৃপণ হৃদয়ে তুমি
ভালোবেসেছো বাংলার দুঃখি মানুষকে,
অশ্রুভরা চোখে ভালোবেসেছো এই
বাংলাদেশকে,
তুমি নিজ হাতে মুছে দিয়েছো মুক্তিযুদ্ধে
সন্তানহারা দুঃখি মায়ের চোখের জল,
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু বঙ্গজননীর কন্যা
তুমি ‘দেশরত্ন’ শেখ হাসিনা, নক্ষত্রের মতো
তোমার নাম চির উজ্জ্বল অম্লান থাকবে এই বাংলায়
আর বাঙালির হৃদয়াকাশে;
শহরে-বন্দরে, গ্রামে-গঞ্জে, সবখানে
আজ আনন্দের যে ঝর্নাধারা, সে তো তোমারই জন্যে;
আন্তর্জাতিক বিশ্বে
তুমি উজ্জ্বল করেছো বাংলাদেশের সুনাম,
বাঙালি শিখেছে আজ তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার
সারাবিশ্বে মাথা উচুঁ করে দাঁড়াবার
বিশ্ব জেনে গেছে শ্রেষ্ঠ বাঙালির শ্রেষ্ঠ সন্তান
বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা বাঙালি
বাংলাদেশের অহংকার।

হিমাদ্রিশিখরসম বাঙালি কবি কাজী নজরুল

আ ফ ম ইয়াহিয়া চৌধুরী

বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম;
সমাজ-মানস সংস্কারক, মুক্তির অবধারিত অভিযাত্রিক,
বোধ-বিবেক, সংঘাত সখ্যতা, গ্রহণ-বর্জন, অর্জন-নিরঞ্জন,
নার্গিসবিরহ, প্রমিলাপ্রণয়, বিদ্রোহ-বিপ্লব সমভিব্যাহারে তব জীবন।

শোষণ, শাসন, সাম্রাজ্যবাদ, শ্রেণীসংগ্রাম, স্বাধীকার, স্বাধীনতা,
নজরুল সাহিত্যপ্রতিভা, সুর ও সংগীতের সামগ্রিকতা,
সাহিত্যতত্ত্ব, সূত্র ও শৈলী, বিদ্রোহী কবিতার সুর,
অনন্ত জাগরণী, বিশ্বজনীন, বিশ্ব সাহিত্যে বিস্ময়কর।

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম;
হিমাদ্রিশিখরসম এক বাঙালি কবি।
তব সৃষ্টিকর্ম রবিরশ্মিসম, বিশ্বে বিচ্ছুরিত।
কাজী নজরুল; যুগস্রষ্টা, নারীমুক্তি ও সম্প্রীতির সারথি।

সুরশিল্প ও সংগীতস্রষ্টা কাজী নজরুল ইসলাম;
তব সুরসংগীত, সাহিত্যকর্ম; অগ্নিবীণার ঝঙ্কার,
তব হুঙ্কারলহরী কান্ডারীদের হুঁশিয়ারী।

কাজী নজরুল; ফণীমনসায় গান করা বুলবুল।
কাজী নজরুল; পুস্পকাননে প্রস্ফুটিত ঝিঙেফুল।
বাংলা কবিতার স্নিগ্ধতায় দোলনচাপার সৌরভ,
বাংলা কাব্যের প্রশান্ত সরোবরে মহাসাগরের জোয়ার,

ধূমকেতু কবি কাজী নজরুল ইসলাম;
বাঙালির অস্তিত্বের এক প্রবল পরাক্রান্ত ব্যক্তিত্ব,
বিদ্রোহী রণক্লান্ত, সাম্য-সম্প্রীতিতে অনন্ত, প্রেমাসিক্ত,
কাজী নজরুল ইসলাম, লহ সালাম; তোমায় স্মরি।

আমার মায়ের জন্য শোকগাঁথা

সিরিয়া মনি লোদী

কিছু মায়া থেকে যায় মরণ অবধি।
চোখ পাথর হবার আগ-মুহূর্ত মমতাশূন্য হতে চায় না কারো কায়া।
আপনজনদের অপেক্ষায় মন অস্থির সচল থাকে!
আদর মাখা তৃপ্ত আত্মা নিয়ে যে চলে যায়, সে শান্তিতে ঘুমায়।
যে মমতা পায় না, তার মতো দুর্ভাগা কেউ নয়।
আমার মা বিষন্ন মনে চলে গেছেন, পৃথিবীর মায়া ছেড়ে মমতাহীন!
মৃত্যুকালে দুখিনী আমার মায়ের পাশে কেউ ছিলো না, চার সন্তানের কেউ।
তিনি চলে গেছেন, মরণ অবধি মমতা শূন্যতায়, ভালোবাসা না পেয়ে।
দু'ফোঁটা অশ্রুবিন্দু নিয়ে, কারোকে না বলেই মা নীরবে-নিভৃতে চলে গেছেন!
সেই কষ্টবোধ কখনো মন থেকে সরে না!
কিছু কিছু মন কেমন করা মায়া থেকে যায় মরণ অবধি।

স্বগতোক্তি : একা নিরজনে

হাসান হাফিজ

ছায়া, কিন্তু প্রকৃত সে ছায়া নয়।
মায়া তবে?
দূরবর্তী, কিন্তু কেন মরে না বিভ্রম!
নিরালম্ব দীর্ঘ আয়ু পেতে হলে
কী কী করতে হয়?
ছলনাচাতুরি চাষ, প্রবঞ্চনা নিজেকেই,
সেও কিন্তু ভুলেরই অপর পিঠ নয়?
পলাতক হতে পারলে মোক্ষ মুক্তি
কিন্তু হায়! সর্বাঙ্গ যে সোনার শিকলে বান্ধা,
বলো বন্ধু, তাহলে উপায়?
করো তবে বিভ্রমের শ্রাদ্ধ আয়োজন।

মিথ্যে হোক শরীরের সমুদয় পাপ।
একা একা ভেসে চলো ভঙ্গুর ভেলায়।
হয়তো পথ ভুল। মরীচিকা অথবা অধ্যাস!
তাতে কোনো ক্ষতি হয়তো নেই।
অন্তিম-সাকিনে ঠিকই পৌঁছেছে জীবন।
গোধূলির আধো আলো নিস্পন্দ ও অবসিত।
হয়তো বিরতি চায় অভ্যন্তরে একান্তে গোপনে।

ছায়াসত্য, কায়ামাটি, পরিপাটি, তুমি খাঁটি?
সুতরাং এসো গো অন্তিম, দোঁহে লুপ্ত হই!

পিপাসা পান করি

সেলিম মাহমুদ

চেনা-অচেনার বিভ্রম নিয়ে আছি এই ধরাধামে।

পাই পাই হিসাবে পিপাসা পান করি
যদি হেরে যাই, যদি জিতে থাকি?
এক আঁজলাও ভরা ছিলো না
কিছু অপূর্ণ তো ছিলো, কিছু ভরা ছিলো।

আসমানে যে মেঘ গর্জন করে, তারও নিষেধ ছিলো
যেন এর আগপাস্তলা প্রকাশ না পায়।

এতো জানা-অজানার পারাপারে বসে থেকে
বৃথাই অন্বেষা; যদি আসে দুকূল ছাপিয়ে
পানির কিনারে কী গভীরে; পিপাসা তো মিটে না মোটেই!

প্রবাহমান সময়

আনোয়ার কবির

বাতাসের নিঃশ্বাসে ভেসে থাকা সময়
জন্মাবধি পৃথিবীর সমান বয়সী

আকাশের গায়ে ভেসে থাকা তারা
প্রবাহমান সময়ের স্রোতের কালসাক্ষী

উড়তে উড়তে হাওয়ায় ভাসা প্রজাপতি
জন্মাবধি নদীর স্রোতের প্রবাহমানতা
বৃক্ষ তরুলতা পৃথিবী সমান বয়সী

বৃক্ষের পাতায় পাতায় দুলে ওঠে সময়কাল
মাটির অনাঘ্রাতা ঘ্রানের ভেতরে জমে থাকা সময়
সমুদ্রের তলদেশের শ্যাওলা লতা গুল্ম মৎস্য
বয়ে বেড়ায় সময়ের স্রোতরাশি
জন্ম থেকে নিরবধি বহমান কালের সাক্ষী!

খুরের আওয়াজ

মোহাম্মদ আন্ওয়ারুল কবীর

এখনো মনে পড়ে বিজ্ঞানস্যারের কথা–
নিউটনের সূত্র পড়াতে পড়াতে বলতেন গতির গল্প,
'অরবিটে আলো ফেলে দ্যাখো, মাইক্রোস্কোপে কিংবা টেলিস্কোপে
সবকিছুই বহমান... থেমো না তোমরা, থেমে গেলে নদী মরে যায়
থেমে গেলে ব্ল্যাকহোল হাহাকার'

স্যার থেমে গেছেন সেই কবে, গেছেন কি থেমে!
ইথারে কান পেতে পাঠ করে যাই খুরের আওয়াজ।

স্বপ্নগাড়ি

ফরিদুজ্জামান

বাস্তবে আমাদের কোনো গাড়ি নেই
অথচ পৈত্রিক স্বপ্নগাড়ির মালিক আমরা।
ঠেলাগাড়ির মতোই প্রজন্মান্তর ঠেলে চলছি।
এ গাড়ি ঠেলতে ঠেলতে পিতামহ ভেবেছিলেন–
নিজ পিঠের চাবুকের দাগ তার সন্তানদের পিঠে পড়বেনা।
অথচ তার স্বপ্ন মিথ্যে হয়েছিল। তবু তিনি মৃত্যু অবধি লড়েছেন।

আমার পিতা ভেবেছিলেন–
নিজ কাঁধের জোয়ালের দাগ তার সন্তানদের ঘাড়ে পড়বেনা।
স্বপ্ন গাড়ি ঠেলতে ঠেলতে জীবন সায়াহ্নে এসে তিনি দেখলেন–
তার সন্তানদের কাঁধে জোয়ালের দাগ স্পষ্ট হয়ে উঠছে।
তবু তার পথ চলায় পরাজিতের ছাপ ফোটেনি কোনোদিনও।

আমি স্বপ্ন গাড়ি ঠেলতে ঠেলতে দেখছি–
নিজ দেহের পরাজয়ের দাগ আমার সন্তানদের দেহে জেগে উঠছে।
তবুও সুন্দর সকালের প্রত্যাশায় প্রতিদিনের ঘুম ভাঙে।
টার্নেলের প্রান্তের আলোকরেখার প্রত্যাশায় প্রতিটি রাত জাগি।
ভুখা নাঙা মিছিলে কারো কারো বাণী এখনো স্বপ্ন জাগিয়ে দেয়।

এইভাবে প্রজন্মান্তর আমাদের স্বপ্নগাড়ি ঠেলা।

আমি যখন পরশপাথর নই
মারইয়াম মনিকা

আমি যখন পরশপাথর হলুদ রঙের চাঁদ
ফাঁকা ফাঁকা মাঠে থইথই নৃত্য আমার
এ সোনার ভূমিকে পুনরায় জাগাবার,
লুব্ধ লোকের ভিড়ে
যখন উড়াই আমার উজ্জ্বল বর্শা
দেখি সমুদ্র আকাশ পাহাড় অরণ্যের উর্বর উচ্ছ্বলতা,
আমার বুকের ওপর যখন লাল সবুজ শাড়ির আঁচল
বহুদূরে বহুদূরে কৃষ্ণচূড়ার ডালে বাজে,
এ অসহ্য বেদনা রক্তে ঝড়ানোর ফসল।

আমি যখন পরশপাথর নই-
তখন পৃথিবীর বিবর্ণ ধূসর দিন,
বিকেলের শেষ কান্নার শব্দ গভীর সমুদ্রের নীলজল,
সাদা ফেনা, ধোঁয়াটে কুয়াশা আমি,
আমি পশ্চিম আকাশের তলপেট ছিঁড়ে
সূর্যের উরুতে নারী ও নাড়ীর টান শক্ত করে বাঁধি।

আমি রুদ্ধশ্বাসে করি রাত্রি যাপন,
করি মৌন প্রার্থনা
দূরন্ত আন্ধকারে ঢালি অবিশ্বাসের হিংস্রতা;
করি তৃতীয় মহাযুদ্ধের ইশারা।

আমি নীল রক্তবান,
মরুভূমির মাঝে নীল মৃত্যুকে করি আহ্বান,
আমি মায়ের নাভীচ্যুত হওয়া শ্মশান
কুরুক্ষেত্রের রক্তস্রোত
আমি দারুণ চৈত্রে ফেটে পরা দস্যু উত্তরাধিকার,
আমি ছিন্নভিন্ন বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য,
প্রকৃতির লোহিত সকাল
আমি গর্ভবতী সতী সাবিত্রীর প্রেমহীন সন্তান।

গুরু-শিষ্য

সমীর আহমেদ

কলকাতা হাইকোর্টের নামকরা ব্যারিস্টার হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। মামলা-মোকদ্দমা প্রচুর সময় দিতে হয়। তারপর রাজনীতি ও জনসেবামূলক কাজ তো আছেই। কিছুদিন আগে সিভিল সাপ্লাই মিনিস্টার হওয়ার পর তিনি আরও বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। দিনের বেলা তাকে পাওয়া যায় না বললেই চলে। শেখ মুজিব যদি কখনো কোনো প্রয়োজনে বেকার হোস্টেল থেকে তার সাথে দেখা করতে যান, তিনি বলেন, মুজিব রাতে এসো। এগারোটার পরে। এর আগে এলে আমি বেশি সময় দিতে পারবো না। মন খুলে কথাও বলতে পারবো না।

শেখ মুজিব সাধারণত রাতে নির্ধারিত সময়ে তার সাথে দেখা করতে যান। কিন্তু ব্যতিক্রম শুধু আজ। গতকালই শহীদ সাহেব শেখ মুজিবকে বলে দিয়েছিলেন, কাল বিকালে ফ্রি আছি, মুজিব। বাসায় এসো।

বেকার হোস্টেল থেকে শেখ মুজিব থিয়েটার রোডের বাসায় এসে বসে আছেন প্রায় আধা ঘণ্টারও বেশি হতে চললো। শহীদ সাহেব এখনো এসে পৌঁছেন নি। এ বাসার সবাই শেখ মুজিবকে চেনে জানে। গৃহ পরিচারক শিবু তাকে দেখলে বেশ খুশি হয়। মুজিব ভাই আসছেন। বসেন ভাই। বসেন। আপনাকে দেখলে ভালো লাগে। শহীদ সাহেবের কাছে তার যে গুরুত্ব অনেক, তা শুধু শিবু কেন, এ বাসার সবাই জানে। এ জন্য সবাই তাকে ভালোবাসে। অন্দরমহলেও তার যাতায়াত আছে।

শেখ মুজিব বসে আছেন শহীদ সাহেবের বাংলাঘরে। অফিস ও রাজনৈতিক আলোচনা সবই চলে এখানে। বাইরের কেউ নেই এখন। সবাই জানে, রাত ছাড়া শহীদ সাহেবকে পাওয়া যাবে না, হয়তো এ কারণেই। শেখ মুজিবের জন্য চা-নাস্তা নিয়ে এসেছিল শিবু। ভাইজান বসে বসে চা-নাস্তা খান। আমার একটি জরুরি কাজ আছে। আসি। শিবু আর আসেনি। একা একা বসে থাকতে আর ভালো লাগছে না তার। তিনি পাশের রুমে গেলেন। এটি শহীদ সাহেবের বিশ্রাম কক্ষ। পূর্বপাশের দেয়ালে তিনটি সেগুন কাঠের আলমারি। তাকে তাকে সাজানো নানারকম বইপত্র। আইনের বইপত্রই বেশি। সেদিকে একবার চোখ বুলালেন শেখ মুজিব। তারপর চেয়ারে যখন বসতে যাবেন, তখন তার চোখ পড়লো খাটে– বালিশের ওপর একটি কালো রঙের নোটবুকে। এ ধরনের নোটবুক তার কাছে আগে কখনো দেখেননি শেখ মুজিব। শহীদ সাহেব গোছানো মানুষ। যে জায়গা থেকে যে জিনিসটি তিনি নেন, সেই জায়গায় সাধারণত আবার রেখে দেন। নোটবুকটি এভাবে রেখে যাওয়ার কথা নয়। হয়তো বাইরে বেরোনোর সময় তাড়াহুড়োর কারণে ভুলে গিয়েছেন। আর শিবুও হয়তো খেয়াল করেনি। তাহলে নোটবুকটি তুলে রাখতো শেলফে।

নোটবুকে কী আছে? মামলা মোকদ্দমার তথ্য? নাকি অন্য কিছু? জানতে খুব কৌতুহল হলো শেখ মুজিবের। নোটবুকটি হাতে তুলে নিয়ে খাটেই পা ঝুলিয়ে বসে পড়লেন। পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা উল্টাতে লাগলেন। নানা রকম তথ্য। দেখতে দেখতে এক জায়গায় তার চোখ আটকে গেল। অনেকগুলো নামের একটি তালিকা। প্রত্যেকের নামের নিচে ঠিকানাও লেখা। এদের মধ্যে শহীদ সাহেবের বাড়ির পুরাতন চাকর বাকর। তার গাড়ির বিশ্বস্ত ড্রাইভার, বৃদ্ধ হওয়ার কারণে বছর দুএক আগে যে চাকরি ছেড়ে চলে গিয়েছে। আছে ধোপা, নাপিত, শ্রমিক, কর্মী, প্রবীণ লেখক ও রাজনৈতিক কর্মীসহ সমাজের বিভিন্ন পেশার মানুষ। সবার

নামের পাশে টাকার অংক লেখা। তিনি টাকার অংকগুলো যোগ করে দেখলেন, সাড়ে তিন হাজার টাকা। প্রতি মাসে এত টাকা তিনি তাদের পেনশন হিসাবে দেন! তাজ্জব ব্যাপার! এ জন্যই তো বলি, কোর্ট থেকে এত টাকা তিনি রোজগার করেন, সেই টাকা যায় কোথায়। রাজনীতি, সমাজসেবা তো রয়েছেই। যে তার কাছে আর্থিক সাহায্য চায়, তাকেই তিনি সাধ্য মতো সাহায্য করেন। এমন ঘটনা তো তিনি সব সময়ই দেখে আসছেন। কেবল এই নোটবুকটির কথাই তিনি এতদিন জানতেন না। এমন গোপনীয় নোটবুক আরও দু একখানা আছে কি না কে জানে! হয়তো আছে। কিংবা নেই। এখানে যা আছে, তা-ই বা কম কী? প্রতিমাসে পেনশন বাবদ তিন হাজার টাকা খরচ! মানুষ তো তাকে আর এমনি এমনি ভালোবাসে না। সবার প্রয়োজনে এগিয়ে যান কাছে, সবাইকে বুকে টেনে নেন; গরীব, অসহায় মানুষকে অকাতরে অর্থ বিলিয়ে দেন। এ ক্ষেত্রে তিনি জাতি-ধর্মের ভেদবিচার করেন না। মানুষই তার কাছে মুখ্য। কে মুসলিম, আর কে চণ্ডাল সেটি বিবেচ্য বিষয় নয়। সাহায্যের জন্য কেউ হাত পাতলে যাচাই-বাছাইও করেন না। কত টাউট-বাটপার যে তার থেকে সুবিধা নেয়, একমাত্র আল্লাহপাকই ভালো জানেন। এখানে যে কয়জনের নাম দেখতে পাচ্ছেন, শেখ মুজিব নিশ্চিত, তার মধ্যে অন্তত আট-দশজনই ভুয়া– আর্থিক সাহায্য তাদের না নিলেও চলে। কিন্তু নেতাকে এসব বোঝানো যাবে না। কিছু বললে, মৃদু হেসে বলবেন, মানুষ সহজে কি আর হাত পাতে, মুজিব?

বাইরে গাড়ির হর্ন শুনতে পেলেন শেখ মুজিব। নোটবুকটি আগের জায়গায় রেখে বেরিয়ে এলেন বাংলাঘরে। প্রিয় নেতার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন।

শিবুও যেন কোথা থেকে দৌড়ে গিয়ে গাড়ি থেকে কালো রঙের ব্যাগটি নিয়ে শহীদ সাহেবের পিছু পিছু ঘরের দিকে এগোতে লাগলেন। ঘরে ঢুকে বললেন, আরে মুজিব, কখন এলে? বসো। বসো।

শেখ মুজিব বসে পড়লেন তার সামনে। শিবু টেবিলে ব্যাগটি রেখে কাছাকাছি দাঁড়িয়ে রইলো। টেবিলে আজকের ডাকের চিঠিপত্রের খামগুলো সে আগেই রেখে দিয়েছিল। শহীদ সাহেব চেয়ারে বসে বললেন, মুজিব, একটু বসো। আজকের চিঠিপত্রগুলো আগে দেখে নিই, তারপর তোমার সাথে কথা।

একের পর এক খাম খুলে তিনি চিঠিপত্রে চোখ বুলিয়ে রেখে দিতে লাগলেন। হঠাৎ একটি পোস্ট কার্ডে তার চোখ আটকে গেল। পড়তে পড়তে তিনি বিমর্ষ হয়ে উঠলেন। শেখ মুজিব বললেন, স্যার, কোনো সমস্যা? কোনো কারণে কি আপনার মন খারাপ? এমন দেখাচ্ছে কেন আপনাকে? কী লেখা আছে পোস্টকার্ডে?

হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী কোনো জবাব দিলেন না। শুধু বললেন, মুজিব, এক্ষণি আমাকে বেরোতে হবে। তুমি কি যাবে আমার সাথে? গেলে গাড়িতে ওঠো।

শেখ মুজিব তার পিছু পিছু হেঁটে গাড়িতে উঠে বসলেন। শহীদ সাহেব ড্রাইভারকেও ডাকলেন না। নিজেই গাড়ি স্টার্ট দিলেন। তখনও তার বিমর্ষ ভাব বিন্দুমাত্র কমেনি। শেখ মুজিব কিছুতেই কৌতূহল দমিয়ে রাখতে পারছেন না। কী এমন লেখা আছে পোস্ট কার্ডটিতে, যে কারণে তিনি এত মন খারাপ করে আছেন। তাকে কিছু জিজ্ঞেস করতেও সাহস পাচ্ছেন না। কেবল দমিয়ে রাখছেন মনের অদম্য কৌতুহল। গাড়ি ছুটে চলেছে শহরের রাজপথ, অলিগলি দিয়ে, আশপাশের বাস, ট্রাক, ট্যাক্সি, রিকশা, ঠেলাগাড়ি মানুষজন, দালানকোঠা, বসতবাড়ি, গাছপালা পেছনে ফেলে। শেখ মুজিব বসে বসে ভাবছেন, এ রাস্তা তো খিদিরপুর গেছে। সেখানেই কি যাবেন? নাকি অন্য কোথাও? ওটা তো ডকইয়ার্ড এলাকা। সমুদ্রের কাছে। শ্রমিকরাই বেশি থাকে। দিনরাত জাহাজ ভাঙা, মেরামত ও নির্মাণ কাজ চলে। এদিকে তো তার আত্মীয়-স্বজন কেউ নেই। তার নিজের বাড়ি মেদিনীপুর। বাবা জাহিদ সোহরাওয়ার্দী কলকাতা হাইকোর্টের একজন খ্যাতনামা বিচারক। মা খুজাস্তা আখতার বানু বিশিষ্ট উর্দু সাহিত্যিক। তার নানা স্যার হাসান সোহরাওয়ার্দী। শহীদ স্যারের স্ত্রী ফাতেমার বাবাও ছিলেন ডাকসাইটে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। এ সম্ভ্রান্ত পরিবারকে কে না চেনে! শহীদ সাহেবের পরিবারের সবাই উর্দুভাষায় কথা বলেন। কিন্তু শহীদ সাহেব বাংলাভাষাও বেশ আয়ত্ব করে নিয়েছেন। বাংলাভাষার চর্চাও করেন বেশ। যখনই সময় পান বাংলা সাহিত্যের বই খুব মনোযোগ দিয়ে পড়েন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোনো বই বোধ হয় তার পড়া বাকি নেই।

প্রায় চল্লিশ মিনিট পর চলে এলেন খিদিরপুর। শেখ মুজিব ভেবেছিলেন, এবার নিশ্চয় গাড়ি এখানে কোথাও থামবে। কিন্তু মোড় থেকে তিনি একটি

সরুগলির দিকে গাড়ি টার্ন করলেন। ওদিকে, কোথায়? কতদূর যাবেন? পোস্টকার্ডটি কে লিখেছে? কী লেখা আছে যে, তিনি এক মুহূর্ত দেরি না করে চলে এলেন এদিকে? আর এখন এই খিদিরপুর ছেড়ে ওদিকেই বা কোথায় যাচ্ছে গাড়ি? শেখ মুজিব বেশ চিন্তায় পড়ে গেলেন।

আরও মিনিট দশেক চলার পর ওয়ার্ডগঞ্জ বস্তির দেখা মিললো। এখানে তার কী কাজ! গাড়ি থামালেন শহীদ সাহেব। সামনে অনেকগুলো চালাঘর। চারদিক স্যাঁতসেঁতে, কাদা, নোংরা। মলমূত্রে ঠাঁসা দুর্গন্ধ কালো পানি পাশের খোলা ড্রেনে জমে আছে। গাড়ি থেকে নামলেন শহীদ সাহেব। এগিয়ে চললেন সামনের চালাঘরের দিকে। কয়েক পা ফেলতে না ফেলতেই বস্তির সারি সারি চালাঘরগুলোর মধ্যে মুহূর্ত একটি শোরগোল পড়ে গেল, এই তোমরা কে কোথায় আছো। এদিকে আসো। মন্ত্রী সাব আইছেন। মন্ত্রী সাব। আমাগো নেতা শহীদ স্যার আইছেন! শহীদ স্যার!

সেখানে কয়েক মুহূর্তের মধ্যে বস্তির সবগুলো ঘরবাড়ি ভেঙে যেন মানুষ নেমে এলো রাস্তায়। স্ত্রী-পুরুষ, মেয়ে-ছেলে, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, নগ্ন শিশু সবাই। কয়েকটি শিশুর কোমরে ময়লা কালো তাগা। গলায় ঝুলানো তাবিজ। এমন মনোরম ভীড়ভাট্টা, হট্টগোলে তারা হয়তো অভ্যস্থ নয়। কয়েকটি শিশু ড্যাব ড্যাব চোখে তাকিয়ে ভীড়ভাট্টার ফাঁকফোকর দিয়ে দেখার চেষ্টা করছে শহীদ সাহেবকে। শহীদ স্যার, জিন্দাবাদ। স্লোগান দিয়ে বস্তির সকল মানুষ তাকে একেবারে ঘিরে ফেলেছে। শহীদ সাহেবের পাশে যেন আর থাকাই যাচ্ছে না। প্রিয় নেতাকে কাছে পেয়ে সবাই আনন্দিত। প্রায় বৃত্তের মতো গোল হয়ে ঘিরে রেখেছে তাকে। সামনে আর এগোতে পারছেন না তিনি। এত মানুষের ভীড়ে আতিপাতি করে তিনি যেন কাউকে খোঁজার চেষ্টা করছেন। তার বিমর্ষ ভাব তখনো কাটেনি। কিছুক্ষণ পর তাদের হট্টগোল কিছুটা কমে এলে তিনি তার সামনের একজনকে জিজ্ঞেস করলেন, লতিফ মিয়ার ঘর কোনটি?

এ কথা শোনার পর জনতা তাকে প্রায় পাঁজকোলে করে নিয়ে ঢুকে গেল বস্তির ভেতরে। কয়েকটি চালাঘর পার হয়ে একটি জরাজীর্ণ ঝুপড়ি ঘরের সামনে নিয়ে তাকে দাঁড় করালো। দরোজা খোলা। ভেতরে ছেঁড়াফাড়া একটি মাদুরের ওপর বসে একজন লোক খুঁক খুঁক করে কাশছে। খালি গা। ভাঙা চুয়ালের সাথে চামড়া প্রায় লাগানো। কণ্ঠা ও পাঁজরের হাড়গোড়গুলো অনায়াসে গোনা যায়। এই তাহলে লতিফ মিয়া! তার দরোজায় এত মানুষের ভীড়! তার মধ্যে তার প্রিয় নেতা স্বয়ং সিভিল সাপ্লাই মিনিস্টার হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী দাঁড়িয়ে! মুহূর্তে লোকটি হতচকিত ও বাকরুদ্ধ হয়ে গেল। তারপর স্যার! স্যার! বলে হাউমাউ করে কেঁদে উঠলো। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী তাকে বললেন, কবে থেকে

আপনার এই অবস্থা? আমাকে আগে জানাননি কেন? লোকজনের দিকে তাকিয়ে ভর্ৎসনার স্বরে বললেন, লতিফ মিয়ার যক্ষ্মা হয়েছে। ধুকে ধুকে এখানে মরে যাচ্ছে। তোমরা আমাকে খবর দাওনি কেন?

সবাই চুপ। সলজ্জমুখে তাকিয়ে রইলো নিচের দিকে। সোহরাওয়ার্দী বললেন, এমন পরিবেশে তোমরা থাকো! আমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, তোমাদের বসবাসের এ জায়গার উন্নতি করবো। এখন লতিফ মিয়াকে নিয়ে আমার গাড়িতে তোলো। আজই তাকে যাদবপুর হাসপাতালে ভর্তি করে দেবো।

যাদবপুর হাসপাতাল! সবাই চমকে উঠলো। শেখ মুজিবের ঠোঁটে মৃদ্ হাসি ছড়িয়ে পড়লো। তিনি জানেন, যক্ষ্মার চিকিৎসার জন্য যাদবপুরই সবচেয়ে ভালো হাসপাতাল। কিন্তু চিকিৎসা বেশ ব্যয়বহুল। রোগীকেই সব খরচ বহন করতে হয়। লতিফ মিয়ার চিকিৎসার সব ব্যয়ভার নিশ্চয় শহীদ সাহেবের পকেট থেকে যাবে। এভাবে সাধারণ মানুষের পাশে গিয়ে না দাঁড়ালে, তাদের ভালো না বাসলে কি এত বড় নেতা হওয়া যায়!

লতিফ মিয়াকে গাড়িতে তুলে দিতে না দিতেই তিনি যাত্রা শুরু করলেন যাদবপুর হাসপাতালের দিকে।

হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী মানে সরকারের সিভিল সাপ্লাই মন্ত্রী হাসপাতালে! ডাক্তার-নার্স সবাই ছুটে এলো কাছে। স্যার, কী দরকার? কী করতে হবে বলুন।

লতিফ মিয়াকে এখনই হাসপাতালে ভর্তি করে নিন। তার চিকিৎসার খরচের জন্য মোটেও ভাববেন না। বিল পাঠিয়ে দেবেন। সব টাকা আমি পরিশোধ করে দেবো।

জ্বি স্যার! জ্বি স্যার! তার চিকিৎসার কোনো ত্রুটি হবে না।

সবাই খুব ব্যস্ত হয়ে পড়লো। কয়েকজন নার্স স্ট্রেচার নিয়ে ছুটে গেল গাড়ির দিকে। লতিফ মিয়াকে গাড়ি থেকে পরম যত্নে বের করে স্ট্রেচারে তুলে ছুটে চললো ওয়ার্ডের দিকে।

গাড়িতে উঠে বসলেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। তার পাশে শেখ মুজিব। লক্ষ্য করলেন এবার, প্রিয় নেতার চোখে-মুখে বেশ প্রশান্তি। খুব স্বস্তিতে গাড়ি চালাচ্ছেন কলকাতার থিয়েটার রোডের দিকে।

মুজিব, তুমি যেন আমার কাছে কী জানতে চেয়েছিলে?

কখন স্যার?

যখন আমি ডেস্কে বসে পোস্টকার্ড পড়ছিলাম।

ওহ! আমি এতক্ষণে জবাব পেয়ে গেছি স্যার।

হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী মৃদু হেসে বললেন, লতিফ মিয়া আমার কাছে চিকিৎসার জন্য কিছু আর্থিক সাহায্য চেয়েছিল। ওতে কি আর তার যক্ষ্মার চিকিৎসা হয়! তাই দিলাম ভর্তি করে।

স্যার, আপনার কালো রঙের নোটবুকটা আজ নেড়েচেড়ে দেখেছি।

ওটা আবার তুমি কোথায় পেলে?

আপনার বিশ্রাম কক্ষে।

ওটা তো কাউকে দেখতে দেই না। সকালে শেলফে তুলে যেতে ভুলে গিয়েছিলাম। আর শিবুও মনে হয় খেয়াল করেনি।

পেনশনের তালিকায় দেখলাম অনেকের নাম। তার মধ্যে বেশ কয়েকজনকে আমার সঠিক মনে হয়নি।

হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী চুপ করে রইলেন। কিছুক্ষণ পর বললেন, হয়তো তোমার কথাই ঠিক। কিন্তু কী করবো, মুজিব। ওরা এত অনুনয়-বিনয় করে! তাছাড়া সহজে কি মানুষ মানুষের কাছে হাত পাতে, বলো? নিরুপায় হয়েই তো, তাই না? তুমি তো মাত্র বছর দুএক হলো কলকাতায় এসেছো। এখনো জানো না দেশের প্রকৃত অবস্থা! মানুষ কতো অসহায়। আগামী মাসে ওই তালিকায় আরও বেশ কয়েকজনের নাম যুক্ত হবে। দিন দিন এ তালিকা শুধু বাড়ছে। ভাবছি কোর্টের প্র্যাক্টিস আরও বাড়িয়ে দেবো। তা না হলে ওদের আর্থিক যোগান দেয়া বেশ কঠিন হয়ে পড়বে।

প্রিয় নেতার প্রতি গভীর শ্রদ্ধায় মাথা আপনিই নত হয়ে এলো শেখ মুজিবের। তিনি ভাবলেন, উদারতায়, জনসেবায়, রাজনীতিতে গণতান্ত্রিক চেতনায় কে শহীদ সাহেবকে ছাড়িয়ে যেতে পারবে আর? কেউ না।

থিয়েটার রোডের দিকে ছুটে চলছে গাড়ি। সেখানে আরও কতজনে বসে আছে তার অপেক্ষায় কে জানে!

[আমরা জানি, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শৈশব-কৈশোরে নিজের পরনে নতুন লুঙ্গি খুলে এক অপ্রকৃতিস্থ লোককে দিয়েছিলেন। তাঁর বাল্যবন্ধু শাহাদৎ হোসেনের লেখাপড়ার ব্যয়ভার তিনি বহন করতেন। গোপালগঞ্জ স্কুলে গরীব ছাত্রদের জন্য তিনি মুষ্ঠি চাল সংগ্রহ করতেন। গ্রামের অসহায়, নিরন্ন মানুষের মধ্যে নিজের গোলার ধান বিলিয়ে দিয়েছিলেন। গোপালগঞ্জে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা হলে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে মানবিক সেতু তৈরিসহ মানবকল্যাণমূলক আরও নানাকাজে নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন।] ♦

কালাপীর

স্বকৃত নোমান

লঞ্চ তখনো ছাড়েনি। কেবিনে শুয়ে জোসেফ ক্যাম্পবেল-এর *পাওয়ার অব মিথ* পড়ছিল নেহাল। অর্ধেকের বেশি পড়া হয়ে গেছে, এ ভ্রমণেই পুরোটা শেষ করার ইচ্ছে। বই বন্ধ করে মোবাইলটা হাতে নিল। ফেসবুক ওপেন করে দেখল সমরকান্তির মেসেজ। লঞ্চে উঠেই চর কুকরী মুকরী যাত্রার কথা জানিয়ে ফেসবুকে একটা স্ট্যাটাস দিয়েছিল। সেটা দেখে সমরকান্তি লিখেছে, ভোলা হয়ে যাস। লঞ্চঘাটে আমি গাড়ি পাঠিয়ে দেব।

নেহালের মনেই ছিল না সমরকান্তি এখন ভোলায়। দেখা হয়েছিল প্রায় এক বছর আগে, ঢাকার রেডিসন হোটেলের এক অনুষ্ঠানে, সমর যখন ঝালকাঠির

এসপি। ভোলায় বদলি হওয়ার সম্ভাবনার কথা সমর বলেছিল সেদিন। নেহাল জনপ্রিয় দৈনিকের ব্যাস্ত সাংবাদিক, প্রতিদিন কত সচিব উপসচিব ডিসি এসপির সঙ্গে তার দেখা হয়, কথা হয়– কজনের কথা আর মানে থাকে।

অবশ্য সমরের কথা আলাদা। দশজনের সঙ্গে তাকে মেলানো যায় না। ভার্সিটির যে কজন ব্যাচমেটের সঙ্গে বন্ধুত্ব ছিল সমর তাদের একজন। একদিন আগে জানলেই লঞ্চের টিকেট বাতিল করে দিত নেহাল। প্রতিদিন বিকেল সাড়ে পাঁচটায় ঢাকার সদরঘাট থেকে ছেড়ে নিউ সাব্বির লঞ্চটি পরদিন সকাল নটা-সাড়ে ন-টায় ভোলার ঘোষের হাট পৌঁছায়। ভোলা শহরে যেতে হলে লঞ্চ পাল্টাতে হবে। লঞ্চ ছাড়তে মাত্র আধা ঘণ্টা বাকি, এখন কি আর তা সম্ভব? চাইলেই তো হুটহাট লঞ্চ পাল্টানো যায় না। ভিআইপি কেবিন পাওয়া তো এত সহজ নয়। সড়ক দুর্ঘটনা বৃদ্ধির কারণেই কিনা কে জানে, দক্ষিণাঞ্চলের বেশির ভাগ মানুষ এখন লঞ্চকেই নিরাপদ মনে করে। বরিশাল-ভোলা-খুলনা-মোড়েলগঞ্জ রুটে চাইলেই ভিআইপি কেবিন পাওয়া যায় না। মোড়েলগঞ্জ রুটের এমভি বাঙালি বা এমভি পারাবতের কেবিন তো মন্ত্রী-এমপি-সচিবের ফোন ছাড়া সম্ভবই না। নিউ সাব্বিরের কেবিন অবশ্য খালিই থাকে। বিশেষ করে শীতের দিনগুলোতে যাত্রী থাকেই না বলতে গেলে। সবে মার্চের শুরু। তবু অজ্ঞাত কারণে প্রথমে নেহালকে কেবিন দিতে রাজি হলো না কাউন্টার ম্যানেজার। কেবিন নাকি খালি নেই। কিন্তু নেহাল তার পেশাগত পরিচয়টা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ম্যানেজারের সুর গেল পাল্টে। কেবিন খালি আছে, কিন্তু এসি নষ্ট। নেহাল বলল, সারিয়ে নিন, এখনো দুদিন বাকি। ম্যানেজার আর কথা বাড়ায়নি।

নেহাল যাচ্ছে অফিসের কাজে। ভোলা জেলার সবচেয়ে অপরাধপ্রবণ এলাকা চর কুকরী মুকরী। ছিনতাই, চুরি-ডাকাতি, খুন, ফেনসিডিল-ইয়াবা ব্যবসা, ম্যানগ্রোভ বনের গাছ কাটা, হরিণ শিকার– হেন অপরাধ নেই যা ঘটছে না। পুলিশ-কোস্টগার্ড কোনোভাবেই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারছে না। দৈনিক *কালাকালের* চরফ্যাশন প্রতিনিধি সপ্তাহে দশটি নিউজ পাঠালে পাঁচটিই থাকে চর কুকরী মুকরীর। জেলা প্রতিনিধিও এ দ্বীপের উপর একাধিক অনুসন্ধানী প্রতিবেদন করেছে। অথচ প্রশাসন নির্বিকার।

সেদিন পত্রিকার সাপ্তাহিক মিটিংয়ে সম্পাদক চর কুকরী মুকরীর প্রসঙ্গ তুললেন। ব্যাপারটা আসলে কী? মাত্র চল্লিশ বর্গ কিলোমিটারের ছোট্ট একটা ইউনিয়ন কন্ট্রোল করতে পারছে না প্রশাসন! আরেকটা পুলিশ ফাঁড়ির দাবিতে

এলাকাবাসী নাকি উপজেলা সদরে মানববন্ধন করেছে, ডিসি বরাবরে স্মারকলিপি দিয়েছে, অথচ কেউ তো আমলেই নিচ্ছে না। স্থানীয় সাংসদও নিশ্চুপ।

চিফ রিপোর্টার বলল, আমি চরফ্যাশন করসপন্ডেন্টের সাথে এ বিষয়ে বিস্তারিত কথা বলেছি। আরেকটা পুলিশ ফাঁড়ি ছাড়া আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি কন্ট্রোলে রাখা আসলেই অসম্ভব। কিন্তু সরকারের সুনির্দিষ্ট কোনো নীতিমালা না থাকায় নতুন পুলিশ ফাঁড়ি স্থাপনের যাবতীয় কার্যক্রম বর্তমানে স্থগিত।

সম্পাদক বললেন, হোম মিনিস্ট্রিতে কথা বলেছ?

হ্যাঁ, মিনিস্টারকেই ফোন দিয়েছিলাম, তিনিই জানালেন।

নেহালের ঠিক বিশ্বাস হয় না। সে ভেবে পায় না চর কুকরী মুকরীর অবস্থা এতটা খারাপ হয় কী করে। তার মনে পড়ে পঁচিশ বছর আগের স্মৃতি। বয়স তখন মাত্র বাইশ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স ফাইনাল ইয়ারে পড়ছে। কৈশোর থেকেই তার বাড়িপালানোর স্বভাব। মাত্র তেরতে লোকালে চড়ে চলে যায় চট্টগ্রাম শহর। তাতেই সাহস গেল বেড়ে। তারপর থেকে হাতে টাকা-পয়সা এলেই বাড়ির কাউকে কিছু না জানিয়ে চম্পট দিত। কখনো চট্টগ্রাম, কখনো কক্সবাজার, কখনোবা ঢাকা।

সে-বার আন্তঃনগর এক্সপ্রেসে ঢাকায় এসে উঠল কমলাপুর সর্দার কলোনিতে, গ্রামের দূরসম্পর্কের এক চাচাতো ভাইয়ের মেসে। থাকল দুদিন। তৃতীয়দিন ফেরার জন্য কমলাপুর স্টেশনে গেলে তার মনে হলো, লঞ্চ-

ইস্টিমারের কথা কেবল বই-পুস্তকে পড়েছে, জীবনে কখনো চোখে দেখেনি, এবার না দেখে ফিরবে না। মুহূর্ত দেরি না করে রিকশায় গুলিস্তান গিয়ে চড়ে বসল সদরঘাটের বাসে। লঞ্চে উঠে ঘুরে ঘুরে মনের সাধ মিটিয়ে ডেক, কেবিন, মাস্টার কেবিন, ছাদ সব দেখতে লাগল। ভুলে গেল নামার কথা। হঠাৎ লঞ্চ দিল ছেড়ে। একটুও মন খারাপ হলো না তার। ছেড়ে দিয়েছে তো কী হয়েছে, লঞ্চ তো আর সাগরে ডুব দেওয়ার জন্য যাচ্ছে না। পকেটে টাকা যা আছে তাতে অনায়াসে আরো দশ-বারোদিন চলা যাবে। ভেবেছিল চাঁদপুর নেমে যাবে, কিন্তু চাঁদপুর ঘাট ধরল না লঞ্চ। পরদিন সকালে পৌঁছল ভোলায়। ডেকে খাতির জমিয়ে তুলেছে চর কুকরী মুকরীর এবাদুল নামের এক যাত্রীর সঙ্গে। তাবলিগ জামায়াতের টঙ্গির এজতেমা থেকে ফিরছিল এবাদুল। ঘাটে নামার পর এবাদুল বলল, চলুন না আমাদের বাড়ি। নির্দ্বিধায় নেহাল বলল, আমার কোনো আপত্তি নেই।

মেঘনা ও তেঁতুলিয়া নদীর মোহনায় জেগে ওঠা নয়নাভিরাম দ্বীপ চর কুকরী মুকরীর হদিস তখনো পর্যটকরা পায়নি। পেলেও দুর্বল যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে কেউ যেত না। দ্বীপজুড়ে ছিল নারিকেল, বাঁশ, বেত, সুন্দরী, গেওয়া ও পশুরের বন। বনে ছিল বানর শেয়াল উদবিড়াল বনবিড়াল গুঁইসাপ বেজি কচ্ছপ ও সাপ। আর ছিল বক শঙ্খচিল মথুরা কাঠময়ূর কোয়েলসহ নানা প্রজাতির পাখি। চর কুকরী মুকরী তো নয়ই, চরফ্যাশনেও তখনো বিদ্যুৎ যায়নি। কোনো হোটেল-মোটেলও ছিল না। কখনো কোনো পর্যটক গেলে তাঁবু গেড়ে রাত কাটাত। জনসংখ্যা তখন বড়জোর হাজারখানেক; মাছ ধরাই ছিল যাদের একমাত্র পেশা।

এবাদুলের বাড়িতেই উঠেছিল নেহাল। এখনো মনে আছে তার আতিথ্যের কথা। দেশ-বিদেশের কত জায়গায় ভ্রমণ করেছে নেহাল, কত মানুষ দেখেছে, কিন্তু এবাদুলের মতো এমন অতিথিপরায়ণ মানুষ দ্বিতীয়টি দেখেনি। শুধু এবাদুল কেন, চর কুকরী মুকরীর প্রতিটি মানুষের কাছে অতিথি-মেহমান ছিল সৌভাগ্যের প্রতীক। বাড়িতে অতিথি আসা মানে কোনো-না-কোনো সুসংবাদ আসা। তুলে রাখা শীতলপাটিটি বিছিয়ে দিত, কুঁড়ের সবচেয়ে বড় মোরগটি জবাই দিত, একটু সামর্থবান হলে খাসিটির মায়াও ছেড়ে দিত। মাছ তো তখন চরবাসীদের কাছে কচুপাতা। পুকুরে খালে নদী সমুদ্রে কেবল মাছ আর মাছ। ইয়াবার তো তখনো জন্মই হয়নি, ফেনসিডিল তো দূরান্ত, চরবাসীর কেউ কোনোদিন চোলাই মদের নাম শুনেছে কিনা সন্দেহ। খুনের কথা কেউ চিন্তাও করতে পারত না। ছিনতাই চুরি ডাকাতি তো ছিলই না, এসবের কথা জিজ্ঞেস করলে বলত, কালাপীরের চরে

কেউ চুরি-ডাকাতি করবে, তার কি প্রাণের মায়া নেই? দ্বীপজুড়ে দিন-রাত চরছে গরু-মোষ, কখনো চুরি হয়েছে এমন নজির নেই। কে করবে চুরি? করলেও চুরির মালটি নিয়ে তো তাকে নদী পাড়ি দিয়ে পালাতে হবে। তখন কি কালাপীর ছাড়বে? ডুবিয়ে মারবে না? কেউ মিথ্যা কথা বলবে? ঘুমের ঘোরে কালাপীর এসে তার জিবটা টেনে ছিঁড়ে ফেলবে না? ফাঁড়ির পুলিশদের কোনো কাজ ছিল না। কেউ তাদের কাজের কথা জিজ্ঞেস করলে ঠাট্টা করে বলত, বসে বসে মশা মারাই আমাদের ডিউটি।

নেহালের মনে আছে, যেদিন সে চর কুকরী মুকরী গেল তার পরদিন সকালে এবাদুল চলে গেল সাগরে। ঘরে মেহমান রেখে যেতে মন সাঁয় দিচ্ছিল না তার। কিন্তু না গিয়ে উপায় ছিল না। টানা সাতদিন সে দ্বীনের কাজে ঢাকায়। ঘরে নুন আছে তো মরিচ নেই হাল। যাওয়ার সময় নেহালকে বলে গেল, কোনো চিন্তা করবেন না, আমি সন্ধ্যার আগে ফিরে আসব, আপনি যতটা পারেন চরটা ঘুরে দেখুন।

আলুভর্তা দিয়ে এক বাসন পান্তাভাত খেয়ে এবাদুলের ছোট ভাই রফিকের সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল নেহাল। সমুদ্রে তখন ভাটা। ভাড়ানি খালে কাদা আর কাদা। সাঁকো পার হয়ে হরিণ দেখার আশায় দুজন ঢুকে পড়ল কালীর চরের জঙ্গলে। ঘণ্টাখানেক ঘোরাঘুরির পর পেশাব করতে বসল নেহাল। উঠে দেখে রফিক উধাও। নেহাল তাকে উত্তরে খোঁজে। নেই। দক্ষিণে খোঁজে। নেই। পুবে-পশ্চিমে খোঁজে। নেই। কোথায় গেল রফিক? তার নাম ধরে ডাকতে পারে। কিন্তু ডাক শুনে যদি দস্যু-ডাকাতেরা হাজির হয়! এবাদুল যতই বলুক, এই ঘোর জঙ্গলে দস্যু-ডাকাত না থেকে পারে না।

রফিককে খুঁজতে খুঁজতে এবাদুল পৌঁছে গেল জঙ্গলের পূর্ব সীমানায়, যেখানে সমুদ্রের ঢেউ আছড়ে পড়ছে সৈকতে। জোয়ার শুরু হয়ে গেছে ততক্ষণে। নোনা পানি ধুয়ে দিচ্ছে গেওয়া-সুন্দরীর শ্বাসমূল। যতদূর চোখ যায় পানি আর পানি, ঢেউ আর ঢেউ। জলে নৌকাগুলো ভাসছে, গাংচিলেরা উড়ছে। দুর্বায় ঢাকা মাঠে গেওয়ার একটা গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বসল নেহাল। শরীরে এমনই ক্লান্তি, খানিকের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল।

দুপুর প্রায় সাড়ে বারোটার দিকে রফিকের ডাকে তার ঘুম ভাঙে। চোখ খুলে দেখে, চোখেমুখে বিস্ময় নিয়ে রফিক তার দিকে তাকিয়ে। নেহাল ভাবে, তাকে খুঁজে পাওয়ায় বুঝি রফিক বিস্মিত। কিন্তু না, তার বিস্ময় কালাপীরের কেরামতি দেখে। কালাপীর এভাবেই বনে-জঙ্গলে মানুষকে ঘুম পাড়িয়ে রাখেন।

ঘুমানোর আগে নিশ্চয়ই ফুলের গন্ধ পেয়েছিলেন? জানতে চাইল রফিক।

নেহাল বলল, বাগানে ফুলের গন্ধ পাওয়াটাই তো স্বাভাবিক।

না না ভাইজান, মোটেই স্বাভাবিক নয়। ওই ঘ্রাণ কালাপীরের।

নাদান রফিকের নাদানি দেখে নেহাল হাসি পায়। তবে হাসির অন্তরালে খানিক ভয়ও জাগে। তার ধারণা কালাপীর বুঝি চট্টগ্রামের মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফের পীরের মতো বড় কোনো পীর, যার খানকা এ জঙ্গলেই। সে জানতে চাইল, কালাপীর কোথায় থাকেন?

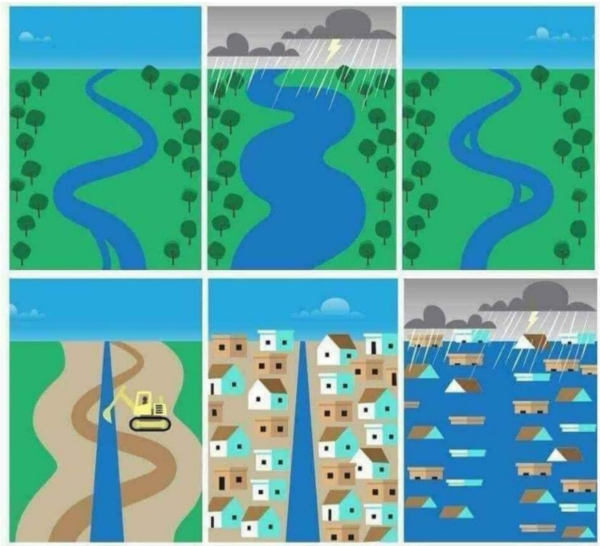

দ্বিগুণ বিস্ময়ে রফিক বলল, আপনি দেখি কিচ্ছু জানেন না! আশেপাশে নিশ্চয়ই কোথাও কালাপীর আছেন। আপনার কথা তার কানে গেলে তিনি গোস্বা করবেন।

গোস্বা করার কী আছে! আমি তো খারাপ কিছু বলিনি।

নেহালের সামনে হাঁটুগেড়ে বসল রফিক। এক হাতে নেহালের মুখটা চেপে ধরে আরেক হাতের তর্জনীটা নিজের ঠোঁটের ওপর খাড়া করে ফিসফিসিয়ে বলল, চুপ! রফিকের কাণ্ড দেখে নেহালের ভয় গেল বেড়ে। সেই সঙ্গে বাড়ল কৌতূহল– কালাপীর আসলে কে? তিনি থাকেন কোথায়? রফিককে নিয়ে সে তার খানকায় গিয়ে দেখা করতে চায়।

তার কথা শুনে রফিক খিলখিলিয়ে হাসে। হাসবে না? কালাপীরের সঙ্গে দেখা করতে চাওয়ার কথা শুনে তো চর কুকুরী মুকরীর নেংটা পিচ্চিটাও হাসবে। কালাপীরকে কেউ কোনোদিন দেখেছে? রফিক তো নয়ই, তার বাপ-দাদারও তো

সেই সৌভাগ্য হয়নি। শুধু তার বাপ-দাদা কেন, চর কুকরী মুকরীর কেউ কোনোদিন কালাপীরকে দেখেনি। কীভাবে দেখবে? তিনি তো গায়েবি পীর। পানি হয়ে পানির সঙ্গে, হাওয়া হয়ে হাওয়ার সঙ্গে আর গাছ হয়ে গাছের সঙ্গে মিশে থাকেন। পাখি হয়ে উড়ে বেড়ান, হরিণ হয়ে ঘুরে বেড়ান, গরু হয়ে দুধ দেন, সাপ হয়ে দংশন করেন। চর্মচক্ষে তাকে দেখার সাধ্য কি মাটির মানুষের! তার দাদা তো সেদিন পটুয়াখালির হরিপাড়া থেকে এখানে এসেছে। কালাপীর আসেন বহু বছর আগে, চর কুকরী মুকরী যখন ফিরিঙ্গিদের দখলে। ফিরিঙ্গিরা তো দস্যু ছিল। তাদের শায়েস্তা করতে সমুদ্রের উপর দিয়ে হেঁটে আসেন দয়াল বাবা কালাপীর। তার পদচ্ছাপে তুফান ওঠে সমুদ্রে। সেই তুফানে তলিয়ে যায় তামাম চর। ফিরিঙ্গিরা ভেসে যায় উত্তাল স্রোতে।

কিন্তু কালাপীর তো দয়ার সাগর। তার রোষ তো ফিরিঙ্গিদের উপর, চরের গাছবিরিক্ষি পশুপাখির উপর তো নয়। তাই বহু বছর পর তিনি আবার এলেন। একইভাবে, সমুদ্রের উপর দিয়ে হেঁটে। তার আঙুলের ইশারায় আবার জেগে উঠল চর। তার হুকুমে মাটি থেকে উঠে এল এক জোড়া কুকুর আর এক জোড়া মেকুর। ধীরে ধীরে আসতে লাগল অন্য পশুপাখিরাও। এই যে এখন জঙ্গলে এত হরিণ, এত শেয়াল, এত সাপ– সবাই তার হুকুমের গোলাম। এ কারণেই হরিণ মেরে খাওয়ার সাহস করে না মানুষ, মানুষকে দংশনের সাহস করে না সাপ। এই যে সারা বেলা জঙ্গলে ঘুরে বেড়াল নেহাল-রফিক, জঙ্গলে এত এত সাপের বসবাস, কই, একটা সাপ কি দেখা গেছে?

নেহাল বলল, এসব কি সত্যি কথা?

চোখজোড়া কপালে তুলে রফিক বলল, আশ্চর্য মানুষ তো ভাই আপনি! আমি মিথ্যা বললে রাতের বেলায় ঘুমের ঘোরে কালাপীর এসে এক টানে আমার জিবটা টেনে ছিঁড়ে সমুদ্রের মাছেদের খেতে দেবেন না!

খিদায় পেট জ্বলছে দুজনের। হরিণের আশা বাদ দিয়ে তারা বাড়ির পথ ধরল। হাঁটতে হাঁটতে নেহাল বলল, জোহরের অক্ত হয়েছে, আপনি নামাজ পড়বেন না?

এক গাল হেসে রফিক বলল, আমরা ভাই গরিব মানুষ, সারাদিন পেটের ধান্দায় থাকি, নামাজ পড়ার সময় কোথায়?

দ্বীপের কোথাও তো মসজিদ দেখলাম না।

না না, মসজিদ আছে দুটি। তবে পাঞ্জেগানায় মুসল্লি তেমন হয় না। বুঝেন না, সবাই তো কাজেকর্মে ব্যস্ত থাকে। তবে জুমার নামাজে কিন্তু দুই কাতার পূর্ণ হয়।

নামাজ না পড়লে আল্লাহ্ শাস্তি দেবেন না?

কী যে বলেন ভাই! কালাপীর আছেন কী জন্যে? হাশরের দিনে তিনি নবীপাকের অনুমতি নিয়ে গেওয়া গাছের তক্তা দিয়ে মস্ত একটা নৌকা বানাবেন। সেই নৌকা আকাশে উড়তে পারে, জলে ভাসতে পারে, মাটিতে চলতে পারে। সেই নৌকায় চড়ে তিনি তার ভক্তদের পুলসিরাত পার করে দেবেন।

বাড়ি ফিরে খেয়েদেয়ে ঘুমিয়ে পড়ল নেহাল। ঘুম ভাঙল সন্ধ্যার আগে, সূর্য যখন পাটে। দিনের ঘুমের কারণে রাতে আর ঘুম আসে না। বহু চেষ্টা করেও ঘুমাতে না পেরে সে বাইরে নামে। চাঁদ ধুয়ে দিচ্ছে চরাচরের অন্ধকার। সে হাঁটতে থাকে। রফিক তাকে বলেছে রাতের বেলায় মানুষ আর পশুপাখিরা যখন ঘুমায়, বন থেকে বেরিয়ে আসেন কালাপীর। রাতভর তিনি গ্রাম পাহারায় থাকেন। একবার ডাকাত ঢুকেছিল গ্রামে। কালাপীরের এমনই কেরামতি, পরদিন ভাড়ানি খালে পাওয়া গেল তাদের লাশ। সেই থেকে বাইরের চোর-ডাকাতরা এখানে আসার সাহস পায় না। কালাপীরকে এক নজর দেখার আশা জাগে নেহালের। হাঁটতে হাঁটতে সে দ্বীপের পশ্চিম মাথায় চলে যায়। ঘুরে আবার যায় পুব মাথায়। খানিক ভয় ভয় করে তার। সত্যি সত্যি কালাপীর যদি তার সামনে এসে দাঁড়ায়! ভয়টা চাড়া দিয়ে উঠলে এই বলে ভয় তাড়ায়, কালাপীর তো আর বাঘ-ভালুক নয় যে দেখা মাত্রই তাকে গিলে ফেলবে। রফিক তো বলেছে কালাপীর দয়ার সাগর।

নেহালের মনের কথা বুঝি টের পেয়েছিলেন কালাপীর। নইলে হঠাৎ করে চাঁদটা কোথায় গিয়েছিল? ধবধবে জ্যোৎস্নায় এমন অন্ধকার নেমেছিল কেন? অন্ধকারে পথ খুঁজে পাচ্ছিল না নেহাল। কোথায় নারিকেল বাগান, কোথায় চর কুকরী মুকরী বাজার, কোথায় প্রাইমারি স্কুল, কোথায় ভাড়ানি খাল, কোথায় লঞ্চঘাট, কোথায় এবাদুলদের বাড়ি– কিছুই ঠাওর করতে পারছিল না। অন্ধকারে হাঁতড়ে কাটা ধানের মাঠে নেমে খড়ের একটা গাদায় শুয়ে রাতটা কাটিয়ে দিয়েছিল। সকালে ঘটনা শুনে এবাদুলের ছোট বোন লিপি তো হাসতে হাসতে সারা। বলেছিল, আপনি কি পাগল! রাতের বেলায় কেউ ঘর থেকে বের হয়? আহা, কী যে সুশ্রী ছিল লিপি! চৌদ্দ-পনের বছরের শ্যামলা তরুণী। প্রথম দিন বেড়ার ফোঁকড়ে বারবার উঁকি দিয়ে নেহালকে দেখছিল। কতবার যে উঁকি দিয়েছে হিসাব নেই। রাতে ভাত-তরকারির বাটি নিয়ে তার সামনে এল। পরনে পুরনো সেলোয়ার-কামিজ। বেগানা পুরুষের সামনে এসে কোনো দ্বিধা নেই, সংকোচ নেই। বাটিটা রেখেই নেহালের মুখের দিকে তাকাল। নেহাল তাকাতেই মুচকি হেসে ভেতরের ঘরে চলে গেল। কী যে ছিল সেই হাসিতে, বহু বছর হাসিমাখা

মুখখানা সে ভুলতে পারেনি। মাস্টার্স শেষ করে রাশিদার প্রেমে না পড়লে হয়ত আরো বহু বছর মনে থাকত।

সম্পাদক ও চিফ রিপোর্টারের কথা শুনতে শুনতে খড়ের গাদায় কাটিয়ে দেওয়া রাতের কথা ভেবে নেহালের হাসি পায়। কত বোকাই না ছিল তখন! নিশ্চয়ই সে-রাতে মেঘে ঢাকা পড়েছিল চাঁদ। কিংবা সেদিন পূর্ণিমা ছিল না, নবমী বা দশমী ছিল। নবমী-দশমীতে তো সারা রাত থাকে না চাঁদ। চাঁদ না থাকলে অন্ধকার তো নামবেই। অথচ সেই অন্ধকারকে কালাপীরের কেরামতি মনে করে কী ভয়ই না পেয়েছিল!

নেহাল বলল, আমি সরেজমিনে যেতে চাই।

সম্পাদক বললেন, খারাপ হয় না। যাও, ঘুরে আস।

লঞ্চ ঘোষের হাট পৌঁছল পৌনে দশটায়। ঘাটে থামার সঙ্গে সঙ্গেই বেজে উঠল নেহালের মোবাইল ফোন। অচেনা নম্বর। রিসিভ করতেই বলল, আপনি কি নেমেছেন? আমি চরফ্যাশন থানা থেকে, এসপি স্যার পাঠিয়েছেন।

সমর এতটা করবে আশা করেনি নেহাল। ফোন করে জানিয়ে দিয়েছিল, যাওয়ার পথে নয়, ফেরার পথে ভোলা হয়ে যাবে এবং তখন দেখা হবে। চর কুকরী মুকরীর আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির কথা জানিয়ে সাবধানে থাকতে বলেছিল সমর। আর বলেছিল, এলাকার মানুষ নতুন একটা পুলিশ ফাঁড়ি স্থাপনের দাবি জানাচ্ছে। একটা ফাঁড়ি তো আছেই, আরেকটা ফাঁড়ির আদৌ প্রয়োজন আছে কিনা নেহাল যেন সার্বিক পরিস্থিত অবজার্ভ করে তাকে জানায়। দুষ্টুমি করে নেহাল বলেছিল, আমি কি ব্যাটা পুলিশের লোক? ফাঁড়ির প্রয়োজন আছে কি নেই তার কী বুঝব আমি? সমরও কম যায় না। সে বলেছিল, তুমি তো খোকাবাবু, ফিডার খাও। সকালে তোমার জন্য ফিডার পাঠিয়ে দেব এক বোতল।

একটা মাইক্রোবাস পাঠিয়েছে সমর। সঙ্গে ড্রাইভার ও দুই কনস্টেবল। নেহালকে নিরাপদে কচ্ছপিয়া ঘাটে পৌঁছে দেওয়ার নির্দেশ তাদের ওপর। ঘাটের এক হোটেলে চা-পরোটা খেয়ে গাড়িতে উঠল নেহাল। সাড়ে এগারটার মধ্যে পৌঁছে গেল কচ্ছপিয়ায়। স্পিডবোট ঘাটেই ছিল, থানা থেকে ফোন করে আগেই ঠিক করে রাখা। ভাড়ার ব্যাপারে জানতে চাইলে এক কনস্টেবল বলল, ভাড়া লাগবে না স্যার।

কেন কেন?

আপনি ওঠেন তো স্যার। আমি দিয়ে দিচ্ছি।

না! একদম না! ভাড়া আমি দেব।

কনস্টেবল হেসে বলল, ওকে স্যার। আমার নম্বরটি রাখুন। কোনো প্রবলেম হলে রিং দেবেন। আমি চর কুকরীর ইনচার্জকে আপনার কথা বলে রেখেছি।

এই তো সর্বনাশটা করলেন।

কেন স্যার?

পুলিশ প্রটোকলে থাকলে তো দ্বীপের পরিস্থিতির কিছুই বুঝতে পারব না। আপনি এক্ষুণি ফোন করে বলে দিন আমি যাচ্ছি না, জরুরি কাজে প্রোগ্রাম বাতিল করেছি।

কনস্টেবল তাই জানাল। কেননা স্যারের বন্ধুর কথা মানে তো স্যারেরই কথা। নেহাল বোটে উঠলে কনস্টেবল জানিয়ে দিল যে, ফেরার দিনও তারা ঘাটে অপেক্ষা করবে এবং এই গাড়িতে করেই নেহালকে ভোলায় পৌঁছে দেবে। আপত্তি করল না নেহাল। কারণ কচ্ছপিয়া থেকে ভোলার দূরত্ব কম নয়, প্রায় দেড় শ কিলোমিটার। তাও ডাইরেক্ট কোনো বাস নেই। কচ্ছপিয়া থেকে অটোরিকশায় চরফ্যাশন, তারপর বাস। এত ঝামেলার চেয়ে মাইক্রোবাসই ভালো।

মাত্র পঁচিশ মিনিটে গন্তব্যে পৌঁছে গেল স্পিডবোট। ভাড়ানি খালে তখন জোয়ার। ভাড়া মিটিয়ে ব্যাগটা কাঁধে নিয়ে ঘাটে নামল নেহাল। তার মনে পড়ে, পঁচিশ বছর আগে এবাদুলের সঙ্গে ঠিক এই ঘাটেই লঞ্চ থেকে নেমেছিল। ঘাটে তখন দোকান-পাট কিছুই ছিল না, এখন পাঁচ-সাতটা দোকান, পাকা মসজিদ, টিনশেড খারেজি মাদ্রাসা, মোবাইল কোম্পানির দুটি বিশাল টাওয়ার। রাস্তাঘাট তখন ছিল কাঁচা, এখন পিচঢালা। তখন যানবাহন বলতে ছিল শুধুই সাইকেল, এখন রাস্তা দখল করে আছে অটোরিকশার বহর। বুড়া গৌরাঙ্গ নদীর ওপর ব্রিজটা হবে হবে করেও হচ্ছে না। হলে তো আর কথা নেই, বাস-ট্রাক-লরি সব শাঁই শাঁই করে ঢুকে পড়বে।

হাঁটতে হাঁটতে রিসোর্টের গেটে আসে নেহাল। চার তলা বিশাল ভবন। স্থলভাগ থেকে বিচ্ছিন্ন এমন একটা দ্বীপে এমন বিলাসবহুল রিসোর্ট থাকার কথা সে ভাবেনি। রিসোর্ট বুকিং দিয়েছে পত্রিকার চরফ্যাশন প্রতিনিধি। ভালোমন্দ কিছু জিজ্ঞেস করেনি নেহাল। ভ্রমণে গিয়ে থাকা-খাওয়া নিয়ে তার এত ভাবনা নেই। রাত কাটানোর মতো একটা জায়গা আর বেঁচে থাকার মতো দুটো ডাল-ভাত হলেই তার চলে।

তাকে রুমে নিয়ে গেল কেয়ারটেকার। বিশাল কক্ষ। সেগুনের খাট, ড্রেসিং টেবিল, আলমিরা, টি-টেবিল, চেয়ার, সোফা, এসি– কী নেই? শুধু বিদ্যুৎটা

নেই। তার বদলে সোলার প্যানেল। হয়ত কয়েক বছরের মধ্যে বিদ্যুৎও পৌঁছে যাবে। নেহাল ভাবে, দেশটা আসলেই উন্নত হয়েছে। কোথায় কতদূরের বঙ্গোপসাগরের ছোট্ট দ্বীপ চর কুকরী মুকরীতেও কিনা আছড়ে পড়ছে উন্নয়নের ঢেউ!

ডাইনিংয়ে খাবার প্রস্তুত ছিল। খেয়ে রুমে ফিরে শুয়ে শুয়ে খানিকক্ষণ *পাওয়ার অব মিথের* কয়েক পৃষ্ঠা পড়ে বেরিয়ে পড়ল এবাদুলের খোঁজে। বাড়িটা চিনতে অসুবিধা হলো না। শনের বদলে ঘরের চালে এখন টিন উঠেছে, কুপির বদলে বসেছে সোলার প্যানেল। উঠোনে দাঁড়িয়ে এবাদুলের নাম ধরে ডাক দিল। ভেতর থেকে কারো সাড়াশব্দ পেল না। রফিকের নাম ধরে ডাক দিল। এবার দরজার একটা কপাট খুলে গেল। কপাটের আড়াল থেকে এক মহিলা জানাল, রফিক বাড়ি নেই, তাবলিগের চিল্লায় গেছে। নেহাল ভাবল, মহিলা নিশ্চয়ই এবাদুলের বউ। নাকি রফিকের বউ?

আপনি কি ভাবী? মানে এবাদুল ভাইয়ের ওয়াইফ?

জি। মহিলার ক্ষীণকণ্ঠের জবাব।

এবাদুল ভাই কোথায়?

বরিশাল গেছেন, জালালপুরী মাওলানার ওয়াজ মাহফিলে।

নিজের পরিচয় দেয় নেহাল। পঁচিশ বছর আগে এই বাড়িতে আসার কথা জানায়। মহিলা নিশ্চুপ। নেহাল ভাবে, নিশ্চয় তার কথা ভুলে গেছে এবাদুলের বউ। যাওয়ারই কথা। পঁচিশ বছর কি কম সময়? এবাদুলের বউকে একনজর দেখার খুব ইচ্ছে জাগে তার। সে কয়েক পা এগিয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে এবাদুলের বউ খানিকটা পিছিয়ে যায়। ফলে আর আগায় না সে। লিপি কেমন আছে, বিয়ে হয়েছে কোথায়, ছেলেমেয়ে কজন ইত্যাদি জানতে চায়। ঠাণ্ডা গলায় উত্তর দেয় মহিলা। নেহাল কিছু কথা শোনে, কিছু তার কান এড়িয়ে যায়। এড়িয়ে যায়, কারণ তার অবাক লাগে, বাইরে সে এতক্ষণ দাঁড়িয়ে, অথচ এবাদুলের বউ কিনা একটিবার তাকে ভেতরে বসার কথা বলছে না! বাড়িতে পুরুষ কেউ নেই বলেই কি অচেনা মানুষকে ঘরে বসতে বলার সাহস পাচ্ছে না সে? হতে পারে। কিন্তু এমন তো ছিল না সে। নেহাল তো সে-বার পাঁচ দিন ছিল। এক রাতেও তো দরজার সিটকিনিটা লাগানো হয়নি। কী যে আন্তরিক ছিল এবাদুলের বউ! নিঃসঙ্কোচে তার সামনে এসেছে, ভাত-তরকারি বেড়ে দিয়েছে, বাপের বাড়ির গল্প করেছে।

তখন উত্তরে দক্ষিণে পুবে পশ্চিমে বেজে উঠল মাইক। শুরু হলো আসরের আজান। আজানের ভেতর সেঁধিয়ে যেতে লাগল আজান। এবাদুলের বউ জানাল

সে এখন নামাজে যাবে। এবাদুল কবে ফিরবে জানতে চাইল নেহাল। জবাব না দিয়ে চট করে কপাটটা লাগিয়ে দিল এবাদুলের বউ। নেহাল আর দাঁড়াল না, উঠোন পেরিয়ে পাকা রাস্তায় উঠল। রাস্তাটা চলে গেছে পুবে বেড়িবাঁধের দিকে। সেদিকেই হাঁটতে লাগল সে। একটা নৌকা ভাড়া করে কালীর চর যাবে, যে চরের জঙ্গলে একদিন রফিককে খুঁজতে খুঁজতে ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়েছিল। বিকেলটা ওখানেই কাটাবে। রফিক তাকে বলেছিল কালীর চরের বিকেল নাকি খুব মনোরম।

নেহাল বেড়িবাঁধে উঠলে সামনে দাঁড়াল একটা লোক। হাতে দুই হালি জ্যান্ত বক। বকগুলো নেহাল কিনবে কিনা জানতে চাইল। নেহালের অনীহা দেখে বাজারের দিকে হাঁটা ধরল লোকটি। নেহালও আবার হাঁটা ধরে। পঁচিশ বছর আগের এমনই এক বিকেলের কথা মনে পড়ে তার। এক জেলে জঙ্গল থেকে একটা কোয়েল ধরে এনে বেড়িবাঁধে বসে তার পায়ে একটা সুতলি বাঁধছিল। কোয়েলটা ছিঁ-ছিঁ করে ডাকছিল আর মুক্তির আশায় ছটফট করছিল। নেহালের মায়া হলো খুব। সে বলল, পাখিটা কষ্ট পাচ্ছে ভাই, ছেড়ে দিন। নইলে কালাপীর গোস্বা হবেন। মুহূর্তও দেরি না করে ছেড়ে দিল লোকটা। তার মুখের দিকে তাকাল নেহাল। উড়ন্ত পাখিটার দিকে তাকিয়ে লোকটা হাসছে। চোখেমুখে অনাবিল প্রশান্তি।

মাঝির সঙ্গে দরদাম ঠিক করে নৌকায় উঠে গলুইতে গামছাটা বিছিয়ে বসল নেহাল। মাঝিকে বলল প্রথমে যেন নারিকেল বাগান যায়, তারপর কালীর চর। মাঝি জানায় যে, ঐ চরের নাম এখন চর জালাল। বছর পাঁচ আগে খোদ মাওলানা এনায়েত আলী জালালপুরী নিজের নামে এই চরের নাম রেখেছেন। নেহালের কৌতূহল জাগে। মাঝির কাছে সে জালালপুরীর কথা জানতে চায়। জালালপুরী কত বড় মাওলানা, কত মস্ত তার পাগড়ি, মিশরের কোন মাদ্রাসায় পড়ালেখা করেছেন, এ দ্বীপে তার কত শত মুরিদ, প্রতি বছর চর কুকরী মুকরী দারুল উলুম মাদ্রাসার বার্ষিক ওয়াজ মাহফিলে এসে কতদিন থাকেন, কোথায় থাকেন, দলে দলে মানুষ তার হাতে হাত রেখে কীভাবে বাইয়াত নেয়...এসবের সংক্ষিপ্ত একটা বর্ণনা দেয় মাঝি।

নৌকা চলতে থাকে। নেহালের চোখ খালের দিকে। পানিতে ভাসছে ডাবের অসংখ্য খোসা, মিনারেল ওয়াটারের বোতল আর চিপসের প্যাকেট। হায় হায়! মাথা দোলায় আর আফসোস করে নেহাল। মোবাইল ফোনের ক্যামেরা অন করে ছবি তোলে। মাঝি তাকে হুঁশিয়ার করে যে সঙ্গে মোবাইল আনা উচিত হয়নি। দেখে মনে হচ্ছে দামি সেট। এনেছে যেহেতু পকেটেই রাখুক। দস্যু-ডাকাতদের

তো বিশ্বাস নেই। মাঝির কথা গুরুত্ব দেয় না নেহাল। গলুইতে দাঁড়িয়ে সে ছবির পর ছবি তোলে।

সব ঘুরেটুরে ফিরতে ফিরতে সাতটা বেজে গেল। রাস্তা-ঘাট অন্ধকার। মোবাইল ফোনের টর্চই ভরসা। রিসোর্টের দিকে হাঁটতে হাঁটতে রাস্তার ধারে একটা ঘুমটি দোকান দেখে থামল নেহাল। চায়ের তেষ্টা পেয়েছে খুব। ভেতরে সতের-আঠার বছরের তরুণ দোকানি। উচ্চস্বরে কথা বলছে মোবাইল ফোনে। বাইরে বাঁশের মাচায় বসল নেহাল। ছেলেটার কথা শেষ হলে এক কাপ চা দিতে বলল। পানি গরম ছিল। ঝটপট চা করে দিল ছেলেটা। খেতে খেতে তার নাম জানতে চাইল নেহাল। ছেলেটা মোবাইল ফোন নিয়ে ব্যস্ত। হয়ত কারো নম্বর খুঁজছে। খানিক পর মোবাইলটি ক্যাশবক্সে রেখে সে বাইরে তাকাল। নেহাল বলল, তোমার বাড়ি কি এখানেই?

তো উড়িচ্চর? রুখু গলায় পাল্টা প্রশ্ন করল তরুণ। নেহাল ভাবল, ছেলেটা হয়ত কারো উপর রেগে আছে, ফোনে হয়ত এতক্ষণ তাকেই বকাঝকা করেছে। কাপ খালি করে মানিব্যাগ থেকে পাঁচ টাকার একটা নোট বাড়িয়ে ধরে বলল, আচ্ছা, তুমি কি কালাপীরের নাম শুনেছ?

কালাপীর আবার কেডা? আগের মতোই ছেলেটার রুখু গলা।

বাবা-মায়ের কাছে কালাপীরের নাম শোনোনি?

না। আমার বাবা ওসব পীর-ফকিরে বিশ্বাস করে না।

ছেলেটার মোবাইল ফোন বেজে ওঠে। নেহাল আর দাঁড়ায় না। রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরায়। আকাশের দিকে তাকিয়ে ধোঁয়া ছাড়ে। তারা ভরা আকাশ। একটু পর ষষ্ঠদশী চাঁদ উঠবে। হঠাৎ পায়ের শব্দ পেয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনে তাকায়। গায়ে শার্ট, পরনে লুঙ্গি, মুখে কালো দাড়িঅলা মধ্যবয়সী একটা লোক তার কাছে গ্যাস লাইট আছে কিনা জানতে চায়। নেহালের সন্দেহ জাগে। দোকানের সামনেই তো গ্যাসলাইট সুতায় ঝুলানো, ওটা দিয়েই সিগারেট ধরাতে পারে লোকটা, তার কাছে চাইছে কেন? নিশ্চয়ই কোনো মতলবে আছে। তবু পকেট থেকে লাইটার বের করে তার সিগারেটটিতে আগুন ধরিয়ে দেয়। সিগারেটে টান দিয়ে লোকটা ধোঁয়া ছাড়ে। তার যাওয়ার অপেক্ষা করে নেহাল। লোকটি নড়ে না। মনের সন্দেহটা দূর করে তার সঙ্গে আলাপ শুরু করে নেহাল। বলে যে আজই সে ঢাকা থেকে এসেছে, চার দিন থাকার ইচ্ছে। তার কথার দিকে লোকটির খেয়াল নেই। ভাবটা এমন, নেহাল ঢাকা থেকে এসেছে, না দিল্লি থেকে এসেছে, তাতে তার কী?

নেহাল বলল, আপনার নামটা কি জানতে পারি?

ইলিয়াস। বলেই আবার সিগারেটে টান দিল।

আচ্ছা ভাই, আপনি কি কালাপীরের নাম শুনেছেন?

বাপ-দাদার মুখে শুনেছি। বোগাস কথা।

বোগাস কথা!

তা ছাড়া কী? ওসব আগের দিনের গাঁজাখোরি গল্প।

পঁচিশ বছর আগে চর কুকরী মুকরী ভ্রমণের কথা জানিয়ে নেহাল বলল, তখন তো এখানকার মানুষ কালাপীরের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা রাখত, তার নামে শিরনি দিত।

খানিক হেসে ইলিয়াস বলল, সেদিন কি আর আছে ভাইসাব? মানুষ এখন শিক্ষিত হয়েছে না? তখন তো চরে মাদ্রাসা ছিল মোটে একটি, মাশাল্লাহ এখন বারোটি মাদ্রাসা আর তিনটি স্কুল। ওসব কুসংস্কার কি এখন আর কেউ বিশ্বাস করে? কালাপীরের নামে কেউ এখন শিরনি দিলে জালালপুরীর মুরিদেরা তাকে সমাজ ছাড়া করবে। ওসব বেশরা-বেদাতি কাজ কেউ করে না এখন।

নেহালের কানের কাছে মশারা ভন ভন করে। আর দাঁড়াতে ইচ্ছে করে না তার। ইলিয়াসের কাছে জানতে চায় সে চর কুকরী বাজারে যাবে কিনা। ইলিয়াস বলে যে সে ওদিকেই যাবে। দুজন হাঁটতে থাকে বাজারের দিকে। এশার আজান শুরু হয় মসজিদে মসজিদে। আজানের ভেতর সেঁধিয়ে যেতে থাকে আজান। ইলিয়াস জানায় যে চর কুকরী মুকরীতে এখন সতেরটি পাকা মসজিদ। বাকি পাঁচটি টিনের হলেও কয়েক বছরের মধ্যেই পাকা হয়ে যাবে। সবই মাওলানা জালালপুরীর অবদান।

কথা বলতে বলতে তারা বাজারে পৌঁছে। নেহালকে অপেক্ষা করতে বলে মসজিদের দিকে হাঁটা ধরে ইলিয়াস। দোকানগুলোর ঝাঁপ পড়তে থাকে, দোকানিরা ছুটতে থাকে মসজিদের দিকে। ইলিয়াস বলেছে, বাজারের এই নিয়ম, আজান পড়লে দোকান বন্ধ করে সবাইকে মসজিদে যেতে হবে। নইলে জালালপুরীর মুরিদেরা এসে দোকান বন্ধ করে দেবে। নেহাল ভেবে পায় না, যে দ্বীপে বাইশটি জামে মসজিদ, বারোটি খারেজি মাদ্রাসা, যে দ্বীপের বেশিরভাগ মানুষ ধর্মকর্মে সিরিয়াস, ঘরে ঘরে শরিয়তপন্থী মাওলানা এনায়েত আলী জালালপুরীর ভক্ত, সেই দ্বীপের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির এত অবনতি হয় কেমন করে!

ইলিয়াসের জন্য অপেক্ষা না করে রিসোর্টে ফিরে গেল নেহাল। কেয়ারটেকারকে ডেকে ন-টার মধ্যে খাবার রেডি করতে বলে দিল।

কেয়ারটেকার জানাল যে খাবার রেডি, নেহাল চাইলে এখুনি ডাইনিংয়ে গিয়ে খেয়ে আসতে পারে। দেরি করল না নেহাল। ডাল, করলা ভাজি, কোরাল মাছ আর দেশি মোরগ দিয়ে পেট ভরে খেল। একটা নৌকা ঠিক করে রাখতে বলেছিল কেয়ারটেকারকে। ভোরে ভোরে বেরোতে হবে কাল। দ্বীপের চারপাশটা একবার ঘুরে দেখবে। আবার কবে আসবে তার তো ঠিক নেই। আশপাশে দেখার মতো যত জায়গা আছে সবখানে যাবে। সব শ্রেণি-পেশার মানুষের সঙ্গে কথা বলে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির আসল কারণটা খুঁজে বের করতে হবে। কেয়ারটেকার জানাল যে মাঝির সঙ্গে সে পাকা কথা বলে রেখেছে। ভোর ঠিক পাঁচটায় সে ভাড়ানি খালের মুখে থাকবে।

ছাদে উঠে কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটি করল নেহাল। বারোটার আগে এসির জেনারেটর চালু হয় না। সারাদিনে মাত্র চার ঘন্টা চলে এসি– রাত বারোটা থেকে চারটা। সারারাত জেনারেটর চালাতে গেলে অনেক তেল লাগে। তাতে পোষায় না। ঠিক বারোটায় রুমে ফিরে এসিটা ছেড়ে *পাওয়ার অব মিথ* নিয়ে বিছানায় হেলান দিয়ে বসল। ২২০ পাতা পড়া হয়ে গেছে, আর মাত্র ১০০ পাতা বাকি, রাতেই শেষ করার ইচ্ছে। পড়তে পড়তে, রাত প্রায় দেড়টার দিকে ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘুম ভাঙল সকাল সোয়া ছ-টায়। মোবাইল ফোনটা হাতে নিয়ে দেখল অচেনা নম্বরের এগারোটি মিস্‌ডকল। নিশ্চয়ই মাঝির ফোন! খেয়ালই ছিল না

মোবাইলটা যে সাইলেন্ট করা ছিল। উঠে জানালার পর্দা সরিয়ে বাইরে তাকাল। শান্ত-স্নিগ্ধ ভোর। মার্চের সূর্য ধীরে ধীরে তাতছে। শূন্য দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে থাকে। কে জানে কী ভাবে। হয়ত মাঝির কথা, হয়ত এবাদুল বা লিপির কথা। হঠাৎ তার দৃষ্টি যায় দূর দক্ষিণে ভোরের রোদে চিকিয়ে ওঠা সমুদ্রের দিকে। সাদা আলখাল্লা পরা একটা লোক হেঁটে চলেছে পানির ওপর দিয়ে। হাঁটছে তো হাঁটছেই। একটিবার পেছনে তাকাচ্ছে না। কে লোকটা? কালাপীর? নেহালের হাসি পায়। সব মনের ধন্দ। মন কত কী যে ভাবে! সেসব ভাবনা কিনা দৃশ্য হয়ে চোখেও ভাসে!

খাটের কম্বলটা সরিয়ে *পাওয়ার অব মিথ* বইটা হাতে নেয়। নেড়েচেড়ে দেখে। দেখতে দেখতে হঠাৎ কী যে খেয়াল হয়, মোবাইলটা হাতে নিয়ে চরফ্যাশন থানার সেই কনস্টেবলের নম্বরে ফোন দেয়। ভেবেছিল এত তাড়াতাড়ি বুঝি জাগেনি কনস্টেবল। না, রিসিভ করল সে। নেহাল জানাল যে, সাড়ে ন-টা নাগাদ সে কচ্ছপিয়া ঘাটে থাকবে, সম্ভব হলে মাইক্রোবাসটি যেন পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

তারপর ব্যাগটা গুছিয়ে মুখ ধুয়ে ডাইনিংয়ে গিয়ে নাস্তা করল। বিলের কাগজ রেডি করতে বলল কেয়ারটেকারকে। কেয়ারটেকার ভেবে পায় না চার দিন থাকার কথা বলে দ্বিতীয় দিনেই কেন ফিরে যাচ্ছে নেহাল। মনের মতো সেবা পায়নি বুঝি! সে খানিক ঘাবড়ে যায়। সাংবাদিক মানুষ নেহাল। যদি রিসোর্ট কর্তৃপক্ষের কাছে তার বিরুদ্ধে নালিশ করে তখন চাকরিটা থাকবে কিনা সন্দেহ। শঙ্কিত গলায় সে বলল, কিন্তু স্যার, মাঝি তো বসে আছে, ঘুরতে যাবেন না?

না। নেহালের সংক্ষিপ্ত উত্তর।

সাড়ে আটটা নাগাদ বেরিয়ে পড়ল নেহাল। কনস্টেবল মাইক্রোবাস নিয়ে যথাসময়েই হাজির। ভোলায় পৌঁছল প্রায় তিনটায়। বাসায় তার জন্য অপেক্ষা করছিল সমর। সেও খুঁজে পাচ্ছিল না এত তাড়াতাড়ি নেহালের ফিরে আসার কারণ। নেহাল বাসায় ঢুকতেই সে কারণটা জানতে চাইল। উত্তর না দিয়ে নেহাল তার প্রচণ্ড খিদার কথা জানাল। সমর কি আর দ্বিতীয় প্রশ্ন করে! বন্ধুকে নিয়ে সোজা ডাইনিং টেবিলে চলে গেল। খেতে খেতে নেহাল বলল, একটি নয় সমর, চর কুকরী মুকরীতে অন্তত আরো তিনটি পুলিশফাঁড়ির প্রয়োজন।♦

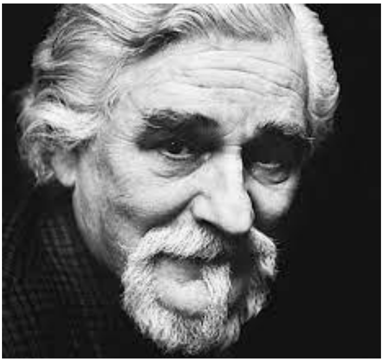

ফেয়াজ কায়াকান ফের্জার

আমির আজিজ

ফেয়াজ কায়াকান ফের্জার ও আমির আজিজ

ভারতীয় ও তার্কি দুই কবির কবিতা

গাজী সাইফুল ইসলাম

আমির আজিজ (Amir Aziz) তরুণ কবি জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়ার ছাত্র। তার কিছু কবিতা গত বছরের প্রথমার্ধ থেকে বেশ আলোচিত। বিশেষ করে তার 'Sab Yaad Rakha Jayega' কবিতাটি। বব ডিলান ও জনি ক্যাশের অনুকরণে

গত বছর কবিতাটির একটি আবৃত্তি ভিডিও প্রকাশ করেছিলেন কবি আমির আজিজ নিজে। মার্চ ২০১৯ পর্যন্ত সেই ভিডিওটি ২,৫০,০০০ দর্শক পায়।

‘উইকিলিকস’ এর প্রতিষ্ঠাতা জুলিয়ান অ্যাসেঞ্জ বর্তমানে ইংল্যান্ডের একটি কারাগারে বন্দি। সেখানে একদিকে আমেরিকার চাপে রাষ্ট্রীয়ভাবে তার বিচারের আয়োজন চলছে অন্যদিকে শত শত মানুষ, বিশেষ করে, কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, দার্শনিক, গায়ক, মানবতাবাদীরা তার মুক্তির জন্য রাস্তায় নামছে। তার মুক্তির দাবিতে শত শত প্রতিবাদকারী লন্ডনে সমবেত হচ্ছে। এমনি একটি জমায়েতে ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২০, ‘পিঙ্ক প্লয়েড’ ব্যান্ডের গিটারিস্ট, রক আইকন, জর্জ রজার ওয়াটারস আমির আজিজের কবিতাটির ইংরেজি ভার্সন আবৃত্তি করেন। এর আগে তিনি বলেন: আমরা এখানে সমবেত হয়েছি একটি বৈশ্বিক আন্দোলনে, এই ভঙ্গুর বিশ্বের জন্য খুবই দরকারী একটি আন্দোলনের ওপর আলোকপাত করার জন্য। তিনি আমির আজিজের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন: দিল্লির একজন তরুণ কবি, আন্দোলনকারী, যিনি লড়ছেন মোদী আর তার ফ্যাসিবাদী বৈষম্যমূলক নাগরিকত্ব আইনের বিরুদ্ধে। ‘পিঙ্ক প্লয়েড’ ইংলিশ ব্যান্ড কবিতাটির সঙ্গে নিচের ক’টি বাক্য যুক্ত করে: ‘তুমি পৃথিবীতে অবিচার রচনা করছ/ আমরা বিপ্লব রচনা করব আকাশে। সবকিছু মনে রাখা হবে। সবকিছু রেকর্ড হচ্ছে।’ এ যেন ফিলিস্তিনি কবি মাহমুদ দারবিশের ‘আইডেন্টি কার্ড’ কবিতার প্রতিধ্বনি। ‘পিঙ্ক প্লয়েড’-এর ওই আবৃত্তি ভিডিওটিও সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বজুড়ে ভাইরাল হয়ে যায়।

সবকিছু মনে রাখা হবে

মূল (উর্দু)– আমির আজিজ

ইংরেজি অনুবাদ: পিঙ্কপ্লয়েড

তুমি রাত রচনা কর, আমি রচনা করি চাঁদ।
যদি তুমি আমায় জেলে পুরে দাও, তবে আমি প্রাচীর ডিঙিয়ে লিখতে থাকব।
যদি তুমি আমার বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করো, তবে আমি লিখতে বসব
যে সব অবিচার থেকে দুর্ভোগ আমাদের।
যদি তুমি আমায় খুন করো, তবে আমি প্রেতাত্মা হয়ে ফিরব এবং লিখতে থাকব।
এবং তুমিই যে খুন করেছ সেই প্রমাণাদি হাজির করব।

যদি তুমি বিচারের নামে কোর্ট বসিয়ে তামাশা কর; তবে ন্যায় বিচার পাবার জন্য
আমরা দেয়াল ও রাস্তাগুলোও ‘কালি’ করব

যথেষ্ট উচ্চ স্বরে আমাদের দাবী ঘোষণা করব যাতে শ্রবণ প্রতিবন্ধীরাও শুনতে পায়।
যথেষ্ট পরিষ্কার হস্তাক্ষরে লিখব যাতে অন্ধরাও সে সব পড়তে পারে।
যদি তুমি কালো পদ্ম লিখ তবে আমি লাল গোলাপ লিখব।
যদি তুমি এ ধরায় আমাদের নিপীড়ক হও, তবে পরকালে তুমিও নিপীড়িত হবে।
সব মনে রাখা হবে। সবকিছুই মনে রাখা হবে।

সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু হয়েও তুমিই আমায় খুন করেছ লাঠি আর গুলি চালিয়ে;
সে সব স্মৃতি আমাদের ভাঙা বুক তুলে রাখবে।
সব মনে রাখা হবে। সবকিছু মনে রাখা হবে।
আমরা সকল মিথ্যাচারের 'কালি' করব, এটা আমরা ভালো জানি।
হয়তো আমাদের রক্ত দিয়েই এ স্পষ্ট সত্যটি লিখব এবং কোনোদিন তা প্রকাশও করব।
প্রকাশ্য দিবালোকে তোমরা টেলিফোন, ইন্টারনেটসহ সকল যোগাযোগ মাধ্যমে জনগণের প্রবেশে বাধা সৃষ্টি করছ
এবং এরপর পুরো শহরটিকে শীতল রাতের এক বন্দিশালা পরিণত করেছ;
হঠাৎ আমার বাড়ি-ঘরে অনধিকার প্রবেশ করেছ, ধ্বংস করেছ আমার ছোট্ট জীবন
আমার প্রিয়তম সন্তানকে রাস্তার মাঝে হত্যা করেছ
এবং এরপর যা কিছু ঘটেছে সে সম্পর্কে কোনো মনোপীড়ন ছাড়াই জনসমক্ষে তুমি হাসছ;
সব মনে রাখা হবে। সবকিছু মনে রাখা হবে।

দিনের বেলা তুমি মিষ্টি কথা বলো;
এবং এরপর জনতাকে আশ্বাস দাও যে,
সবকিছু ঠিকঠাক আর নিয়ন্ত্রণে আছে স্তব্ধ করে দিয়ে সকল সোচ্চার কণ্ঠ।
রাতের বেলা নিপীড়ন আর আক্রমণ করো লোকদের– যারা দাবি তোলে অধিকারের।
তোমরাই আক্রমণ করে আক্রমণকারীর দোষ চাপাও আমাদের ওপর। এসবই মনে রাখা হবে।
আমি আমার হাড়ের ওপর এইসব নির্মমতার ঘটনা খোদাই করব।
তুমি আমার জন্ম-পরিচয়ের দলিলাদি চাইছ।
জেনে রাখ, নিশ্চয়ই আমি আমার অস্তিত্বসংক্রান্ত সকল প্রমাণাদি দাখিল করব।

এই যুদ্ধে তোমাকে শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত লড়তে হবে
এবং এর সবই মনে রাখা হবে চিরদিনের মত।
তুমি যেভাবে দেশের মানুষকে বিভক্ত করার উদ্যোগ নিয়েছো–এটাও মনে রাখা হবে
আর জনতাকে ঐক্যবদ্ধ করার আমাদের যে উদ্যোগ আর প্রচেষ্টা তাও মনে রাখা হবে।
এবং যখন আলোচনা হবে 'কাপুরুষোচিত' কর্ম সম্পর্কে, তোমার কর্ম উদাহরণ হিসেবে সামনে আসবে।
এবং যখন আলোচনা হবে জীবনের চলার পথ সম্পর্কে, আমাদের নামগুলো সামনে আসবে।
অবশ্যই তখন আলোচিত হবে কিছু লোক যে দৃঢ় মনোভাবাপন্ন ছিল।
যে সব লোক নীতি-আদর্শে অটল তাদের নীতিচ্যুৎ করার জন্য, দরকার হলে, তোমরা হাতুড়ি চালাও
কিছু লোক বশ্যতা মানে না, বিক্রি হয় না, যেমন তোমরা হও।

কিছু লোক অসম্ভব পরিস্থিতিতেও দাঁড়িয়ে থাকে
কিছু লোক তাদের মৃত্যু সংবাদ শুনেও জীবিত থাকে।
চোখ তার পলক ফেলতে ভুল করতে পারে;
জগৎ তার সঠিক অবস্থানে ঘুরতে ভুল করতে পারে;
কিন্তু আমাদের স্বাধীনতা ছিনিয়ে নেওয়ার তোমার প্রচেষ্টা সফল;
দুরাত্মার প্রতিধ্বনি সর্বদা মনে রাখা হবে।

সুতরাং তোমার নাম নিয়ে লোকেরা চিরদিন তোমাকে অভিশাপ দিতে থাকবে;
তোমার মৃতদেহের প্রতি অসম্মান করবে ঘৃণার কালো কালি ছুঁড়ে।
তোমার নাম, দেহাবয়বের উপস্থিতি কোনোদিন কেউ ভুলবে না।
এর সব কিছুই চিরকাল মনে রাখা হবে।

(কবিতার অনুবাদ- গাজী সাইফুল ইসলাম)

ফেয়াজ কায়াকান ফের্জারঃ তার্কির কবি, লেখক ও অনুবাদক

ফেয়াজ কায়াকান ফের্জার (Feyyaz Kayacan Fergar)ঃ তার্কি কবি, লেখক ও অনুবাদক। কিন্তু সারাজীবন ফ্রান্স প্রবাসে কাটিয়েছেন। ফ্রেন্স ভাষায় তার কবিতা ইংল্যান্ডে প্রকাশিত হলে তিনি ১৯৮০ সালে ব্রিটিশ পরাবাস্তববাদী গ্রুপে যোগ

দেন। তার্কিশ, ব্রিটিশ ও ফ্রেন্স ভাষায় সমান দক্ষ এই অনুবাদক তিনটি ভাষাকেই সমানভাবে সমৃদ্ধ করেছেন তাঁর অনুবাদ দ্বারা। এ জন্য তাঁকে ট্রিলিঙ্গুয়াল লেখক বলা হতো। ‘মিসেস ভ্যালিস ওয়ার: দ্য শেলটার স্টোরিজ অব ফেয়াজ কায়াকান ফের্জার’, ’দ্য ব্রাইট ইজ ডার্ক ইনাফ’ অ্যা টেল ফর শ্রোডস তার্কিতে ফেয়াজের লেখা খুবই উল্লেখযোগ্যবই, পাওয়া যায় অ্যামাজন.কম-এ। তাঁর অনূদিত সাহিত্য কর্মের অন্যতম কাজ হলো, অকতাই রিফাতের ‘সিলেক্টেট পোয়েমস’, পোয়েমস অব ক্যান ইউসিল ইত্যাদি। উল্লেখ্য যে, তাঁর স্ত্রী জোলা তার্কির খুবই নন্দিত চিত্র শিল্পী। সৃজনশীল ও অনুবাদ কর্মে তার উদ্যম উৎসাহ জাগানিয়া। সম্প্রতি এই কবি ইন্তেকাল করেছেন। সম্পাদনা করেছেন: মডার্ন তার্কিশ প্রোয়েট্রি।

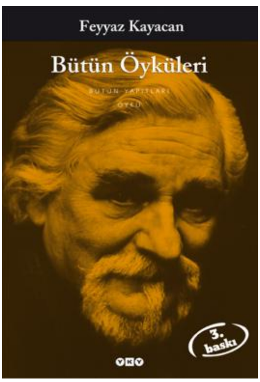

ফেয়াজ কায়াকান ফের্জার-এর বইয়ের প্রচ্ছদ

ভালোবাসি একজন পথিকের মত

কখনো আমি তোমায় ভালোবাসিনি
কখনো আমি তোমায় ভালোবাসিনি।
ভালোবেসেছিলাম, যখন দু’জন
গান গেয়েছিলাম ক্লান্তরাতের তীরে।
ভালোবেসেছিলাম, যখন তুমি
হাসতে ফুলের সঙ্গে,
ভালোবেসেছিলাম, যখন তোমার
চোখ ছিল ফুটন্ত গোলাপের মতো।
আর ভালোবেসেছিলাম নক্ষত্রদের।
সেপ্টেম্বরের রাতে তারা চলতে চলতে
থেমে যেত

তোমার চোখের পাতায়।
কখনো আমি তোমায় ভালোবাসিনি।
ভালোবেসেছিলাম, তোমার বিদায়বেলা
যখন তুমি রাস্তায় ছেড়ে গিয়েছিলে
একাকী আমায়।
ভালোবেসেছিলাম বুলেটগুলোকে
ভালোবেসেছিলাম কান্নাকে,
কান্না আমার প্রিয় হয়ে গেছে
যখন থেকে তুমি ভুলে গেছ।
যখন আমি বুঝতে পারলাম যে,
আমি একা, ভালোবাসতে শিখলাম
নিজের পায়ের সোজা দাঁড়িয়ে থাকাকে।
ভালোবেসেছি নিঃশেষিত অবস্থায়
যখন স্মরণ করেছি তোমাকে।
ভালোবাসি তোমাকে ছাড়াই
এই অস্তিত্বমান থাকাকে
আর ভালোবাসি রুটি।
তোমার কণ্ঠস্বরকে জুলাইয়ের সূর্যের মতো
ভালোবেসে আমি হারিয়েছি পানি
ভোরের এক পশলা বৃষ্টি।
আমি ভালোবেসেছি তোমায়
রাতে প্রবাহমান বাতাসের মতো।
কখনো আমি তোমায় ভালোবাসিনি।
আমি ভালোবেসেছিলাম তোমার গান
যা তুমি গাইতে পাখিদের উদ্দেশ্যে।

এপ্রিলের নীল লতাগুল্মকে বাদ দিয়ে
আমি মজেছিলাম তোমার কথায়
যদিও জানা ছিল বসন্তের আরেক নাম
নিঃসঙ্গতা।
এবং এভাবে অপার্থিব শীতলতার অনুভূতিতে
আকণ্ঠ নিমজ্জিত হতাম আমি।

ছেলেরা বলগাম বিক্রি করে
নতুন গান মুক্তি পায়।
আমি ভালোবেসেছিলাম, তোমার বিজয়
বার বার তোমার কাছে পরাজিত হয়ে।
আমি আগুনে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলাম
সাগরে যেমন পূজারিরা নিক্ষেপ করে গোলাপ।
আগুন আমি ভালোবাসলাম, যখন
জ্বলছিলাম আগুনেরই মতো।
কখনো আমি তোমায় ভালোবাসিনি।
আমি ভালোবাসলাম আগুন
কিন্তু কখনোই তোমাকে না।
আমি ভালোবাসলাম আগুন
কিন্তু কখনোই তোমাকে না।
যখন আমি কাউকে ভালোবাসি
ভালোবাসি একজন পথিকের মতো...!
এক রাতে একটি হরিণ
পর্বত থেকে নেমে এলো তোমার হৃদয়ে।
এরপর আরেক রাতে সেটি একটি কবিতা হয়ে
আলো জ্বালল সেখানে।
প্রতিটি মানুষের নিঃসঙ্গতা
তার একাকীত্বের কষ্টের খুব গহীন থেকে
ভোরের কুয়াশা থেকে
নিষ্ঠুর দুঃখবোধ থেকে
তোমার কান্না জড়ানো মুখ থেকে
মানব অস্তিত্ব–তার প্রার্থনার ভাষা খুঁজে পায়।
ডালিম, ডুমুর, জলপাই
আর আমার হৃৎপিণ্ড
গোলাপ সম্মুখে
এবং যে আশায় আমি বাধি বুক
সবই অপ্রতুল, তোমার বিহনে।
তুমি রয়েছ সামনে সবসময়,
তুমি রয়েছ সামনে সবসময়,

কখনো আমি তোমায় ভালোবাসিনি।

তোমায় ভালোবেসেছিলাম,
যখন তুমি চলে গিয়েছিলে
পৃথিবীকে ভালোবেসেছিলাম,
যখন তুমি ফিরে এসেছিলে।
কিন্তু যখন ছিলে–ভালোবাসিনি–
ভয়ে ছিলাম যদি তোমাতে আসক্ত হয়ে পড়ি!
যাহোক, খুব হাসতাম যখন ট্রেনের জানালায়
আমার দোলায়মান রুমাল দেখে
তুমি ছুটে আসতে আর তুলে নিতাম তোমাকে।

প্রথম তুষারপাতে যখন ঢাকা পড়ত উপত্যকা
ঢাকা পড়ত তোমার মুখ যেন বা কবর হতো তোমার
আর ওটাই ছিল ভীষণ সুন্দর।
নিজের ভেতরে আমি হত্যা করেছিলাম তোমায়।
কখনো আমি তোমায় ভালোবাসিনি।
ভালোবেসিছিলাম, যখন দু'জন
গান গেয়েছিলাম ক্লান্তরাতের তীরে।
ভালোবেসেছিলাম, যখন তুমি
হাসতে ফুলের সঙ্গে,
ভালোবেসেছিলাম, যখন তোমার
চোখ ছিল ফুটন্ত গোলাপের মতো।
আর ভালোবেসেছিলাম নক্ষত্রদের।
আমি ভালোবাসলাম আগুন
কিন্তু কখনোই তোমাকে না।
আমি ভালোবাসলাম আগুন
কিন্তু কখনোই তোমাকে না।
যখন আমি কাউকে ভালোবাসি
ভালোবাসি একজন পথিকের মতো...!

[দেশপ্রেমের অসাধারণ এই কবিতাটির সঙ্গে কবি পাবলো নেরুদার একটি কবিতার বেশ মিল দেখা যায়। অনুবাদক কবি নিজেই]♦